29.8.73
11.9.73
5.11.73
8.1.74
4.3.74
19.3.74
16.4.74
29.4.74
23.8.74

শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা

[For B.T., B.ed. & P. G. Basic Course]

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার, এম.এ. (ডবল), বি.টি.,
অধ্যাপক তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়
শিক্ষণ (বি. টি.) বিভাগ,
তমলুক মেদিনীপুর।

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট '৬৮

মূল্য ঃ আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

মা ও বাবাকে

প্রস্তাবনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত শিক্ষক শিক্ষণ (বি.টি.) পাঠ্যসূচী অনুসারে সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীকে শিক্ষণপদ্ধতি ও পাঠ্যবস্তু (Contents) সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। 'শিক্ষণ পদ্ধতি' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় রচিত উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক মোটেই বিরল নয়। কিন্তু পাঠ্যবস্তুর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত সমাজবিদ্যার পাঠ্য পুস্তকগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ একই বিষয়ের একটি অংশ ইংরেজী ভাষায় এবং অন্য অংশ বাংলা ভাষায় অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় উত্তর দান নানা অসুবিধা ও জটিলতার সৃষ্টি করে। ইংরেজী ভাষায় বিদেশী লেখকের দ্বারা সযত্ন লিখিত পুস্তকগুলি সুপাঠ্য ও সুবিন্যস্ত হলেও, যেহেতু বিদেশের পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সেহেতু ঐসব পুস্তক আমাদের সমাজ জীবনের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। বলা বাহুল্য, এ ধরণের পুস্তক পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও, শিক্ষার্থীর মনে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ নয়।

শিক্ষণ-রত শিক্ষকরাই তাদের এ অসুবিধার কথা বার বার আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু মাতৃভাষায় এ ধরণের একখানি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা দুরূহ ব্যাপার। প্রথমতঃ, পরিভাষা সংক্রান্ত সমস্যা ; বহু শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সমাজ-বিদ্যায় আলোচিত হওয়ায় সর্বসম্মতভাবে আমরা এখন পর্যন্ত এসব বিষয়ের পরিভাষা বাংলাতে সৃষ্টি করতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ইংরেজী ভাষায় অধ্যয়নও এ ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতাকে অনেক সীমিত করেছে। কিন্তু তবুও সহকর্মী বন্ধু ও ছাত্রদের নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহে সার্থকভাবে না হলেও মোটামুটি ভাবে আমি এ প্রতিবন্ধকগুলিকে অতিক্রম করতে পেরেছি, তা বলা চলে। কিন্তু যাদের প্রয়োজন মেটানর জন্য এ পরিশ্রম করেছি, তাদের প্রয়োজন মিটলে আমার সকল শ্রম সার্থক হবে।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তু সংগঠনে আমি একাধিক গ্রন্থের ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। পুস্তকসহ এঁদের অনেকের নাম এই গ্রন্থের নানা পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি। তা সত্ত্বেও *Principal V. R. Taneja, S. K. Kochhar,*

K. Nesiah, Arthur C. Bining এবং *David H. Bining*-এর নাম উল্লেখ না করে পারি না। এঁদের সকলের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

এ পুস্তক প্রণয়নে তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরজিৎশরণ বাগচী, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ জানা, অধ্যাপক সন্তোষকুমার ঘোষ, অধ্যাপক তীর্থনাথ সরকার, অধ্যাপক অশোক গুপ্ত; গোবরডাঙ্গা হিন্দু মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হরিরাখাল বিশ্বাস, পাঁশকুড়া বনমালী খাটুয়া মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অশোককুমার ভুঁইয়া প্রভৃতি আমাকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করে আমার কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন। কলিকাতা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ঋতেন্দ্রকুমার রায় সমগ্র বইটি পরিমার্জনা করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে, ব্যানার্জী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী এই পুস্তকখানা প্রকাশ করে এবং প্রিন্টস্মিথের স্বত্বাধিকারী শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায় মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ পুস্তকের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সহকর্মী বন্ধুগণ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তা যথাসম্ভব দূরীভূত করার চেষ্টা করা হবে।

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়
শিক্ষণ বিভাগ
তমলুক
১লা আগষ্ট '৬৮

গৌরদাস হালদার

CALCUTTA UNIVERSITY

REVISED SYLLABUS FOR THE B. T. EXAMINATION

SOCIAL STUDIES : Full Marks—100

METHODS

I. Meaning and Scope—new trends in the field of social studies :

II. Aims and objectives of social studies—instruction in the secondary schools of West Bengal, especially at the senior stage.

III. Patterns of content organisation—principles of correlation, integration and fusion—subject disciplines versus integrated approach—merits and defects of the existing syllabuses of social studies for the School Final and Higher Secondary Examinations of West Bengal.

IV. Some Methods and techniques peculiarly suited to the teaching of Social Studies—the 'Unit' procedure-preparation of a few sample 'Units' on the basis of the present School Final/Higher Secondary syllabus—Socialized recitation—Panel discussion and debating methods—the project method, problem of individual differences and assignment methods—importance of concepts and the problem—solving technique—group discussions and committee techniques—interview and questionaire methods—supervised study, field Trips and excursions—the Social Studies Club and Social life of the School.

V. Utilising Community resources in making Social Studies—instruction effective in the School-Survey of the local community—local studies.

VI. Equipment and room arrangement—the Social Studies Laboratory, need for extending the social studies class room beyond the four walls.

VII. The role of audio -visual materials in Social Studies—Preparation of Maps, Charts, Graph, Diagrams, Picture etc.

VIII. The Social Studies Teacher—his qualifications and preparation.

IX. Need for comprehensive evaluation—Preparation and application of evaluation tools for testing growth in (a) information (b) skills and (c) attitudes—the maintenance of records.

X. Lesson plans and notes.

CONTENTS

On the 'Contents' Side, the trainees would be expected to have a thorough acquaintance with the subject matter included in the School Final and Higher Secondary Syllabuses of the Board of Secondary Education, West Bengal.

KOLYANI UNIVERSITY

CONTENTS AND METHODS OF TEACHING : SOCIAL STUDIES.

METHODS :

Planning of instruction and building units of study. Committee method. Reporting method. Socialised recitation. Text book method. Project method. Problem method. Excursions. Field trips.

Social studies class room. Working towards a democratic climate in the class room. Extending the social studies class room beyond its four walls.

Study of current affairs.

Role of audio-visual materials in the teaching of social studies ; Improvising some teaching aids and appliances.

Evaluation : the need for comprehensive evaluation ; Evaluating verbal ideas, factual information and curriculum by both teachers and students.

Preparation of lesson plan.

Construction of evaluation tools.

CONTENTS :

Man and society.

Forms of human relationship—personal, domestic, social, political, economic, religious, cultural.

Living in the local community. Our basic needs with reference to the region, state and country. The country we live in ; its physical background ; geographical position ; political set-up—the Indian Union and the constituent States.

Evolution of Indian life and culture through the ages. (Only the important epochs and land marks to be touched).

Indian culture : its characteristic features with reference to religion, language, art, architechture, literature, and fine arts.

The story of India's struggle for freedom. Achievement of independence in 1947. The new constitution. India as a democratic Republic. Welfare State. Reconstruction of New India. The five year Plans.

Man as citizen of the world. Growing inter-dependence of nations and countries. Striving towards world brotherhood and world peace. India's role in world affairs.

POST GRADUATE BASIC TRAINING COURSE

SOCIAL STUDIES

METHODS

1. Family and environment—Man and society—school and community.

2. What are social studies—their relation with the social sciences.

3. Aims, objectives and scope of social studies—Modern trend in education and need for social studies.

4. Organising the modern social studies curriculum—the present—syllabuses of social studies for West Bengal Schools and the problems of integration.

5. Methods and Techniques of teaching—Lecture and Text-book method—unit plan—problem method—project method, socialised recitation—laboratory method and a social studies laboratory—supervised study and the school library—teaching of current events—teacher-pupil planning.

6. Some special activities—dramatisation—debates—drawing—bulletin-board—written work—field work—loca survey.

7. Role of audio-visual aids.

8. Teacher of social studies and his Training.

9. Evaluation in social studies, testing knowledge, attitude and clarity of thinking—written tests and objective measurements—need for follow-up of activities of schools.

সূচীপত্র

পুস্তক পরিচিতি

সমাজবিদ্যার শিক্ষকের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকখানি পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার নাম নিম্নে দেওয়া হল :

1. Simple Visual Aids for Social Education, Published by : N. C. E. R. T.
2. Audio-Visual Hand Book ,,
3. Evaluation in Social Studies ,,
4. Papers in the Sociology of Education in India ,,
5. Advanced History of India : Dr. R. C. Mazumdar and others
6. History of Bengal—Vols. I & II (Dacca University) : Dr. R. C. Mazumdar
7. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ
8. পৃথিবীর ইতিহাস : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
9. Archaeology in India : Ministry of Education, New Delhi
10. Contemporary Indian Painters : G. Venkatachalam
11. The First, Second and Third Five Year Plan : Govt. of India
12. Surveys of Indian Industries Vols. I & II : B. S. Rao
13. The New Constitution, 1950 : Govt. of India
14. Modern Economic Geography : S. C. Bose
15. Lands and People (Vols. I to IV) : The Grolier Society, New York
16. Our India : Minoo Masani
17. Introduction to India ; Moracs and Stimson
18. Principles of Human Geography : Huntington and Cushing

19. India Annuals : Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi

20. India and Pakistan Year Books : Bombay Publication

21. The Statesman Year Books : The Statesman

22. The Dancing Foot : Mulk Anand

23. Yojana : Published by the Govt. of India

24. বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সিরিজ : বিশ্বভারতী

25. ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

26. The Indian Village Community : B. H. Baden Powell ; Published by Longmans, Green & Co., 1896

27. India's Villages : M. N. Srinivasa and others ; West Bengal Government Press, 1955

28. হিন্দু সমাজের গড়ন : নির্মলকুমার বসু ; বিশ্বভারতী

29. The Social Economy of the Himalayans : S. D. Pant ; Published by Allen and Unwin

30. A Reader in General Anthropology : C. S. Coon, Published by Jonathan Cope

31. Outlines of Social Philosophy : Mackenzie

32. Fundamentals of Sociology : Gisbert

33. Outlines of Psychology : McDougall

34. Handbook of Social Philosophy : Prof. P. B. Sengupta

35. A Review of Education in India : Published by N. C. E. R. T.

শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা

(Teaching Social Studies)

প্রথম অধ্যায়

সমাজবিদ্যার স্বরূপ

(Nature of Social Studies)

১। সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Short history of Social Studies) :

সুদূর অতীতে কোন এক অজানা যুগে গাছপালা ও অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষও আবির্ভূত হয়েছে এই পৃথিবীতে। তখন ছিল বন্য পরিবেশ, জীব-জানোয়ারের পাশে মানুষের চলাফেরা। হিংস্র জীবজন্তু আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার তাগিদে এবং বংশরক্ষার অনিবার্য কারণে সেই বিচ্ছিন্ন বন্য মানুষের চেতনায় আসে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। ঐক্যের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা আর সমাজ সংগঠন—এর মাঝে রয়ে গেছে বহু বছরের ব্যবধান। ইতিহাসের এই গতিপথে মানুষ শিখেছে আগুন জ্বালতে, শিখেছে পশুপালন আর কৃষি। ঐক্য প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছে পরিবার, গোষ্ঠী আর সমাজ। বন্য পরিবেশ ত্যাগ করে সামাজিক মানুষ গড়ে তুলেছে জনপদ। মানব সভ্যতার এই গতিধারা সর্বত্র সমান নয়। কোন সমাজে এসেছে সংহতি ও আধুনিকতা, কোথাও বা রয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন ভাব আর আদিম অথবা মধ্য যুগীয় সভ্যতা। ভিন্নতা যতই থাকুক শিক্ষার ইতিহাস মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিবৃত্তের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। সামাজিক ভিন্নতা থাকলে শিক্ষা প্রচেষ্টারও ভিন্নতা থাকবে। তাই আমরা দেখি অনুন্নত সমাজের শিক্ষাও পিছিয়ে আছে। এই শিক্ষা বিজ্ঞান সমাজ ও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির আচার-আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষা-বিজ্ঞানের অপরিহার্য বিষয়বস্তু। অতিপ্রাচীন কাল থেকে শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষার এই মূলসূত্র অবগত ছিলেন।

এক সময় সমাজ জীবন ছিল সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর। তখন সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুরও সংখ্যাধিক্য ঘটে নি। বর্তমানে মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিষয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের আচার-আচরণ

সম্পর্কিত সমাজিক বিষয়াদি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—যেমন ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি—প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। উক্ত প্রতিটি বিষয় প্রথম দিকে ছিল সরল ও সহজ। ক্রমে পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে বিষয়গুলির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা যে মূল সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করাও দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জ্ঞান খণ্ড বিখণ্ড—স্বয়ং সম্পূর্ণ একক নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মাত্র দু' একটি শিক্ষায় উন্নত দেশ ছাড়া সর্বত্রই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতিকে পরস্পর সম্পর্কহীন খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে রচিত ও পঠিত হত। কিন্তু শিক্ষাবিদ্‌রা ধীরে ধীরে ওদের পারস্পরিক সম্পর্কহীনতার কথা ভেবেছেন। মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাধারা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে এই ত্রুটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মনে হয়েছে। আজ এই ভুল নিরসনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা চলেছে দিকে দিকে।

আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দিগের মধ্যে ডিউইর (*Dewey*) গতিবাদী, জীবনধর্মী শিক্ষা-প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বললেন, মানুষের জীবনই হবে শিক্ষার মাধ্যম। পরীক্ষা সুরু করলেন তিনি তাঁর The Laboratory School-এ। জ্ঞানের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও ঐক্য আনবার চেষ্টা করে তিনি সাফল্য অর্জন করলেন। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার সমন্বয় ও ঐক্যের সূত্র (basis of correlation) হিসেবে বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা প্রকৃতি-পরিচয়কে উচ্চস্থান দিয়েছেন। কিন্তু ডিউই-র মতে এ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত। ডিউই বলেন, সমাজ-জীবনের কল্যাণ ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রয়োজনই বিদ্যালয়ের সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমন্বয়ের সূত্র। সামাজিক গতি ও ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সত্যিই এটি একটি মাত্র সামগ্রিক বিষয়। এখানে সামঞ্জস্য বিধান, তুলনামূলক বিচার এবং ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। জন ডিউই-র পর বহু দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এসম্পর্কে চিন্তা করেছেন। বর্তমানের সমাজবিদ্যা (Social Studies) এসব চিন্তাধারার ফলশ্রুতি মাত্র।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন সর্বপ্রথম সুরু হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার মডিসন্ এবং উইস্কন্সিন (Modison and Wisconsin)

সম্মেলনে ঠিক হল যে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এবং ইতিহাসকে আর পৃথক পৃথক ভাবে পাঠ্য না করে এদের বিষয়বস্তুকে 'সামাজিক বিষয়' বা 'সমাজবিদ্যা' ('Social Studies') নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করে পড়ান যেতে পারে। রিপোর্টটি আমেরিকার শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ল ; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র বিবেচিত হতে লাগল। পরীক্ষামূলকভাবে বহু বিদ্যালয়ে এটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে ধার্য হল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে Committee of Ten of the National Education Association U.S.A.-এর রিপোর্টে পুনরায় এই সমাজবিদ্যা (Social Studies) শব্দটি আলোচিত হল। এরপরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনীতি, সমাজনীতি, পৌরনীতি এবং ইতিহাস এই Social Studies-এর অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃতি পেল। পাঁচ বৎসর পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার Commission on Reorganization of Secondary Education কর্তৃক নিয়োজিত Committee on Social Studies এই বিষয়টিকে আইনতঃ (official) স্বীকৃতি দিলেন। এর ফলে সমাজবিদ্যাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন উপস্থাপিত হল। সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় কি হবে? গণতান্ত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি এই সমাজবিদ্যায় স্থান পাবে কিনা এ নিয়ে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হল। অবশেষে মানব সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত উক্ত যাবতীয় বিষয় সমাজবিদ্যার বিষয় হিসেবে গণ্য হল। গ্রস্ (*Richard E. Gross*) এবং ব্যাজ (*William V. Badge*)-এর মত অনুসারে ১৯২০ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত বছর কটি যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার পরীক্ষা ও প্রবর্তনের যুগ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। রাষ্ট্রের পক্ষে অতি উপযুক্ত এই পাঠ্যবিষয়টি। ওদেশের শিক্ষা সমাজকেন্দ্রিক। তাই তারা চায় দেশের শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিবেশে কর্মক্ষম, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে উঠুক।

আমেরিকার মত ইংল্যাণ্ডেও সমাজবিদ্যা পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় ঠিক মহাযুদ্ধের পর। কিন্তু বিষয়টি খুব লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার কোন স্থান না থাকায় অভিজাতদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রামার স্কুলগুলি বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয় নি ; যদিও অন্য স্কুলগুলি বিষয়টিকে পাঠ্যতালিকায় স্থান দিয়েছিল। যা' হোক, সমাজবিদ্যা পাঠ্যবিষয় হিসেবে ইংল্যাণ্ডে সামগ্রিক ভাবে স্বীকৃতি পায়নি।

অষ্ট্রেলিয়ার কারখানা-শ্রমিকদের জন্য সমাজবিদ্যাপাঠের ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকরা সাধারণতঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান পাঠ করেন, কিন্তু সামাজিক জীব হিসেবে তাদের মানবিক বিদ্যা পাঠের ব্যবস্থার সঙ্কীর্ণতাহেতু সমাজকেন্দ্রিক মনোভাব গঠনের উদ্দেশ্যে সমাজবিদ্যা তাঁদের বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য।

আমেরিকায় জন ডিউই-র ন্যায় ভারতে মহাত্মা গান্ধী শিক্ষা সম্পর্কে কর্মমুখী ও সমাজকেন্দ্রিক মতামত পোষণ করতেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতের আপামর সাধারণের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ গান্ধীজীর হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে আত্মিক ও সামাজিক যোগ নেই। তাই তিনি বলতেন, "আমি চাই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর হাতের নিপুণতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও আত্মার শক্তি বিকশিত হবে। বর্তমান শিক্ষায় হাত অকেজো হয়ে যায়—আত্মার বিকাশ সম্পূর্ণ অবহেলিত থাকে।" তিনি আরও বলতেন, "এ শিক্ষার ফলে অধিকাংশ ছাত্রই তাদের পিতামাতা, সংসার ও তাদের মৌলিক জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়। তারা কু-অভ্যাস আয়ত্ত করে, নিজেদের শহুরে বলে ভাবতে শেখে, আর দু-চার পাতা বুলি যা শেখে তা আর যাই হোক শিক্ষা নয়।" জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট অনুসারে গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার সূচী ও পদ্ধতি হবে এমন, যেন ভারতের আগামী কালের নাগরিক মনে প্রাণে বুঝতে পারে তার ব্যক্তিগত স্বত্তা, নিপুণতা ও যোগ্যতার কথা এবং তারা যেন সমবেত সমাজ জীবনের সেবার জন্য শরীর ও আত্মার বিকাশ সাধন দ্বারা সর্ব ক্ষমতা নিয়োগ করতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা আজও নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণে জাতীয় মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি, কিন্তু এই শিক্ষার মুলসূত্র ভারতের অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে স্থান পেয়েছে। সমাজ ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব জাতীয় শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারত স্বাধীন হল। শিক্ষাবিদ্‌দের এত দিনের প্রচেষ্টা এবার জাতীয় শিক্ষায় রূপায়িত হবার পরীক্ষা চলছে। ফলে প্রয়োজন হল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম এবং বিষয়াদির পরিবর্তন-পরিবর্ধন, নিয়োজিত হল পরপর তিনটি শিক্ষা কমিশন : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (University Education Commission 1948-49), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (Secondary Education Commission 1952-53), শিক্ষা কমিশন (Education Commission 1964-66)। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচার করে উক্ত কমিশনগুলি নতুন

ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপায় ও তার স্বরূপ প্রকাশ করলেন তাদের রিপোর্টে। প্রচলিত পাঠক্রম সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন অতি সত্য কথা বলেছেন, "এ কথা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না যে, বিদ্যালয়ে পাঠ্যবোঝা সম্পর্কিত অভিযোগগুলির প্রধান কারণ, বিষয়বস্তুর বাহুল্য; বিষয়বস্তুগুলির আংগিক আভ্যন্তরিণ সম্পর্ক বজায় না রেখে পৃথক পৃথক বিষয় হিসাবে পড়ান হয়।"[1] সুতরাং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি এবং অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন ভাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজবিদ্যা পাঠের ব্যবস্থা করা বিধেয়। কারণ উক্ত বিষয়গুলি সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কিত। এরূপ সম্পর্কিত বিষয়গুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি মাত্র বিষয়রূপে গণ্য হলে শিক্ষার্থীরা আর বিষয়ভারে জর্জরিত হবে না। উক্ত রিপোর্টের অভিমত অনুসারে সমাজবিদ্যা আজ সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়রূপে গৃহীত।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সমাজবিদ্যাকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নবম ও দশম শ্রেণীর মূল পাঠ্য (Core Subject) হিসাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। এবং পরে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্ত-বিষয় (Alternative Subject) হিসেবে সমাজবিদ্যা পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে।

নতুন বিষয় প্রবর্তিত ও গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু বিষয়টির অনুকূলে আমাদের মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। যে প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত তার পরিবর্তন ঘটান সহজ ব্যাপার নয়। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও অর্থনীতি পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষিত সমাজের মনে স্থায়ী আসন নিয়ে বসে আছে। বর্তমান নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভবিষ্যৎ নাগরিকের মনোভাব গড়ে উঠবে। তাই বর্তমান নাগরিক অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তবেই সমাজবিদ্যার উপযোগিতা উপলব্ধি এবং এর রীতি ও পদ্ধতির সুষ্ঠ প্রয়োগ সম্ভব

1, "It is not often realised that the complaint of our crowding is largely due to the multiplicity of subject, presented as separate entities. without bringing out their organic inter-relation ship. ....."

হবে। কাজেই সমাজবিদ্যার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[1]

২। সমাজবিদ্যার স্বরূপ ও অর্থ (Nature & Meaning of Social Studies) :

আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে জাতীয় ও প্রাত্যহিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমাজ-প্রগতির গতি ও প্রকৃতি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। স্বাধীন ভারতেও সে চেষ্টার অন্ত নেই। দেশের সকল স্তরের সংগে শিক্ষাক্ষেত্রেও চলছে সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়াস। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিক্ষাধারা বিদেশী সরকারের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে।

রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯ খ্রীঃ), মাধ্যমিকশিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) ও কোঠারী শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ) সুপারিশে সুরু হয়েছে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন। এই নতুন ব্যবস্থার পরিকল্পিত পাঠক্রমে সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে বিবেচ্য। এই নবজাত বিষয়টি সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তার রিপোর্টে বলেন, শব্দ গত অর্থে সমাজবিদ্যা ভারতীয় শিক্ষাধারায় নতুন। কিন্তু পূর্বেকার বিচ্ছিন্নভাবে পঠিত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজবিদ্যায় একত্রে গ্রথিত। উক্ত বিষয়গুলি যদি পৃথক পৃথক পঠন পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট পরস্পর সম্পর্কহীন কতকগুলি বার্তা পরিবেশিত হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক কার্য-কারণ, উহার গতি-প্রকৃতি, আর অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সম্পর্কে কোন সামগ্রিক জ্ঞান উপস্থাপন না করে, তাহলে এই বিষয়গুলির শিক্ষা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত বিষয়গুলিকে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন ভাবে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে, বিষয়গুলি মূলতঃ সমাজজীবনের এক-একটি সম্পর্কধারা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই সম্পর্কধারার মধ্যে নিহিত আছে শিক্ষার্থীর পরিবার,

---

1 "While a good deal of thought has been given to teaching of this subject in other countries, in India its teaching is in nascent stage and requires a very great attention in developing its theory and pra ctice."

Teaching & Social studies
—V. R. Taneja

সমাজ-সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ও জাতি। তারা যেন অনুভূতি ও বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে, আধুনিক যে সমাজে তারা বসবাস করে সেই সমাজ নিজের অন্তরের সমাজ সত্ত্বার এক শক্তির প্রভাবে পরিবর্তিত হতে হতে আদিম কাল থেকে আধুনিক স্তরে এসে পৌঁচেছে। মানুষ আসংগলিপ্সু, সমাজ চেতনা তার সহজাত ধর্ম ; তাই সভ্যতার আদিম যুগে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তারা সমাজ সৃষ্টি করেছিল। একালেও তারা সামাজিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই সমাজভিত্তিক মানবজীবন সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু। বিষয়টির দ্বারা তারা শুধু সংবাদ সংগ্রহ করবে না, অধিকন্তু শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে সামাজিক, সুনাগরিক, দেশপ্রেমিক হয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রণোদিত হবে, অন্যদিকে তেমনি তারা বুঝবে পৃথিবীর মানুষ এক, তারা এক পৃথিবীর নাগরিক।[1]

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের উক্তির মধ্যে একদিকে ব্যক্ত হয়েছে সমাজবিদ্যার স্বরূপ, অন্যদিকে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিতও করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে সমাজবিদ্যা এমনই একটি বিষয় যাহা সামাজিক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে দল, গোষ্ঠী বা জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, আর বিবৃত করে ইতিহাসের গতিপথে সমাজের উত্থান ও অবিচ্ছেদ্য ক্রমগতির ধারা।[2]

ব্যক্তি আর সমাজকে পৃথক করে চিন্তা করা যায় না। সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তিকে নিয়ে। প্রতিটি ব্যক্তির দুটি সত্তা থাকে, প্রথমটি ব্যক্তিসত্তা আর দ্বিতীয়টি সামাজিক সত্তা। সামাজিক পরিবেশেই ব্যক্তির দেহ ও মনের পূর্ণ বিকাশ হয়। এই সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে মানুষের বিবিধ সমস্যার সঙ্গে প্রকৃতির সমন্বয়ে। অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি হল সেই বিবিধ সমস্যার এক একটি। ভৌগোলিক পরিবেশের ভিন্নতায় উক্ত সমস্যাগুলির বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য দেখা যায়। আবার সমস্যার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের ফলে নতুন নতুন সামাজিক রূপ ও পরিবেশ গড়ে উঠে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক একটা সমাজ ভৌগোলিক পরিবেশে ক্রমশঃ এগিয়ে চলে ভাবী সমৃদ্ধির পথে। এই সমাজ সংগঠনে ও প্রগতিতে ব্যক্তির অবদান অনস্বীকার্য ; অথচ সামাজিক

1. Report of the Secondary Edu. Commission (1952-53)—Chap VI.

2. Social studies "are those (studies) whose subject matter relates directly to the organisation and development of human society, and to man as a member of social group."

কাঠামোতে সেই ব্যক্তি-সত্তাকে যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে ব্যক্তির স্বকীয়তা ও সামাজিক সত্তা এক ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে একটা সামগ্রিক রূপ ধারণ করে। এই সামগ্রিক রূপটিই হল সামাজিক মানুষের জীবনধারা। সুতরাং ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক সত্তা একটি মূল বিষয়ের বিশিষ্ট রূপমাত্র। আমাদের নবপ্রবর্তিত সমাজবিদ্যা ব্যক্তি ও সমাজকে পৃথক না করে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন এই সমাজবিদ্যার মূল তত্ত্ব।

সামগ্রিক স্বরূপ অনুধাবনের জন্য সমাজবিদ্যাকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা চলে। জীবদেহ তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। প্রতিটি অঙ্গের কর্তব্য ও কর্ম-ক্ষমতা ভিন্নতর। বিচ্ছিন্ন হলে এরা জড় ও স্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং অন্তর্নিহিত ঐক্য নষ্ট হয়। অথচ জীবন্তদেহ-সংলগ্ন অঙ্গাদি গতিশীল ও কর্মক্ষম। তেমনি সমাজবিদ্যার বিষয় বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে উহা জীবনীশক্তি হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে।

এজন্য সমাজবিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণে অধ্যক্ষ ভি. আর. তানেজা (*V. R. Taneja*) বলেছেন, "পৃথক পৃথক সম্পর্কহীন পাঠ্যবিষয় স্থিতিশীল আর সমাজবিদ্যা জীবন্ত ও গতিশীল। এতে মানবসমাজের পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আলোচিত হয়।[1]" সমাজবিদ্যায় ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির সমাজভিত্তিক আলোচনা ব্যাপক ও সংশ্লেষিত। সমগ্র বিষয়টিই মানবজীবনকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়। ফলে সমস্যাগুলি হয়ে ওঠে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত। অধিকন্তু সমাজবিদ্যায় পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। এর বিষয়বস্তুর মূল লক্ষ্য হল (ক) ব্যক্তির সঙ্গে দলের, সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির, (খ) দলের সঙ্গে দলের, (গ) আবার ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান ও তার সাংগঠনিক কার্যাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা। এগুলি এযাবৎ কাল ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজশাস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচিত হত। এদের পারস্পরিক যোগাযোগ পৃথকভাবে আলোচিত হলেও আভ্যন্তরীণ সংহতি বিধানের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। বর্তমান সমস্যা বিজড়িত জটিল সমাজব্যবস্থায় এরূপ সম্পর্কবিহীন

---

1. "While separate subjects are static, the social studies is a dynamic field by virtue of interpreting every matter of environmental concern."

V. R. Taneja.

জ্ঞান মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। বর্তমান জীবন সমস্যার বড় প্রয়োজন শিক্ষার্থীকে সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক মানুষ রূপে গড়ে তোলা। তাই বিদ্যালয়ে সেই সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষাক্ষেত্র অগ্রসর হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এজন্য যথোপযুক্ত পাঠ্যবিষয়েরও অবতারণা প্রয়োজন। সমাজবিদ্যাই এই প্রয়োজন সাধনে অপরিহার্য। কারণ সমাজবিদ্যা সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ-জীবনকে নিয়েই আলোচনা করে। সমাজবিদ্যার অধীত বিষয়ের দ্বারা শিক্ষার্থী তার সামাজিক সম্পর্ক ও পরিবেশকে যথাযথ অনুধাবণ করতে পারে।

সমাজবিদ্যার স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে আমরা বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি : (ক) প্রকৃতি বিজ্ঞান (Natural Science), (খ) সমাজবিজ্ঞান (Social Science) এবং (গ) মানবিক বিদ্যা (Humanities.)[1]।

পদার্থ বিদ্যা, রসায়ণ শাস্ত্র, ভূ-বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি প্রকৃতি বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত। মনুষ্য সমাজের উৎপত্তি, সংগঠন আর প্রগতির বিষয় আলোচিত হয় সমাজবিজ্ঞানে। তাছাড়া, সমাজবিজ্ঞান মানবিক সম্পর্কের (Human relationship) তাৎপর্য ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত পরিবেশনও করে। মানবিক বিদ্যা বা হিউম্যানিটিস বলতে এমন বিষয়কে বুঝায় যা মানুষকে প্রকৃতই মানবধর্মী করে তোলে। "হিউম্যানিটিস" শব্দটির অর্থ এত ব্যাপক ও পরিবর্তনীয় যে একে সমাজবিজ্ঞান থেকে পৃথক করে দেখার প্রয়োজন হয় না। কারণ মানুষ ও তার গঠিত সমাজ পরস্পরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং মানববিদ্যা আর সমাজবিজ্ঞান এক ও অভিন্নরূপে গৃহীত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাহলে শেষ পর্যন্ত বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার মোট দুটি স্তরে থেকে গেল—প্রকৃতিবিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের সমাজবিদ্যা কোন বিজ্ঞান শ্রেণীভুক্ত? শব্দগত অর্থে সমাজবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানেরই অঙ্গ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বৈশাদৃশ্য এত সূক্ষ্ম যে মাঝে মাঝে একটি অন্যটির পরিবর্ত (substitute) শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে। সমাজবিদ্যা বিদ্যালয়ের আর সমাজবিজ্ঞান কলেজস্তরের পাঠ্যবিষয়। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

1. Teaching the Social Studies in Secondary Schools, Page I. by—Bining & Bining.

তত্ত্বগত ও সিদ্ধান্তমূলক। এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিতে উপস্থাপিত। সমাজবিদ্যা উক্ত বিষয়াদির সরল ও সহজ ঘটনাবহুল রূপ এবং স্বল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে পরিবেশিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পৌরনীতির ন্যায় সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা যথাক্রমে অধিক ও অল্পবয়স্কদের পাঠোপযোগী করে রচিত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর মানবিক সম্পর্ক (Human relationship) অনুধাবন ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করাই বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত এই সমাজবিদ্যার প্রাথমিক দায়িত্ব। তাই সমাজবিদ্যায় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে মানব সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। মানুষ আর তার সমাজ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের সংশ্লেষিত ও সংহত রূপ এই সমাজবিদ্যা। সমাজবিদ্যা হল যেন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary state) যার কেন্দ্রে আছে সমাজবদ্ধ মানব জীবন।[1]

৩। সমাজবিদ্যার ব্যাপ্তি ও ভাবধারা (Scope and Trend of Social studies) :

সমাজবিদ্যা স্বাধীনোত্তর ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেন—ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পৃথক পৃথক পরস্পর সম্পর্কহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটি বহুল এবং অবৈজ্ঞানিক। শিক্ষার্থী নানা বিষয়ের বিচ্ছিন্ন প্রবাহে তার জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টি লাভ করতে পারে না। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়কে

---

1. এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উক্তি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য প্রদান করা হল :

"The Social Studies are concerned with man and his environment and the interaction between man and his environment and between groups of men."

Ohio Elementary School standards. Columbus :

(Dept. of Ed. 1949)

"Social Studies is an inclusive but highly specific term applied to that of the school curriculum which has a Primary responsibility of assisting the child to develop skill in and understanding of human relationships."

S. K. Kochhar.

"The Social Studies are concerned with man and his interaction with his social and physical environment ; they deal with human relationships."

John O. Michaelis.

শিক্ষার্থী তার জীবন সম্পর্কের বিচ্ছিন্ন গতি বলে ধরে নেবার প্রবণতা প্রদর্শন করে। উপরন্তু পাঠ্য বিষয়ের গুরুভারে শিক্ষার্থীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং এসকল বিষয়গুলিকে সংহত সংশ্লেষিত ও একীভূত করে সমাজবিদ্যা নামে নতুন পাঠ্যবিষয় প্রবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত। এই সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষয়টি আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সমাজবিদ্যা মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষকতায় নিযুক্ত নন এমন অনেকে ভাবেন যে, সমাজবিদ্যা নিছক সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা একখানি বই; আর শিক্ষকরা অনেকেই ভাবেন যে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সমষ্টি হল সমাজবিদ্যা। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সমাজবিদ্যা বিভিন্ন শাখা থেকে আলোচ্য বিষয় সংগ্রহ করলেও সমাজবিদ্যাকে কেবল ঐসব বিষয়ের যোগফল রূপে গণ্য করা চলতে পারে না। সমাজবিদ্যা এমন একটি বিষয় যার মধ্যে থাকে মানবসমাজ ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়। ফলে সমাজবিদ্যায় ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে একাকার হয়ে যায়। সমাজবিদ্যার কেন্দ্রে থাকে মানুষ আর পরিবেশের সাথে তার সম্পর্ক।

আমাদের মনে রাখা উচিত মানব জীবন ও সমাজ শুধু ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে সীমিত নয়; সমাজ-শাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, শিল্প, চারুকলা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিবিধক্ষেত্রে মানবজীবন ও সমাজের নানা উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু প্রয়োজন মত উক্ত ক্ষেত্রগুলি থেকে সংগৃহিত হয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যেন মানব ও সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অতি প্রয়োজনীয় কোন উপাদান বাদ না পড়ে।[1]

সমাজবিদ্যার আলোচ্য পরিধি ব্যাপ্ত হয় ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন অনুসারে। শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়, যে সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, কার্যাবলী সে প্রত্যক্ষ করে, সেগুলি

1. "The breadth of the programme should provide for a variety of experiences so that the child's learning will be well-rounded and well-balanced. It should also be possible to draw upon other fields of learning so that significant problems can be considered in the light of their many remifications; a narrow compartmentalized programme limits social learning."

সমাজবিদ্যার পাঠক্রমভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কহীন জ্ঞান তার কাছে মূল্যহীন বলে বিবেচিত হবে। অতএব শিক্ষার্থীর পরিচিত সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজনীয় অংশ সমাজবিদ্যায় পরিবেশিত হওয়া একান্ত কাম্য।

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময় ও সমস্যাবহুল হওয়াও বাঞ্ছনীয়। তাহলে পাঠ্যবিষয় হবে আনন্দবর্ধক ও আকর্ষণীয়। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সমাজবিদ্যা পাঠে কৌতূহলী ও মনোযোগী হবেন। দ্বিতীয়তঃ, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবন ও সমাজে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কারণ সমাজ গতিশীল ও জীবন্ত। তাই সীমিত কোন বিষয়ের মধ্যে সমাজবিদ্যা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রয়োজন বোধে ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে সমাজবিদ্যার পরিধি ও ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করতে হবে।

আজ বিশ্বসভ্যতা এক সঙ্কটময় যুগে অবতীর্ণ। যুদ্ধ, ধ্বংস, অশান্তির কবল থেকে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা শান্তিকামী মানুষের মনে দানা বেঁধে উঠেছে। আজ বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র, সমাজ ও জাতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এখন চাই শান্তি, সংহতি ও সম্প্রীতির সাধন। এর জন্যে আমাদের পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে এখন একটা বিষয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে জেগে উঠতে পারে বিশ্ববোধ, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব। সমাজবিদ্যা সেই অভাব পূরণ করতে পারে। তাই সমাজবিদ্যার ক্ষেত্র ও পরিধি প্রসারিত হওয়া উচিত— দেশীয় সমাজ-জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করে দূরদূরান্তের জাতি, গোষ্ঠী ও সমাজের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা তার এলাকা-বহির্ভূত থাকতে পারে না। পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের জীবন ও সমাজের গতির সঙ্গে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রকে সামঞ্জস্য পূর্ণ করে প্রস্তুত একান্ত কর্তব্য।

সমাজবিদ্যার ব্যাপ্তি বিচারার্থে নিম্নলিখিত নীতিগুলি সর্বাগ্রে বিবেচ্য বলে মনে হয়।

(ক) সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু হবে মূর্ত, সার্বিক ও ব্যাপক।

(খ) সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি বিচারের মানদণ্ড হবে শিক্ষার্থীর শ্রেণী, বয়স ও সামর্থ্য।

(গ) শিক্ষার্থীর পরিচিত সামাজিক অনুষ্ঠান, সংগঠন, গতি-প্রকৃতি সমাজবিদ্যার পাঠ্য বিষয়রূপে গৃহীত হবে।

(ঘ) সমাজ ও জীবন-সমস্যার বিভিন্ন দিক সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য। এই মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা চলছে। সুতরাং সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি যেন জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল শিক্ষাপরিবেশ (Educational atmosphere) সৃষ্টি করতে পারে, সেদিকে নজর রাখা উচিত।

সমাজবিদ্যাকে পাঠ্য বিষয়ভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদদের মধ্যে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমদিকে কিভাবে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌর-বিজ্ঞানকে সংহত, সমন্বিত ও সংশ্লেষিত করা যায়—এ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। ভৌগোলিক তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞরা ভাবতেন, সমাজবিদ্যায় ভৌগোলিক বিষয়বস্তুর যথেষ্ট ঘাটতি হয়েছে। ভৌগোলিক বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকলে অন্যান্য বিষয়ের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হবে। ইতিহাসবেত্তারা ভাবতেন, ইতিহাসের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হলে মানুষ স্বীয় অস্তিত্বের উত্থান ও ক্রমগতির জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হবে। সুতরাং সমাজবিদ্যার পরিবর্তে ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠ্যবিষয়ে পুনরাবর্তন বিধেয়। অর্থনীতিবিদ্‌ ও পৌরনীতিবিদরাও তেমনি স্ব-স্ব বিষয়ের সংকীর্ণতা সম্পর্কে চিন্তা করে সমাজবিদ্যার প্রচলনে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। এ সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, সমাজবিদ্যার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সীমাকে বিদ্যালয় ও গৃহপরিবেশ থেকে বিশ্বেরবিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করা। এর জন্যে প্রয়োজন মত ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও পৌর বিষয়বস্তুর সংযোজন ও সংশ্লেষণ যতটুকু প্রয়োজন তাই করা বাঞ্ছনীয়। শিশু জানতে চায় তার চতুঃপার্শ্বস্থ বিশ্বের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ। এই জানার মাধ্যমে সে পৃথিবীর মানুষ ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

সমাজবিদ্যার এই সাধারণ ভাবধারাকে (trend) এক বিশেষ পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। স্বাধীনোত্তর ভারতের বর্তমান দশকে ভারত কতকগুলি কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ, সীমান্ত ও

আন্তর্জাতিক নীতি আজ বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আংশিক ও আঞ্চলিক সফলতা অথবা বিফলতায় দেশ আজও দারিদ্র্য-কবলিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন রাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিকে দিকে চরম আঘাত হানতে ব্যস্ত। একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরির্বতন ও পুনর্গঠন চলছে - পরীক্ষণ চলছে নতুন আদর্শে শিক্ষার কাঠামোকে গড়ে তুলবার জন্য। পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষাকে বাস্তব ও জীবনধর্মী করে রূপান্তরিত করার চেষ্টা গেল দুই দশক ধরে আমরা করে আসছি। অন্যদিকে দ্রুত সঞ্চরণশীল বিশ্বের নব নব চিন্তারাজির সংঙ্গে জ্ঞান পিপাসুর পরিচিতি ঘটান আবশ্যক হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতে দেশ ও জাতিকে গঠন করার গুরু দায়িত্ব ভাবীকালের নাগরিককে নিতে হবে। সে-সব নাগরিকরা আজকের শিক্ষার্থী। তাই তাদের দেশের সমস্যা ও বাস্তব পরিবেশের সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় প্রয়োজন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসা আমাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত, যেন আজকের শিক্ষার্থী বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করার উপযুক্ত সৈনিকরূপে গড়ে উঠতে পারে। এই গুরু দায়িত্বের প্রস্তুতি পর্বের জন্য সক্রিয় করে তুলতে হবে সমাজবিদ্যাকে। উদ্দেশ্য ধর্মী না হলেও সমাজবিদ্যা পঠনের মৌলিক লক্ষ্য এখানে নিহিত।

জীবনযুদ্ধে প্রস্তুতির জন্যে ভারতের ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে বাস্তব পরিবেশের প্রতি। তাদের জানতে হবে গৃহ-পরিবেশ, প্রতিবেশী, গ্রাম, সহর, নগর, অঞ্চল, দেশ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও পৃথিবীর কথা। তারা জানবে তাদের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির কথা—খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য, যান-বাহন, পথঘাট, সরকার ও তার কার্যাবলী, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি। তারা অনুধাবন করবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবিধ সংবাদ, কৃষ্টি, সভ্যতা, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতিতে। এ ছাড়া তারা অনুভব করবে বিশ্বের সার্বিক (universal) মানবিক ভাবধারা ও সম্পর্ক। সমাজবিদ্যার নব প্রবণতায় তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক (practical) শিক্ষার যোগসূত্র রচনা করতে হবে। পুঁথিগত বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক ও অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষার সংযোগ হলে সেই শিক্ষা হবে জীবন্ত ও প্রাণচঞ্চল। দেশ-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধর্মী শিক্ষা সমাজবিদ্যার প্রথমও প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সমাজবিদ্যার নব ভাবধারার (New trend) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। সমাজীকরণের অন্যতম উপায় হল বিদ্যালয়ে গড়ে তোলা সামাজিক পরিবেশ আর সামাজিক বাস্তব পরিবেশে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা। এই ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-বিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে সমাজীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ, তদারকী বিদ্যাভ্যাস, লাইব্রেরী, সংগ্রহশালা, প্রদর্শনী, অবিভাবক দিবস, সমাজ কর্মীর আমন্ত্রণ ও বক্তৃতা, প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা-সহ শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া দরকার মেলা, উৎসব, অঞ্চল প্রদর্শন ও শিক্ষামূলক ভ্রমণে। সামাজিক পরিবেশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষা তারা পাবে তা-ই হবে পাঠ্য পুস্তকে লিখিত বিষয়ের পরিপূরক। আজকের শিক্ষার্থী ভাবীকালে নানা বৈচিত্র্যমূলক বৃত্তি অবলম্বন করবে। কিন্তু সকলকেই হতে হবে সমাজ-জীবনের অংশীদার—তাই সমাজীকরণের প্রচেষ্টা সমাজবিদ্যার অন্যতম ভাবধারা।

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যা আধুনিক শিক্ষার ভাবধারার (new trend in Modern Education) অনুগামী। শিশু কেন্দ্রিক (Child centred) ও জীবন কেন্দ্রিক (life centred) ভাবধারা সমাজবিদ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিশুর সামর্থ্য ও দক্ষতা-ভিত্তিক পাঠ্য বিষয় প্রাথমিক স্তরের 'প্রকৃতি পরিচয়'। শিশুর নিতান্ত পরিচিত পরিবেশের বিষয়বস্তু নিয়ে এই পুস্তকখানি রচিত। মাধ্যমিক স্তরে উচ্চতর শ্রেণীর জন্যে রচিত সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যের উপযোগী। আবার এই সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীর জীবনকেন্দ্রিকও বটে। এই স্তরেই শিক্ষার্থী তার জীবনের মূল লক্ষ্য নিরূপণ করবে। মানববিদ্যার (Humanities) যে-কোন বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যলাভে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দেবে সমাজবিদ্যা।

চতুর্থতঃ, আমরা মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে চাই। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন্তে দেশের এক বিরাট যুবক দল বাস্তব জীবনে নানা বৃত্তি গ্রহণ করবে। সুতরাং ব্যবহারিক শিক্ষার সংগে সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষাও এদের গ্রহণ করা চাই। সুনাগরিক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ও নীতিবিজ্ঞান তাদের শিখতে হয়। তাদের জানতে হবে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, তর্কশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, প্রচলিত ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ-ক্ষমতা ও সীমিত

সময়ের মধ্যে বিস্তৃত শিক্ষালাভ করা অসম্ভব। তাই বিষয়ভারে জর্জরিত শিক্ষার্থীর শিক্ষা হবে নিষ্ফল, নিরর্থক। তাহলে বিষয়ভার লাঘব করা যেমন প্রয়োজন তেমনি বহু বিষয় শেখবার ও জানবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে মূল পাঠক্রমের (core curriculum) অন্যতমরূপে সমাজবিদ্যাকে পাঠ্য বিষয় রূপে নির্বাচিত করা যায়। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি মানবজীবন ও সমাজ সম্পর্কিত বিষয়াদির সংশ্লেষিত ও সংহত রূপ এই সমাজবিদ্যা। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু দ্বারা শিক্ষার্থীকে বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়, অথচ বিষয়ভার লাঘব করা হয়। এখানেও নব্যশিক্ষায় জীবন ও শিশুকেন্দ্রিক ভাবধারাকে বজায় রাখা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ, আধুনিক শিক্ষার অন্যতম ভাবধারা (new trend in Education) জাতীয় সংহতি, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য বিধান। সমাজবিদ্যা এই ভাবধারার একান্ত অনুগামী। সামজবিদ্যায় মানবজীবন ও সমাজের বিষয়বস্তু, পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল, সহর, নগর, গ্রাম ও দেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত। বিদ্যালয়স্তরে সমাজবিদ্যাই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে বিশ্বমানব ও বিশ্ব পরিবেশ সামগ্রিক ও সংহতরূপে শিক্ষার্থীর মনে রেখাপাত করে। সমাজবিদ্যার ভাবধারা মূলতঃ মানব ধর্মী ও বিশ্বমুখী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লক্ষ্য ও মূল্য

(The Aims & Values)

১। শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যের অতীত রূপ (Aims and Values as they were) ঃ

কর্মে লক্ষ্য নিরুপণ সভ্য মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। সুদূর অতীতে বন্য পরিবেশের মানুষও ব্যক্তিগত ও দলীয় কর্মের লক্ষ্য স্থির করত। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা, শিকার-সন্ধান ও সংরক্ষণ। এসবের জন্য বাল্যকাল থেকে তাদের শিক্ষালাভ করতে হত। কতকাল কেটেছে মানুষের এই পরিবেশে ইতিহাস তার সঠিক হিসেব রাখে না। কিন্তু সেই অজানা শতাব্দীতে ইতিহাসের গতিপথে তাদের চিন্তাশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। তারাই আবিষ্কার করেছে আগুন, রন্ধন প্রণালী, পশুপালন, কৃষিকার্য। চিন্তার উৎকর্ষের বলে তারা বেরিয়ে এসেছে সেই বন্য পরিবেশ থেকে। ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে সভ্যতার পথে। পথিমধ্যে প্রবর্তিত হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (formal Education)। পৃথিবীর সব জাতি বা সমাজ সমান ভাবে উচ্চতর চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করতে পারেনি সত্য ; কিন্তু ভৌগোলিক অনুকূল পরিবেশে কোন কোন জাতি উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রাক সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। সভ্যতা বিকাশের সেই প্রাতঃকালে প্লেটো বলতেন, শিক্ষাই শারীরিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন করতে পারে[1]। এই বিকাশের গতিধারা নির্ণীত হয় পরিপূর্ণতার অনুকূলে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হত। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদরা স্ব-স্ব যুগের প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে গেছেন। কোনটির উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, কোনটির ধর্মভিত্তিক, ব্যক্তিতান্ত্রিক, মানবিক, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি। দেশ-কালগত পার্থক্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব বা গুরুত্ব এতটুকুও অবহেলার নয়।

1. Republic, Book VII.

শিক্ষায় উন্নত প্রাচীনতম দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। এই ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে টমাস্ (*F. W. Thomas*) বলেন, "পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষানুরাগ এত প্রাচীন নয় এবং এত শক্তিশালী ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বৈদিক যুগের সহজ সরল কবি থেকে শুরু করে—আজকের বাঙালী দার্শনিক—রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শিক্ষক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাবের প্রবাহ বয়ে চলেছে।"[1]

সেই প্রাচীন যুগেও এই ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়েছিল। আত্ম সন্ধানে মগ্ন ছিলেন সে-যুগের ভারতবাসী। তাদের জীবনের অন্যতম সমস্যা ছিল আত্মাকে জানা ও দুঃখের নিবৃত্তি ঘটান। তাই জীবন-জিজ্ঞাসায় তারা সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হতেন। মুনি-ঋষিরা কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকতেন। ফলে সন্ধান পেয়েছিলেন অদৃশ্য এক মহাশক্তিস্বরূপ পরব্রহ্মের (Absolute)। এই পরব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ তৎকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিরূপিত হত।[2]

বৈদিক যুগের ন্যায় বৌদ্ধ শিক্ষাতে উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয় নির্বাণলাভের পথে। মুসলিম শিক্ষায় এই উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতিতে নিবদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলে বিদেশী শাসনের কায়েমী স্বার্থে শিক্ষাকার্য পরিচালিত হত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাকে দেশীয়করণের পথে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা সুরু হল। এই প্রচেষ্টাকে সফল করার দায়িত্ব এসেছে স্বাধীন ভারতের হাতে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্য সম্পর্কে শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ব্যতীত বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি রিপোর্ট প্রভৃতিতে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (Secondary Education Commission, 1952-53)-এর

---

1. "There is no country where the love of learning had so early an origin or has exercised so testing and powerful influence. From the simple poets of the Vedic Age to the Bengali Philosopher (Tagore) of the present day, there has been an uninterrupted succession of teachers and scholars."

2. "The aim of Education is chitta-vritti-nirodha, the inhibition of those activities of the mind by which it gets connected with the world of matter or object"—Ancient Indian Education—R. K. Mukherjee P. XXII

বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[1] কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে বলেন, একটি বর্ধিষ্ণু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সুনাগরিক হিসেবে ছাত্ররা যাতে সৃজনশীল হয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে সংহতি স্থাপনের জন্য চরিত্রানুশীলনই শিক্ষার অভিপ্রেত লক্ষ্য হবে ; দেশের অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে ছাত্ররা যাতে বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক দক্ষতা সহকারে ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তাদের সংস্কৃতিমূলক সৌন্দর্যবোধসঞ্জাত ও সাহিত্যিক আগ্রহ বিকাশ সাধন করে, যে-সব আগ্রহ তাদের ব্যক্তিসত্ত্বার প্রকাশ ও মানবীয় উন্নতির সহায়ক এবং যে-সব আগ্রহগুলির অভাবে কোন জাতীর সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না, শিক্ষায় এসব আমাদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে হবে।

এই হল বর্তমান ভারতের জাতীয় শিক্ষাধারার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একে কেন্দ্র করে আমাদের পাঠক্রমিক বিষয়াদির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হওয়াই বিধেয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আমাদের অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা ও মূল্য লাভ করবে তাই হবে ভারতীয় জাতির অমূল্য সম্পদ।

২। লক্ষ্য ও অর্জিত মূল্যের পার্থক্য (Difference between Aim and Value-experience):

যে-কোন কর্মের ন্যায় শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা একান্ত কাম্য। নির্ধারিত লক্ষ্য সঠিক মত ও পথের সন্ধান দিতে পারে। বাস্তব লক্ষ্যে পৌছান অনেক সময় সম্ভব হয় না। উহা আদর্শবাদের দ্বারা দুরধিগম্য ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বাস্তবতার সাথে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না ; কিন্তু তথাপি লক্ষ্য স্থির করা অর্থহীন নয়। নাবিক নক্ষত্র লক্ষ্য করে জাহাজ পরিচালনা করে কিন্তু নক্ষত্রে পৌছতে পারে না। আমরা হয়ত আদর্শে উপনীত হতে পারব না, হয়ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌছতে অক্ষম হব ; কিন্তু লক্ষ্যকে ধ্রুবতারকারূপ লক্ষ্য করে যদি আমরা শিক্ষাকর্মে অগ্রসর হই অথবা শিক্ষা ধারা পরিচালনা করি তাহলে এটাও

1 "The training of character to fit the students to participate creatively as citizens in the emerging democratic social order, the improvement of their practical and vocational efficiency so that they may play their part in building up the economic prosperity of their country, and the development of their literary, artistic and cultural interest, which are necessary for self-expression and for full development of the human prosperity, without which a living national culture cannot come into being."

নিশ্চিত যে আমরা নতুন ও অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতার সন্ধান পাব, যার মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাহীন। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক না থাকলে, দিকদর্শন যন্ত্রবিহীন জাহাজের অসহায় নাবিকের মত আমাদেরও বিদ্যাসাগরে পাড়ি দেওয়া অসম্ভব।

লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে গেলে অর্জিত মূল্যের বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার পার্থক্য বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, লক্ষ্য দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর মূল্য বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হল লক্ষ্য, আর লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে হতে কর্মের বিবিধ মূল্য ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার সন্ধান পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, লক্ষ্য হল আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল এবং কর্মকর্তার ধারণায় তার সুস্পষ্ট রূপ বিরাজ করে। লক্ষ্যকে ধ্রুবতারকা করে কর্মকর্তা কর্ম পরিচালনা করেন কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পূর্বেই নানাবিধ মূল্য অথবা অযাচিত বাস্তব অভিজ্ঞতা ফলশ্রুতিরূপে সংগৃহীত হতে পারে। নাবিক কলম্বাস ভারতে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেন কিন্তু তিনি আবিষ্কার করলেন আমেরিকা। তাঁর শ্রমের ফলাফল লক্ষ্যবস্তু অপেক্ষা কম মূল্যবান নয়।

৩। সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(Aims and objectives of teaching Social Studies) :

সামাজিক মানুষের বিভিন্ন জীবনধারা সংশ্লেষিত ও সমন্বিত করে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সংগঠিত হয়। জাতীয় প্রয়োজনেই এই নবজাত বিষয়টি আজ ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য বিষয় হিসাবে গৃহীত। বিষয়টির এমন লক্ষ্য নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন যেন তার অভিজ্ঞতা ও মূল্য জাতীয় জীবনের অন্যতম ও অপরিহার্য সহায়ক হয়।

সমাজবিদ্যার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তোলা। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক পরিবেশ ব্যতীত ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন অসম্ভব। আবার ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয় সমাজ; আর ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিকতা দ্বারা সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে। বর্তমান শিক্ষার্থীই হবে ভাবীকালের সামাজিক মানুষ। সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধনে তাকেই জীবন-সংগ্রামের সৈনিক হতে হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই

সংগ্রামী দক্ষতা অর্জন নিতান্ত প্রয়োজন। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির বিকাশ—তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য।[1]

সুতরাং শিক্ষকদিগের প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীকে প্রকৃত সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা। সমাজের জটিলতম সমস্যাতে সামঞ্জস্য বিধান করে সংগ্রাম চালনার নৈপুণ্য যেন শিক্ষার্থী অর্জন করে। এই শিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষা, ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে তা হবে উজ্জ্বল। এই শিক্ষা রূপায়ণে সমাজবিদ্যা উপযুক্ত পাঠ্যবিষয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী বুঝবে পরিবার, সম্প্রদায়, বিবিধ দল বা গোষ্ঠী এবং দেশ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থী নিজেকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে জানবে। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষার্থী মানবিক সম্পর্কের বিবধ দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে সুসজ্জিত সৈনিকরূপে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। আজকার শিক্ষার্থীই হবে ভাবী সুশৃঙ্খল সমাজের সংগঠক।

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের দ্বিতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলা। ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশগুলির অন্যতম। এই গণতন্ত্রকে সার্বজনীন ও সার্বিক (universal) করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার সঙ্গে গণতন্ত্রের ওতঃপ্রোত ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রতি প্রবণতা সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান সহায়ক এই সমাজবিদ্যা। আমাদের শিক্ষার্থীরা ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক হয়ে একদিকে যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করবে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করবে। এই শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে ও নির্বাচিত হবে। সামাজিক দিক থেকে এরাই নাগরিকের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে এবং দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে স্ব-স্ব শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগ করে নানা সমস্যার সমাধান করবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সুনাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য

1. ইংরাজ কবি ডান Donne) বলেন,—"No man is an island entire of itself. The purpose of Social Studies in School........ is social initiation or development of social character by drawing the individual into the community, making him aware of its collective life and collective ideals."

"By virtue of its special content, the Social Studies has special aims and from its teaching special value, accrue." V R. Tareja.

সমাজবিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য থাকবে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ বিকাশ সাধন। শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দৃশ্যতঃ কাজ করে কিন্তু এর প্রেরণা আসে মন থেকে। উভয়ের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ সুনাগরিক হিসেবে সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়। সমাজবিদ্যার তত্ত্ব ও ব্যবহারিক অংশ নিশ্চয়ই পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে। তৃতীয়তঃ, বৈচিত্র্যময় ভারতে ঐক্য ও সংহতি বিধান নাগরিকের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্রে প্রবণতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজবিদ্যার মাধ্যমে সরাসরি এই প্রবণতার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। গণতান্ত্রিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য রূপায়ণে সমাজবিদ্যা একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়।[1]

তৃতীয়তঃ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান, ধারণা ও অনুভূতি অর্জনে সহায়তা করা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) ও পরিবেশের (environment) পারস্পরিক প্রভাবে ব্যক্তির স্বভাব (behaviour) গঠিত হয়। এই পরিবেশ দু'প্রকার : (ক) সামাজিক (social) এবং (খ) প্রাকৃতিক (Natural)। অনেক সময় সহজাত প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক পরিবেশের কুপ্রভাবে অসামাজিক কর্মে স্পৃহা সৃষ্টি করে। তাই মানুষ অনেক সময় কুকর্মে প্রলুব্ধ হয়; কিন্তু ক্রিয়াশীল সামাজিক প্রভাব এই প্রলোভনে বাধা সৃষ্টি করে। এই বিধি-নিষেধ তৈরী হয় স্বাভাবিক মানুষের সুযোগ সুবিধার অনুকূলে। একসময় প্রাকৃতিক প্রভাব মানুষের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করত। তখন মানুষ চেষ্টা করত যাদু-মন্ত্রের (Magic) প্রয়োগে প্রকৃতিকে বশ করতে। আধুনিক কালে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করেছে বিজ্ঞান প্রভাবে। আজ সে চন্দ্রে উপনিবেশ স্থাপনে প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু পরিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি সে পাবে না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সমুদ্র-স্রোত, বায়ু-প্রবাহ,

---

[1] A special purpose of Social Studies in Asian Schools should be to spread a clear understanding of Democracy and to secure the wholehearted acceptance of values on which it is based. The fact that modern democratic institutions and ideal are so different from the Socio-Political patterns of our past make it necessary to teach democratic values directly rather than incidently in the cause of other studies.—Mr. K. Nesiah.

জলবায়ু, আবহাওয়া ইত্যাদি মানুষ ও তার সমাজকে প্রভাবিত করবে। তাই প্রাকৃতিক ভিন্নতার সঙ্গে সামাজিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্ব-স্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সক্রিয়ভাবে ইতিহাস সৃষ্টি করে যাচ্ছে। নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে প্রগতির অন্বেষণে। এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও অনুভূতির বিকাশ সাধন সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমাজবিদ্যা হল মানুষ ও সমাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর সংশ্লেষিত রূপ। সমাজবিদ্যার পক্ষে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানব-জীবনের সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রভাব শিক্ষার্থীকে অবগত করান সহজ।

এ ছাড়া সমাজবিদ্যার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় ও আশাপ্রদ গুণ ও নিপুণতার বিকাশ সাধন। স্বতঃস্ফূর্ত ভাব, আত্মবিশ্বাস, মানসিক নমনীয়তা, স্বচ্ছ চিন্তাধারা, পরমত সহিষ্ণুতা, কর্মারম্ভের প্রেরণা, সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশের সাহস, মানসিক প্রসারতা, নতুন ও জটিল সমস্যায় অবিচল থাকার ক্ষমতা, সৃষ্টিমূলক কর্মে প্রবণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ সমাজবিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য। বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য আর পঠন-পাঠন রীতিতে সমাজবিদ্যা পরনির্ভরশীল শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভরশীল করে তার মনে দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করে। সমাজবিদ্যা তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষার্থীকে সত্যানুসন্ধানে প্রণোদিত করে। ফলে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাধারা স্বতস্ফূর্ত বিকাশের পথ লাভ করে।[1]

বিদ্যালয়ে অধীতব্য বিষয়গুলির মধ্যে সমাজবিদ্যা এমনই একটি বিশেষ বিষয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌলিক প্রয়োজনীয় গুণাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সাধিত হতে পারে।

সমাজবিদ্যা একদিকে যেমন অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে তেমনি আবার বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের ভাবী গতিপথ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত ও সম্প্রসারিত করে। সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী যেন ইহার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে নিজেকে এবং দেশবাসীকে সঠিকভাবে জানতে পারে।

---

1. "Pupils must 'purpose' what they do in their projects. They learn to plan and to execute their own plans. There is a chance of cultivating 'intellectual conscience,' clearness of thought and love of truth."

আন্তরিক ও সক্রিয় পাঠক বা শিক্ষার্থী বুঝবে তার দেশ সমাজের বর্তমান বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির জন্য অতীতের কোন কোন পটভূমি ক্রিয়াশীল ছিল, আর বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের রূপ কেমন হতে পারে। পরিবেশ, সমাজ ও জাতির ভবিষ্যতকে উজ্জলতর, উন্নততর ও গৌরবময় করে গড়ে তুলতে হলে কিভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত হতে হবে—একথা শিক্ষার্থী চিন্তা করবে। পরিবর্তনশীল সমাজ অবিচ্ছেদ্য ও অবিচল গতিতে চলমান্। এ চলার পথে বিজ্ঞান আজ তার পরম সহায়ক। কিন্তু একদিকে যেমন বিজ্ঞান আশীর্বাদ স্বরূপ মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি এনেছে, তেমনি সে অভিশাপ হয়ে চরম শত্রুতে পরিণত হতে পারে। দৃষ্টান্ত রেখে গেছে অতীত দুই বিশ্বযুদ্ধ। বিজ্ঞানকে সহায়করূপে পেতে হলে দেশের ভাবী নাগরিককে অধিক সতর্ক হতে হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শিক্ষার্থী বিচার করবে পৃথিবী আর মানব সমাজের জন্য কিভাবে সে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করবে। মানুষ চায় শান্তি ও সমৃদ্ধি। প্রতিটি মানুষ চায় উপযুক্ত মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি। সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনে দরদ ও অনুভূতি জাগান। সে জানবে প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। পরস্পর পরস্পরের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্নার অংশীদার। শিক্ষার্থী বুঝবে পৃথিবীর মানুষ এক, তারা এক পৃথিবীর নাগরিক।[1]

ভারত আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছে। সমাজ ও সংস্কৃতির দূর-পাল্লায়—পৃথিবীর উন্নততর জাতিগুলির সঙ্গে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে। তাই ভারতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুরু হয়েছে পুনর্গঠনের পর্ব। এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে নবজাত সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়রূপে গণ্য হল। এর লক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যকরী (effective) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে সমাজ উপকৃত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় সমাজবিদ্যার লক্ষ্য সীমিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। লক্ষ্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে; কিন্তু সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের দ্বারা এই পরিবর্তিত লক্ষ্যেও সমাজ

[1] "Strictly speaking teaching of world understanding falls within the jurisdiction of Social Studies, because this is a subject which enables a person o understand himself and his human relationship."—V. R. Taneja.

যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। লক্ষ্যের চেয়ে লক্ষ্যে পৌছবার পথটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[1] লক্ষ্যে পৌছবার উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত মূল্য বা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। লক্ষ্য অপেক্ষা এই অভিজ্ঞতার মূল্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(ক) সমাজবিদ্যা পুস্তকখানি জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডার স্বরূপ। পুস্তকখানি শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসু মনের চাহিদা মেটানর পক্ষে যথেষ্ট। সমাজবিদ্যার শিক্ষা পদ্ধতি দ্বি-মুখী—তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক। ফলে শিক্ষার্থীরা অজানা বিষয়কে জানার সাথে সাথে কর্মমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে স্ব-স্ব সমাজের বিরাট ও ব্যাপক পরীক্ষাগার থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। সক্রিয় ও অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর বহু সং ও প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ সাধন সম্ভব হবে।

(খ) লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সমাজবিদ্যা শিক্ষণের পদ্ধতি নানাবিধ। অবশ্য শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলাই এর অন্যতম লক্ষ্য। কর্মমূলক, সমস্যামূলক, পরীক্ষাগার ও সমষ্টিগত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সক্রিয় করে তোলে। ফলে সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কাজের দায়িত্ব বহনের সাহস লাভ করে। বিপদ বা সমস্যা যত জটিল হোক্ তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।

(গ) স্বকীয় প্রচেষ্টার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য। ফলে শ্রেণীকক্ষের অনগ্রসর শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠালাভ করে। সমাজবিদ্যা শিক্ষা পদ্ধতিতে এক ছাঁচে ঢেলে সাজাবার রীতি বর্জিত। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন শিক্ষাকর্মের মূল নীতি।[2] যার ভিতরে যা আছে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হবে শিক্ষার মাধ্যমে। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত ক্ষমতানুসারে শিক্ষাকর্মে অগ্রসর হতে পারে। ফলে ব্যক্তিগত গুণ, ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটে। এসব ক্ষেত্রে সমতার অভাব থাকলেও অনগ্রসর বা পিছিয়ে আছে বলে প্রমাণিত হয় না। দেখা গেছে সমাজবিদ্যার

---

1. "The road travelled is more important than the destination reached."

2. Education is the manifestation of the perfection already in man. Knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside ; it is all inside...What a man learns is really what he discovers', by taking the cover of his soul which is a mine of infinite knowledge."—Swami Vivekananda.

সমষ্টিগত, দলগত অথবা ব্যক্তিগত শিক্ষা পদ্ধতিতে কেহ সংগঠন, কেহ সংগ্রহ; কেহ বা পড়াশুনা; কেহ বা রিপোর্ট দাখিল—এমনি কোন না কোন কর্মে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে।

(ঘ) সমাজবিদ্যা শিক্ষণের বিবিধ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয়। সমস্যা সমাধানের পথে শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী। দলগত প্রচেষ্টা, বাস্তব কাজ (field work) সামাজিক জ্ঞান ভাণ্ডার সংগ্রহ (Community resources) ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে পরম সহিষ্ণু, তাদের মনে জেগে ওঠে ঐক্য; সংহতি, সমবায়মূলক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ।

(ঙ) সমাজবিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষককে শুধু শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় থাকলে চলে না। তাঁকে নেমে আসতে হয় সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজের বিস্তৃত জনজীবনে। তিনিই শিক্ষার্থীর সমবায় কর্মপদ্ধতির সংগঠক, পরিচালক ও বন্ধু। ফলে শিক্ষকও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তরিক সৌহার্দ। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সৌহার্দ শিক্ষার্থীর জীবনে একান্ত কাম্য।

পশ্চিমবঙ্গের দশম মান ও একাদশ মানের বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়রূপে সমাজবিদ্যা গৃহীত। সমাজবিদ্যা মানব জীবন ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু বিষয়ের ব্যাপক ও সামগ্রিক রূপ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি বহু বিষয় থেকে কিছু কিছু জানতে পারে, কিন্তু ঐ সব বিষয়গুলির কোনটিতেই গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে না। পাণ্ডিত্য অর্জন সম্ভব না হলেও উক্ত বিষয়গুলির কোন না কোনটির প্রতি বিশেষ প্রবণতা ও জ্ঞান লাভের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। শিক্ষক বিষয় শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীর এই প্রবণতা লক্ষ্য করে তাকে পরিচালিত করবেন—ইহাই একান্ত কাম্য। মনে রাখা উচিত, মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চতর শ্রেণীগুলি উচ্চশিক্ষার (Higher Education) পথে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করে। এই প্রস্তুতির অনুকূলে শিক্ষাপরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে সমাজবিদ্যা—[1] সমাজবিদ্যাকে পাঠ্যবিষয়ভুক্ত করার অনুকূলে ইহা একটি অপরিহার্য উদ্দেশ্য।

1. এই অংশের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হল।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজবিদ্যা ঃ মূল পাঠ্যবিষয়

(Social Studies as Core Subject)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক পরিচালিত (১) স্কুল ফাইন্যাল বা দশম মান স্কুল এবং (২) উচ্চতর মাধ্যমিক বা একাদশ মান স্কুলে সমাজবিদ্যা পাঠ্যবিষয় হিসাবে গৃহীত। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বাংলায় উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাসূচী প্রচলনের সময় নবম, দশম শ্রেণীতে সর্বপ্রথম সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজবিদ্যা বর্তমানে আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে অনুমোদিত। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিষয়টি মূল পাঠ্যাংশের (Core Curriculum) অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দশম মান বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীতে বিষয়টি পাঠ্য হিসেবে স্বীকৃত। ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজবিদ্যা পড়তে পারে এবং বিষয়টি শেষ (final) পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উক্ত দু প্রকার বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীও ভিন্নতর ছিল। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যা মূল বিষয় (Core Subject) রূপে গণ্য হত। মূল বিষয় হিসেবে সমাজবিদ্যার গুরুত্ব ও উপযোগিতা বিচার সাপেক্ষ। তার পূর্বে দেখা দরকার মূল পাঠ্যসূচী (Core Curriculum) বলতে কি বোঝায়।

১। মূল পাঠ্যসূচী (Core curriculum) :

সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রা জটিল থেকে ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাবীকালে এই জটিল জীবনধারার অংশীদার হয়ে বহু সমস্যার সম্মুখীন হবে। সুতরাং বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত সৈনিক হয়ে উঠতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর তিন বছর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নির্ধারণের উপযুক্ত সময়। এই সময় শিক্ষার্থীরা স্বীয় সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুসারে কে কোন পথে যাবে তা নির্দেশ করা হয়। মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় কোন কোন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হবে, আবার কেউ-বা অকৃতকার্য

হবে। কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কেউ-বা সাধারণ শিক্ষা, কেউ-বা কারিগরী বিদ্যা, কেউ-বা চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন পথে চলে যাবে বা জীবিকার্জনে নিয়োজিত হবে। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ সার্বজনীন ও অনিবার্য বিষয়রূপে গণ্য। জীবিকার ক্ষেত্রে যে যেখানে প্রবেশ করুক সমাজ জীবন থেকে কেউ দূরে সরে যাবে না। এমনকি বর্তমান যুগের সন্ন্যাস জীবনও একপ্রকার গোষ্ঠীবদ্ধ ও নিয়মবহুল জীবনযাত্রা। সেখানেও শিক্ষা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান। সুতরাং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এমন শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা সকলেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। এই উদ্দেশ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য এমন কতকগুলি পাঠ্যবিষয় স্থির করা হয়েছে যা সর্বস্তরের শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভ করতে হবে। এই বিষয়গুলি মূল পাঠ্য তালিকার (Core Curriculum) অন্তর্গত।

মূল পাঠ্য সূচীর প্রধান উদ্দেশ্য হল সর্বস্তরের শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষাদান। সকলকেই যাতে সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা যায় সেদিকেই এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। মূল পাঠক্রম ছাড়া শিক্ষাকর্মসূচীতে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ও বর্তমান যেগুলি শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। এই বিষয়গুলির লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে বিশেষজ্ঞ (Specialist) করে গড়ে তোলা। সকলে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না। শিক্ষার্থীরা স্বীয় সামর্থ্য ও নিপুণতা অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে এবং সেই নির্বাচিত বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সঙ্গীত-চারুকলা ইত্যাদি যে-কোন বিষয়ে শিক্ষার্থী বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থী বিষয়গত পাণ্ডিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করতে পারে। মূল পাঠক্রমের বিষয়াদি শিক্ষার্থীর জীবিকার অবলম্বন না হতে পারে, কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা ও বসবাস করবার জন্য সহায়ক হয়[1]। জীবনে নানা বৃত্তি গ্রহণ করে শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে। কেহ হবেন ডাক্তার, কেহ হবেন অধ্যাপক, কেহ-বা উকিল, কেহ ইঞ্জিনীয়ার

---

1. "We wish to endow the future citizens with a human outlook, equip them with a vision and a purpose. The core subjects will enable the students to acquire a sense of values."—S. K. Kochhar.

ইত্যাদি ; কিন্তু সকলকেই সামাজিক জীবনযাপন করতে হবে। কার্যতঃ সুনাগরিক হওয়ার প্রশ্ন আসে আগে, আর বিশেষজ্ঞ হওয়া বা পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রশ্ন আসে পরে। মূল পাঠ্য বিষয়াদি শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক ও সামাজিক করে গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষাদান ও মনোভাব সৃষ্টি করে।

সুতরাং শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনোত্তর ভারতের মাধ্যমিক স্তরে মূল পাঠ্য বিষয়ের সংযোজন অমূলক নয় বরং খুবই উপযুক্ত।

মূল পাঠক্রম (Core Curriculum)-কে শিক্ষার বিষয় হিসাবে গণ্য করা যায় ; কারণ সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য মূল বিষয়গুলি পাঠ্য হিসেবে গণ্য। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত মূল বিষয়গুলির তাৎপর্য বুঝতে হলে অন্ততঃ দুটি কমিশনের অনুমোদিত মূল পাঠক্রম পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। যথা, (ক) রাধাকৃষ্ণন কমিশন এবং (খ) মুদালিয়র কমিশন।

(ক) রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে মূল পাঠ্য সূচী :

সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এ সম্পর্কে কমিশন বলেন যে, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হবে। এর জন্য প্রাকৃতিক ও জীববিজ্ঞান বিষয়াদি পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে এই মূল্যবান জীবনের গতি, প্রকৃতি ও সমাজবদ্ধ কর্মপদ্ধতি অনুধাবন করতে পারে। বিদ্যালয় জীবনের প্রথমদিকে পাঠ্য বিষয়টি সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপিত হবে, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর দিকে একই বিষয় অধিকতর জটিল, ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে পরিবেশন করা প্রয়োজন। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'পরিবেশ-পরিচিতি' সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে সহজতর উপায়ে অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য রাধাকৃষ্ণণ কমিশন 'সাধারণ বিজ্ঞান' এবং 'সমাজবিদ্যা'র মাধ্যমে একই বিষয় ব্যাপকভাবে পরিবেশনের সুপারিশ করেন। উক্ত দুটি বিষয় নবম ও দশম শ্রেণীর আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়।

কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ধার্য আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়ের তালিকা নিম্নরূপ :—

1. Mother tongue (corrective and effective use of language, acquintance and appreciation of selected literature)

2. Federal Language (Comprehension and use in simple everyday situation)

Or,

A classical or Modern Indian Language (for those whose mother-tongue is the federal language)

3. English (Comprehension and Simple Composition)
4. Elementary Mathematics
5. General Science (Physical & Biological)
6. Social Studies (including a brief outline of world history with special emphasis on the history and geography of India)

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য কমিশনের পরিকল্পনা :

1. Mother Language.
2. Federal Language.

Or,

A. Classical or Modern Indian Language (for those whose mother-tongue happen to be the Federal language)

3. English.
4. General Science (Physical and Biological)

Or,

Social Studies (including elements of Economics and Civics)

আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য সমাজবিদ্যাকে পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। উহা একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় অনুমোদিত নয়। সুতরাং উহা আলোচ্যাংশের বহির্ভূত। তবে দ্বাদশ শ্রেণী অনুমোদিত হলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমাজবিদ্যা এবং কলাবিভাগের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে মূল পাঠ্যসূচী :

A. (i) Mother-tongue or Regional Lanuage or composite course of the mother-tongue and a classical language.

(ii) One other language to be chosen from among the following :

(a) Hindi (for those whose mother tongue is not Hindi)

(b) Elementary English (for those who have not studied it in the Middle Stage)

(c) Advanced English (for those who have studied it in the earlier stage)

(d) A modern Indian Language (other than Hindi)

(e) A modern foreign Language (other than English)

(f) A Classical Language.

B. (i) Social Studies (General Course for the first two years only)

(ii) General Science including Mathematics (General Course for the first two years only)

C. One Craft to be chosen from the following :

(a) Spinning and weaving.
(b) Wood-work.
(c) Metal-work.
(d) Gardening
(e) Tailoring
(f) Typography
(g) Workshop Practice
(h) Sewing—needle work and Embroidery.
(i) Modelling.

সাধারণ-বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যাকে মূল পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি উপলক্ষ্যে মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কমিশন বলেন যে, সমাজবিদ্যা এবং সাধারণ বিজ্ঞান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত করা প্রয়োজন। যে সব শিক্ষার্থীর ঐচ্ছিক (Optional) বিষয়গুলি উক্ত দুই বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত নয় তাদের জন্য ঐ দুই বিষয় হবে অবশ্য পাঠ্য। উক্ত দুই বিষয় ভাষা ও হস্ত শিল্প (Craft) সহযোগে সার্থক মূল পাঠক্রম (Core Curriculum) তৈরী করতে পারে। এই মূল পাঠক্রমের সহিত শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে নির্বাচিত বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে।

সমাজবিদ্যা এবং সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Course) হবে অতি সাধারণ এবং তা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দু' বছরের জন্য পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট থাকবে। এর মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের মানুষ, তার সমাজ ও জীবন যাত্রা সম্পর্কে মোটামুটি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার্থীরা অবগত হতে পারবে। এ প্রসংগে আমাদের মধ্য-শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্বাচিত মূল পাঠ্যসূচীও বিবেচ্য।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত মূল পাঠ্যসূচীর রূপঃ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীর (১৯৬৬) রূপ একটু ভিন্নতর। নিম্নে পর্ষৎ-এর ভাষায় প্রদত্ত মূল পাঠ্যস্থচী উল্লেখিত হল :

Curriculum for the Higher Secondary Examination
(from 1966)

The curriculum is in two parts, viz.

A. Core Subjects

B. Subject for the Board's Higher Secondary Examination.

To qualify for the Board's Examination a student must pass in all the core subject tests to be held by the school.

A. Core Subjects

A student must do these subjects in classes noted against each.

1. Social Studies (to be studied in Classes IX and X)
2. General Science (to be studied in Classes VI to X)
3. Elementary Mathematics (to be studied in Classes VI to X)
4. Craft (to be learned in Classes VI to IX)

উক্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একমাত্র হস্ত শিল্প (Craft) ব্যতীত অন্য তিনটি বিষয় দশম শ্রেণীতে শেষ হচ্ছে। পর্ষৎ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা দেবার উপযুক্ততা অর্জনের জন্য Humanities, Science, Technical, Commerce, Agriculture, Fine Arts এবং Home Science প্রভৃতি সকল স্তরের শিক্ষার্থীকে মূল-বিষয় পড়তে হচ্ছে ; পরীক্ষা বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হবে। শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরটি মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষার নম্বর পত্রে উল্লেখিত থাকবে। তবে এই নম্বর পরীক্ষার শ্রেণী (Division) বিচারে সাহায্য করবে না।

পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সকল বিভাগের (Stream) শিক্ষার্থীকে সব কটি পাঠ্য বিষয় পড়তে বাধ্য করা যুক্তিযুক্ত হয়নি। পাঠ্য

পুস্তকের গুরুভার কমান যদি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা হয় তাহলে কলা বিভাগীয় শিক্ষার্থীকে সমাজবিদ্যা বা বিজ্ঞানের ছাত্রকে পৃথক সাধারণ বিজ্ঞান পড়তে বাধ্য না করলেও চলে। আশার কথা, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পর্ষৎ এই অভিমত কার্যকরী করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

দশমমান বিদ্যালয়ের বিষয় নির্বাচন উপলক্ষে মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। এখানে ঐচ্ছিক পাঠ্যের (Optional) সদৃশ বিষয় (allied subjects) না হলে শিক্ষার্থীরা সমাজবিদ্যা আর সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতে পারে।[1] সেই হিসেবে দশমমান বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্ত বিষয়রূপে (Substitute Subject) সমাজবিদ্যা নিয়েই পড়শুনা করে।

২। সমাজবিদ্যাকে মূল বিষয়রূপে পরিগণিত করার স্বপক্ষে যুক্তি (Reasons for adopting Social Studies as Core subject) ঃ

সমাজবিদ্যাকে মূলপাঠ্য তালিকার (Core curriculum) অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। যুক্তিগুলিকে (ক) মনস্তাত্ত্বিক, (খ) সামাজিক, (গ) ব্যবহারিক এবং (ঘ) শিক্ষামূলক যুক্তি হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

(ক) **মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি (Psychological Reasons)**: মানুষ তার পরিবেশের পালিত সন্তান। স্ব-স্ব পরিবেশে প্রতিটি মানুষ পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। অনুকূল জল-আলো-বাতাস পেলে ধরিত্রীর বুকে যেমন বৃক্ষাদি পুষ্ট, বর্ধিত ও ফলেফুলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি মানুষও অনুকূল পরিবেশে ব্যক্তিসত্ত্বা ও সামাজিক সত্ত্বাকে বিকশিত করে। শৈশবেই শিশু-মন পরিবেশকে জানতে চায়, চিনতে চায়। কি, কোথায়, কেন—ইত্যাদি প্রশ্নবানে সে মাতা, পিতা বা স্বজনকে বিরক্ত করে। মানবমনের এই প্রশ্ন চিরজাগ্রত; শুধু রূপের পরিবর্তন হয় মাত্র। তা না থাকলে ঈশ্বর সৃষ্ট অন্য জীবের মত মানুষও

1. We have recommended that a general course in Social Studies and General Science should be provided at the High School stage for those who do not take up these (or allied subjects) among their optionals"

Secondary Ed. Commission Chap. VI

শুধু খাদ্য সংগ্রহে ও জীবন রক্ষায় মৃত্যু পর্যন্ত কালক্ষয় করে যেত। উন্নত সমাজবদ্ধ জীব বলে সে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারত না। পরিবেশকে জানবার আগ্রহ বয়োঃসন্ধিক্ষণের প্রারম্ভে আরও নীরব অথচ প্রবল আকার ধারণ করে। সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীর মনের এই চাহিদা পূরণ করে। তাই এই বিষয়টির মাধ্যমে স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পরিবেশের অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলী শিক্ষার্থীরা জানতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় এ-সিদ্ধান্ত সর্ববাদী সম্মত যে, শিশু মূর্ত বা বাস্তব জিনিসকে বেশী পছন্দ করে। বিমূর্ত জিনিস বা বিষয়কে তারা সহজে অনুধাবন করতে পারে না। কল্পনা শক্তির বিকাশ তখনও পূর্ণমাত্রায় তাদের হয়নি। অথচ জীবনের চেয়ে বাস্তব জিনিস আর কিছু নেই। সমাজবিদ্যা এমনিই বিষয়, যা জীবন সম্পর্কে বাস্তব শিক্ষাদান করতে পারে। বাস্তবতার মাধ্যমে শিক্ষাদান জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। পুঁথিগত বিদ্যা মনের সেই অভাব পূরণ করতে পারে না। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব বাস্তব বিষয়াদি সরবরাহ করে। পরিচিত বিষয়াদির মাধ্যমে অপরিচিত পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থী সহজে জ্ঞানলাভ করতে পারে। সমাজবিদ্যাকে মূল পাঠ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করার পেছনে ইহাও একটি অন্যতম যুক্তি।

তৃতীয়তঃ, মানুষ জ্ঞানার্জন করে জীবনের প্রয়োজনে। এই জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করে চিন্তা করা দুরূহ। পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন বিষয়াদিকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে তবেই সেই চিন্তার্জিত জ্ঞান কার্যকরী হয়। মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতরা সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উপায়ে জ্ঞানার্জনের পথ নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, কোন বিষয়ের অংশ সমগ্রের সমান নয়। অংশ জড় ও গতিহীন নির্জীব হয়ে পড়ে। আর সমগ্র সর্বদা জীবন্ত, গতিশীল এবং ফলপ্রদ উপায় নির্দেশ করে। যেজন্য পাঠক্রমের ঐক্যসাধনই বর্তমান শিক্ষাধারার অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি পৃথক পৃথক ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন সমস্যার সমাধান আনতে পারে না। উল্লিখিত প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের ব্যাপকতা শিক্ষার্থীর কর্মভার বৃদ্ধি করে কিন্তু জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে না; বরং আধুনিক জটিল জীবন সমস্যায় ইন্ধন জুগিয়ে শিক্ষার্থীর রুচি, আশা আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করে দেয়। সমাজবিদ্যা হল এসকল বিষয়াদির ব্যাপক ও সংশ্লেষিত রূপ। সুতরাং এই একটি বিষয়ই

শিক্ষার্থীর বস্তুতান্ত্রিক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয় করে তাকে আধুনিক জীবনযাত্রার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সুসংহত ও একক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সুসজ্জিত করা হয় যে, এই একটি বিষয়ই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সত্তাকে সামাজিক সত্তার সঙ্গে যোগসূত্র রচনায় সাহায্য করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক মন, সত্যবাদিতা, ন্যায় ও সৎপ্রবৃত্তি, সহনশীলতা, সমবায় কর্মপ্রবৃত্তি, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধ বিকশিত হয়। বিষয়টি শুধু শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে না, সৎকর্মেও প্রণোদিত করে। সুতরাং বিষয়টিকে মূল পাঠ্য বিষয়ের (Core Curriculum) অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তি সঙ্গত হয়েছে।

(খ) **সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি (Sociological Reasons) :** অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি প্রতিটি জীবন সমস্যায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। বর্তমান শতাব্দীর দুই মহাসমর সেই পরিবর্তনকে পৃথিবীর দিকে দিকে সংক্রামিত করে। ভারতও সেই পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। ভারতের জীবন-সমস্যার দিকে দিকে এসেছে পরিবর্তন। এদেশের সেই পুরাতন সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সেই একান্নবর্তী পরিবার আর নেই, পিতা-মাতা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা, কাকা-জ্যাঠা প্রভৃতি আর একান্নে প্রতিপালিত হন না। তখন একান্নবর্তী পরিবারের পরিজনবর্গ পারস্পরিক সহযোগিতায় পারিবারিক মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করতেন। এক একটা পরিবারই ছিল পারিবারিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে শিশুরা শিখত পারিবারিক পেশা ও কাজকর্ম। তাদের মনে জাগত পরিজনদের মধ্যে মিলেমিশে থাকার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিই পাড়া, গ্রাম, অঞ্চল ও সম্প্রদায়ে সামাজিক পরিবেশে বিকশিত হয়ে পড়ত। পরিবারই সামাজিক শিক্ষার বীজ বপন করত শিশু-মনে। পরিবারের আজ সেই গঠন-ধর্মী প্রভাব শক্তিশালী নয়, পারিবারিক সংহতি নষ্ট হয়ে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গেছে। এখনকার পরিবার শিশু-মনে আর সামাজিক শিক্ষা দিতে পারে না। অথচ এই সামাজিক শিক্ষার অভাবই হল স্বদেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টের অন্যতম কারণ। শুধু তাই নয়, একমাত্র কারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তাই দেশের শিক্ষাবিদরা আজ চিন্তান্বিত। শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রবৃত্তির বিকাশকে তো অস্বীকার ও অবহেলা করা যায় না। গৃহ এবং সম্প্রদায় যখন

সামাজিক শিক্ষাদানে অক্ষম তখন বিদ্যালয়কেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তাই বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান যেখানে শিক্ষার্থী সমাজ জীবনের উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও কর্মসূচী এমন হবে যেন শিক্ষার্থী সমাজজীবনে অভ্যস্ত হওয়ার উপযোগী অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করতে পারে। সামাজিক সংস্থা হিসেবে বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীকে সমাজীকরণের দায়িত্ব নেবে। সমাজবিদ্যার উপযোগিতা এখানেই নিহিত। সমাজবিদ্যাই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী জানতে পারবে সমাজ জীবনের রূপ ও বৈচিত্র্য, তার অতীত ও বর্তমান উত্থান, প্রগতি ও পরিবর্তন। শিক্ষার্থীর মনে চেতনা জাগবে, কি করে বর্তমানকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়। এর মধ্যে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর মনে জাগবে স্বদেশ-প্রীতি অন্য দিকে তেমনি আন্তর্জাতিকতার বীজ অংকুরিত হবে—ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হবে তার মন থেকে। সে বুঝবে, এই পৃথিবীর মানুষ এক। সমাজবিদ্যাই একমাত্র বিষয় যা শিক্ষার্থীর মনে এমনি করে সার্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের শিক্ষা দিতে পারে।

(গ) **ব্যবহারিক যুক্তি (Practical Reasons):** ভারত আজ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বিশাল এই ভারতের গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের মন গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সার্বজনীনতা ও পরম সহিষ্ণুতা ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার পুনর্গঠনমূলক কর্মসূচীর বিশেষ লক্ষ্য হল এই বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করা। ভারতরাষ্ট্রের তৃতীয় লক্ষ্য হল দেশবাসীকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা। এই লক্ষ্যকে কার্যে পরিণত করবার জন্য অর্থনৈতিক বিবিধ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। এই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জাতীয় নীতি হিসেবে গৃহীত। এই নীতিগুলিকে কাজে পরিণত করতে হলে শিক্ষার পুনর্গঠন নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। এজন্য সমাজবিদ্যা-নামক নতুন বিষয়কে মূল পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

বর্তমান ভারতের শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক ভাবধারায় তৈরী করা প্রয়োজন। কারণ, পরিণামে এই শিক্ষার্থীরাই ভারতের ভাবী নাগরিক হয়ে স্বীয় অধিকার

ভোগ ও কর্তব্য পালন করবে। এই শিক্ষা একমাত্র সমাজবিদ্যাই দিতে পারে। সমাজবিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী জানবে তার পরিজন, পরিবেশ ও দেশবাসীকে। সে জানবে পারস্পারিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল-মন্দ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ইত্যাদি। এর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীর মন থেকে ভেদাভেদ জ্ঞান দূরীভূত হবে, সে হিংসা, দ্বেষ, বাদ-বিসংবাদ ভুলে গিয়ে সার্বজনীন চিন্তায় ও পরমত-সহিষ্ণুতার শিক্ষায় দীক্ষিত হবে। নিজেকে ও স্বদেশকে প্রকৃতই যদি সে চিনতে পারে তবে সে চেষ্টা করবে ভারতকে দারিদ্র্য মুক্ত করে সুন্দর ও ঐশ্বর্যময় ভারত গঠণ করতে। সেই স্বপ্নময় ভারতের প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষার্থীকে প্রথমে হতে হবে সুনাগরিক। সমাজবিদ্যাই শিক্ষার্থীর শরীর ও মনে সুনাগরিকের গুণাবলী, নৈপুণ্য ও সামর্থ্যে বিকাশ ঘটাতে পারে। বৈচিত্র্যময় ভারতকে যদি সে চিনতে পারে তাহলে মরু, পর্বত, উপত্যকা, বনজঙ্গল, ভাষা, আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ও সভ্যতার পার্থক্য তাকে আটকে রাখতে পারবে না। আজকের দিনের শিক্ষার্থীরাই গড়ে তুলবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সমাজবিদ্যাই শিক্ষার্থীকে দিতে পারে সেই জ্ঞান, সেই অভিজ্ঞতা, সেই সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন শিক্ষা।

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান মানুষকে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী করেছে। ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের অতুলনীয় প্রভাব এবং উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষকে যে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী করেছে, সে শক্তিকে সংযত ও সুসমন্বিতভাবে প্রয়োগ করার স্থৈর্য মানুষের নেই। একদিকে ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রভাব, অন্যদিকে আত্মিক শক্তির অবহেলা মানব সভ্যতায় যে প্রত্যয়ের সংকট সৃষ্টি করেছে তাকে দুই সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব (Conflict of two cultures) বলে অভিহিত করা হয়। অশান্ত পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মানুষের মনে আনতে হবে পরিবর্তন। কিন্তু যে-মন সুনির্দিষ্ট ছাঁচে গঠিত তার পরিবর্তন আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অপেক্ষা করতে হবে ভাবী সুনাগরিকদের জন্য। আজকের শিক্ষার্থীরাই ভাবীকালের সুনাগরিক হবে। তাদের মন থেকে জাতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভেদাভেদ দূর করে দিয়ে সর্বমানবধর্মী গুণরাজির প্রতিষ্ঠা করতে হবে—তাদের শেখাতে হবে পরমত সহিষ্ণুতা, সার্বজনীনতা, বিশ্বজনীনতা। বিদ্যালয় পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে সমাজবিদ্যাই দিতে পারে এই শিক্ষা। সমাজবিদ্যাই ঘটাতে পারে মানসিক প্রসারতা, আনতে পারে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। বিদ্যালয়ে পঠিত অন্যান্য বিষয়াদি

শিক্ষার্থীর এসব গুণাবলী বিকাশে তত্ত্বগতভাবে অংশত সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ব্যবহারিক ভিত্তিতে অর্জিত গুণ ও কৌশলাদি অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী ও কর্মমুখীন। আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে আমরা শিক্ষার এই ব্যবহারিক দিকটাকে কোনক্রমে অবহেলা করতে পারি না। সমাজবিদ্যা তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার সংযোগ সাধনে অগ্রগামী। অতএব সমাজবিদ্যাকে মূল পাঠ্য তালিকার (Core Curriculum) অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন ।

(ঘ) **শিক্ষামূলক যুক্তি (Educational Reason) ঃ** শিক্ষা ও জীবন সমব্যাপক—শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোন সীমা নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষা লাভ দু' প্রকারে সম্ভব, (১) পাঠানুশীলনের মাধ্যমে আর (২) ব্যবহারিক কাজ-কর্মের ভেতর দিয়ে। জীবিকার্জনের জন্য মানুষ যখন কর্মে লিপ্ত হয়, তখন পাঠ চর্চার সুযোগ অনেকের থাকে না। সাধারণতঃ পাঠানুশীলন ততদিন সম্ভব যতদিন মানুষ ছাত্রাবস্থা বজায় রাখতে পারে। তাই সাংসারিক জটিলতার আবর্তে অনেককে বলতে শোনা যায়—'আমি ইতিহাস পড়িনি, আমি শাসনতন্ত্র জানি না'—ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিটি মানুষের তার সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। সমাজবিদ্যা এরূপ একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ভাণ্ডার। সাংসারিক কর্ম জীবনে প্রবেশের পূর্বে সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীকে জ্ঞান লাভের অপূর্ব সুযোগ প্রদান করে। শিক্ষার্থীকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার অর্থ, বাস্তব জীবনে সহায়ক বহু তথ্য ও তত্ত্ব জ্ঞান থেকে তাকে বঞ্চিত করা। সুতরাং একারণেও আমরা সমাজবিদ্যাকে মূল পাঠ্যসূচীর (Core Curriculum) অন্তর্ভূক্ত করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী

(Social Studies Curriculum)

সমাজবিদ্যার ক্ষেত্র ও তার পরিধি বহু বিস্তৃত। জীবন ও সমাজের সবটুকুই সমাজবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর সীমা নির্দেশ করা দুরূহ। এ যেন অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীদের সময় ও সামর্থ্য সীমিত। তাদের এই সীমাবদ্ধ সময় ও সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় যুগোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। কিন্তু কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও সমস্যা জর্জরিত। অথচ এমন কোন যাদুমন্ত্র নেই যার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ সুন্দর ও নিখুঁত হতে পারে। পরিবর্তনশীল কালের গতির সঙ্গে মানুষ ও তার সমাজের প্রয়োজন যথারীতি বিবর্তিত হয়। তবুও সামাজিক এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যতদূর সম্ভব ব্যক্তি ও পরিবেশের প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের নীতি নির্ধারণ একান্ত কাম্য।

১। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে পাঠ্যসূচী সংগঠনের নীতি (Principles of Curriculum Construction according to the Secondary Education Commission) :

মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করেছেন।[1] সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী সংগঠনের ক্ষেত্রেও সেগুলি পুনর্বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত।

প্রথমতঃ, আধুনিক শিক্ষানীতি অনুসারে শুধু শ্রেণী কক্ষে যে-সব বিষয় পড়ান হবে, তাই-ই পাঠ্যসূচী নয়। যুগধর্ম হিসেবে সেই চিরাচরিত প্রথা আজ পরিত্যজ্য। শ্রেণীকক্ষে, পাঠাগারে, গবেষণাগারে, কর্মশালায়, খেলার

1. Report of the Secondary Education Commission (1952-53), Chapter VI Page-66.

মাঠে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমবেত কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষার্থীরা যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সব কিছুই পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শারীরিক ও মানসিক সব দিকের পূর্ণ বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। চিন্তার সঙ্গে কর্মের সংযোগ যদি হয় তবেই শিক্ষা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ আছে। শিক্ষার্থী যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবেই সে সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের (balanced personality) অধিকারী হবে। সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী প্রণয়ণে এই নীতি অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্যসূচীর বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনশীলতা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে। আধুনিক শিক্ষানীতি মনোবিজ্ঞান আশ্রিত। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক অবস্থা, মস্তিষ্কের গ্রহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতার উপর শিক্ষণীয় বিষয়ের গুরুত্ব ও পরিমাণ নির্ভর করে। তাদের ইচ্ছা ও রুচির বিরুদ্ধে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে বিষয়বস্তুর উপর স্বাভাবিক ভাবে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। এই বিতৃষ্ণাই শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শিক্ষাদানের সমুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় নীতিও অপরিহার্য। তাই পাঠ্যসূচীকে বৈচিত্র্যময়, সম্প্রসারণশীল করে গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'পরিবেশ পরিচিতি'তে শিশু-মনের স্বাভাবিক বিকাশের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অতি পরিচিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিশু-মন ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শিশুরা এসকল বিষয়গুলি পৃথক পৃথক না পড়ে একত্রে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রেখেই পাঠাভ্যাস করে। 'পরিবেশ পরিচিতিতে' ব্যবহারিক শিক্ষালাভের অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীতে ঠিক একই উপায়ে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগদানের প্রচেষ্টা চলছে। এখানে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীও সমবায় কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে নিজেকে অন্য বন্ধুদের একজন বলে বুঝতে পারবে এবং তারও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ স্বাভাবিক হবে—এতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ব্যতিরেকে শিক্ষা সম্পর্কীয় চিন্তা অমূলক। পাঠ্যস্থচী নির্ধারণের স্থত্র এমন হওয়া উচিত, যেন সমাজ জীবনের সঙ্গেও পাঠ্যস্থচীর নিবিড় সম্পর্ক থাকে। শিশু যেন সমাজ-জীবনের বিশেষ বিশেষ ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। সংঘবদ্ধ মানব জাতির মেরুদণ্ড হল উৎপাদনমূলক কাজ। এই উৎপাদন মূলক কাজ ব্যতীত সমাজের প্রগতি অব্যাহত থাকতে পারে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সমাজ-জীবনে প্রবেশ করবে এবং অল্প সংখ্যক উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের নেতৃত্ব করবে। স্থতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীতে উৎপাদনমূলক কাজের স্থান নির্দেশ করা উচিত। শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যস্থচী দেশ ও কালের প্রয়োজন অনুসারে যাতে পরিবর্তনশীল হয়, সেরূপ নির্দেশও থাকা বাঞ্ছনীয়। সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচী পরিবর্তনশীল, বাস্তবধর্মী ও সমাজধর্মী হওয়া উচিত, যেন শিক্ষার্থী সমাজের অঙ্গ হিসেবে স্বদেশের মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

চতুর্থতঃ, কর্ম ও বিশ্বাস দুই-ই জীবনের অঙ্গ। একটি ছাড়া অন্যটি একঘেয়েমির নামান্তর। পাঠ্যস্থচী প্রবর্তন করার সময় পড়াশুনার সঙ্গে অবসর বিনোদনের স্থযোগ স্থবিধের দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কর্মের রুচি নিহিত অছে বিশ্রামের অন্তরালে আবার বিশ্রামের রুচি আছে কর্মের প্রাণবস্তুতে। উভয়ের সংমিশ্রণে স্থরুচির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। শিশুর ভবিষ্যৎকে স্থন্দর করে গড়ে তুলতে হলে স্থরুচির স্থান অনস্বীকার্য। সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচীতে শিশু-মনকে স্থরুচিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার অপূর্ব স্থযোগ রয়েছে। সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক দিকটা শিক্ষার্থীকে যেমন কর্মে নিয়োগ করে তেমনি অবসর বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দ বর্ধন করে। এখানেও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড, খেলাধূলা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানবিক পূর্ণ বিকাশ সাধনের এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের রুচিসম্পন্ন স্থনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলবার স্থযোগ বিদ্যমান। স্থতরাং সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচী প্রস্তুত করার সময় উক্ত স্থযোগ যাতে স্থষ্ঠু ও প্রকৃষ্ট পরিমাণে থাকতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত।

অবশেষে বলা যায়, পাঠ্যস্থচীর অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে পরস্পর সম্পর্কবিহীন পৃথক পৃথক মনে না করে সামগ্রিক জীবন ধারার এক-একটি দিক হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু-সংগঠন

এই নীতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। এখানে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মানব জীবন ও সমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিকে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে অনুবন্ধ (Correlation), সংমিশ্রণ (fusion) এবং সংহতি-র (Integration)-নীতি পূর্ণভাবে গ্রাহ্য এবং সমগ্র বিষয়বস্তুর কেন্দ্র হল মানব জীবন। অতএব সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত তা যেন সামাজিক মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক পার্থক্য হারিয়ে জীবনের এক-একটি দিক হিসেবে শিক্ষার্থীর মনে দানা বাঁধতে পারে। শিক্ষার্থী নিজেকে প্রস্তুত করবে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হবে মানবকে কেন্দ্র করে। নিজের বাড়ি, ঘর, গ্রাম, নগর ও স্বদেশের মানুষকে জেনে শিক্ষার্থী প্রবেশ করবে পৃথিবীর বৃহত্তর মানব সমাজে। সে বুঝবে মানুষ মাত্রই মানুষ, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এক; তারা একই বিশ্বে বসবাস করে।

২। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচন নীতি
(Principles for Selecting materials for Social Studies) :

মুদালিয়ার কমিশন নির্ধারিত নীতি সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচনে যথেষ্ট ফলপ্রসূ। তবুও নবজাত বিষয়টির জন্য নতুন কয়েকটি নীতির বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচনেব জন্য পৃথক ভাবে নিম্নলিখিত নীতিগুলি প্রণিধানযোগ্য :

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা আমাদের প্রথম নীতি।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষার্থীর শ্রেণী, বয়স, সামর্থ্য ও প্রবণতা সর্বাগ্রে বিবেচ্য। কিন্তু শ্রেণী ও বয়স যথাসম্ভব সমপর্যায়ের হলেও সামর্থ্য, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, প্রবণতা ইত্যাদি একই প্রকারের হতে পারে না। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সর্বজনগ্রাহ্য। বিষয়বস্তুর কোন নির্দিষ্ট অংশ সমানভাবে সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য ও ব্যাপকতা থাকলে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে পড়াশুনা করতে পারে। মোটকথা, শিক্ষার্থীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তার প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সব বিষয়বস্তু নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয়তঃ, গতিশীল মনুষ্য সমাজ চিরপরিবর্তনশীলও বটে। যা বর্তমান কালের চাহিদা মেটায়, যুগের পট পরিবর্তনে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেতে পারে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা একান্ত কাম্য। গতিশীল সমাজজীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি যেন এই সমাজবিদ্যায় রূপায়িত হয়।

চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি-গোষ্ঠী, গ্রাম-নগর, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং যথাযথ ভাবে আলোচিত হয়। ক্রিয়াশীল, অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর পরিবেশ হবে তার পরীক্ষণাগার (Laboratory)। আর এই পরীক্ষণাগারে সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত তত্ত্বগত (theoretical) বিদ্যার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কার্য পরিচালিত হবে। শিক্ষক হবেন কর্ম পরিচালক। ব্যবহারিক কর্মসূচী ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বার হবে উন্মুক্ত ও স্বাভাবিক। সামাজিক চেতনার নব নব পদক্ষেপ ও স্বরূপ জীবন্ত হয়ে উঠবে শিক্ষার্থীর নিকট।

পঞ্চমতঃ, বিচিত্র এই ভারতের সামাজিক স্বরূপ ও সমস্যাবলী আরও বিচিত্র ও সীমাহীন। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছাড়িয়ে আছে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী। পাঠ্যসূচী নির্বাচনের সময় এসব বিষয়গুলিকে সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত করে পাঠোপযোগী করে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় নীতির মূল কথাগুলিকে স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। গণতন্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র, জাতীয় সংহতি প্রভৃতিকে ভারত জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই নীতির বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সঠিক বিষয়বস্তু নির্বাচিত হলে সমাজবিদ্যাই হবে একমাত্র পাঠ্যবিষয় যার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় নীতির রূপায়ণ যথাসম্ভব জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।

ষষ্ঠতঃ, বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং তার সংস্থাপন বা বিন্যাস (organization) দুটি পৃথক কর্ম হলেও প্রতিটি কর্ম পরিচালনায় পরস্পরের সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই সমাজবিদ্যার বিষয় নির্বাচনে তার সংশ্লেষণ ও সংস্থাপনের কথা স্মরণ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের অনুধাবনের সুবিধার্থে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে অনুবন্ধ (Correlation), একীকরণ (Integration) ও একাত্মকরণের (fusion) নীতি অনুসরণ করা উচিত।

এমন পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন যেন মূল বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করার জন্য তার মধ্যে যথেষ্ট সংশ্লেষণমুখী সম্পর্ক থাকে। কারণ, পারস্পরিক সম্পর্ক বর্জিত বিষয় শিক্ষার্থীর ধারণা, কল্পনা, অনুভূতিকে প্রাণবন্ত করে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে এসব বিষয় জাতীয় সংহতির পথে কণ্টক স্বরূপ হতে পারে।

সপ্তমতঃ, বিষয় নির্বাচনে ও সংস্থানের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন বিষয়টি ক্রমশঃ সহজ থেকে কঠিন ও কঠিনতর এবং জানা থেকে অজানার দিকে গতিশীল হয়। শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ-ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যেন নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধিকরা পাঠ্যসূচী নির্বাচন ও সংস্থাপনের একান্ত ও অপরিহার্য নীতি বলে গণ্য হওয়া উচিত।

অবশেষে আমাদের মনে রাখা উচিত, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানবসমাজ আর পরস্পর পরস্পরকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। বিজ্ঞান আজ দূরকে করেছে নিকট। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি ব্যতীত আধুনিক সভ্যতায় টিকে থাকা অসম্ভব। কিন্তু হিংসা-দ্বেষ, বাদ-বিসম্বাদের অবসান আজো ঘটেনি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে মানুষ আজ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। কিন্তু সে শক্তি মানুষ মানুষের মানবিক সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য প্রয়োগ করবে, না, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যয় করবে, এ প্রশ্নের নিশ্চিত অবসান ঘটান প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার মূল লক্ষ্য মানব সম্পর্কের উন্নতি বিধান। কিশোরদের মনে শিক্ষার সুরুতে মানব-সম্পর্ক বোধ জাগ্রত করে শিক্ষার্থীকে সমাজমণ্ডিত করে তোলা চাই। তাহলে জ্ঞান ও শক্তিকে সে মানবজাতির মঙ্গলে নিয়োজিত করার চেষ্টা করবে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের তাগিদে সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অবশ্য মূল পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হওয়া উচিত। সমাজবিদ্যা এমনই একটি বিষয় যে ইহা একদিকে আনতে পারে জাতীয় সংহতি, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে জাতিতে জাতিতে মধুর সম্পর্ক। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সংগঠনের সময় এমন নীতি অনুসরণ করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মনের প্রসারতা গৃহ পরিবেশের গণ্ডী পেরিয়ে স্বদেশ ও বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থী যেন চিন্তা করতে পারে যে সে স্বদেশ ও বিশ্বের নাগরিক—পৃথিবীর মানুষ এক এবং সকলেই এক পৃথিবীরই নাগরিক।

৩। বিষয়-সূচী বিন্যাসের ধারা (**Pattern of Content Organisation**) :

বিগত কয়েক বছর পূর্ব থেকে সমাজবিদ্যা ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অবশ্য পাঠ্য হিসেবে গণ্য হয়েছে। বিষয়টি নবজাত, তাই এর বিষয়-বিন্যাস নীতিতে যথেষ্ট মতভেদ রয়ে গেছে। ফলে এর উন্নতির জন্য গবেষণা চলছে দিকে দিকে। তবে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও সংস্থাপন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে :

প্রথমতঃ, জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন এবং ক্রমশঃ কঠিনতর পথে পদক্ষেপ শিক্ষালাভের অন্যতম নীতি। সকলেই অজানাকে জানতে চায়। বিশেষ করে আশার স্বপ্নে বিভোর অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর মনে আজানাকে জানবার প্রবণতা অফুরন্ত। এই প্রবণতার পরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষার্থী জানা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয় জানতে প্রস্তুত। সুতরাং শিক্ষার্থীদের জানা বিষয় থেকে সমাজবিদ্যার উপস্থাপনা সুরু করা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন (basic needs) থেকে সুরু করে নিজ ও ভিন্ন সমাজের মানুষের এবং ক্রমশঃ বিশ্ব জনের প্রয়োজন ও সমস্যা আমরা সমাজবিদ্যার পাঠ্যবিষয় রূপে গ্রহণ করতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে সমাজবিদ্যার বিষয়সূচী সুসংগঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তি ও সামাজ, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ, সমাজের সর্বোচ্চ সংস্থা রাষ্ট্র ও তার বিভিন্ন অঙ্গ, সমাজের উত্থান ও প্রগতির কাহিনী এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল বিষয়াদি এবং উক্ত বিষয়াদির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু তৈরী হয়। এসকল বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিচারের সময় শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক প্রবণতা ও শিক্ষাস্তর প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সংযোজনা ও সংগঠনের তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা। এতদিন ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি, বিজ্ঞান, সমাজশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়গুলি মানুষের জীবন সমস্যাকে খণ্ড খণ্ড করে বিষয়গত সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আলোচিত হয়েছে। সমাজবিদ্যার বৈশিষ্ট্য হল উক্ত খণ্ডিত বিষয়গুলিকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন ভাবে সংশ্লেষিত করা যেন শিক্ষার্থীর অনুভূতিতে ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর মধ্যে সংহতি বিধানের জন্য শিক্ষাবিদরা যথেষ্ট চেষ্টা

করছেন। তাঁদের চেষ্টার গতি হল অনুবন্ধ (Correlation), একীকরণ (Integration) এবং একাত্মকরণের (fusion) দিকে। এই তিনটি নীতি সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সংস্থাপনার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। তাই এদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অনুবন্ধনীতি (Correlation) :

শিক্ষার্থীর পাঠ্য বা পঠিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোন ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করাই অনুবন্ধ।[1] বিদ্যালয়স্তরের অনুবন্ধ সাধন দু' প্রকারে সম্ভব—(ক) প্রাসঙ্গিক (incidental) এবং (খ) অপ্রাসঙ্গিক বা বিষয়গত অনুবন্ধ (Subject correlation)। প্রথমটাতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বর্তমান শিক্ষনীয় বিষয় বা ঘটনার সহিত অতীতের জ্ঞাত বা পঠিত বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন বা সম্পর্ক নির্ণয় করেন। স্বভাবতঃ এই জাতীয় সমন্বয় বিধানে শিক্ষকই হন একমাত্র অবলম্বন। তিনিই জানেন অতীতে শিক্ষার্থীরা কি পড়েছে বা শিখেছে, শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতার সীমা কতটুকু। তাই তার পক্ষে এরূপ সমন্বয় সাধন সহজসাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মালয়ের সামাজিক অবস্থা বিচার করার সময় তিনি আন্দামান বা বাংলার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় বিধান করতে পারেন। দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর সমাজব্যবস্থার তাৎপর্য বিচারের সময় প্রসঙ্গত 'চা' বাগানে গড়ে ওঠা অভিনব সমাজের উল্লেখ করতে পারেন।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিষয়গত অনুবন্ধ (Subject correlation) বিধানের সময় পূর্ব-পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। ইতিহাস ও ভূগোলের সম্বন্ধ বিধান এরূপ একটি পূর্বকল্পিত বিষয়। ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক অবদান ও ভূগোলে ঐতিহাসিক প্রভাবের পর্যালোচনা বিষয়গত সমন্বয়ের প্রচেষ্টা মাত্র। যেমন, মারাঠা শক্তির উত্থানে দক্ষিণভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে শিক্ষক তা

---

1. "Correlation means the seeking and utilizing of points of contact and relationships among subjects in order to bring about association in the general field of knowledge and, to some degree, among the various parts of the curriculum."

পাঠদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারেন। সমন্বয় সাধনের সময় বিষয়বস্তুর পর্থেক্যের দিকটা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করা যুক্তিযুক্ত। বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের মাত্রা অধিক পরিমাণে উপস্থাপনের ফলে শিক্ষার্থীর মনোরাজ্যে ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। এর ফলে সুসংহত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। নির্বাচিত বিষয়ের মধ্যে সংহতি সাধনের জন্য এই অনুবন্ধ (Correlation) অন্যতম নীতি।

একীকরণ (**Integration**) : সমাজবিদ্যার নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিন্যাসে একীকরণ একটি অপরিহার্য নীতি। কোন মূল বিষয় বা এককের (unit) পূর্ণ প্রকাশের জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর কার্যকরী প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য যথাযথ থাকলেও উহাদের সীমা (Demarcation) সম্পূর্ণ একাকার হয়ে মূল বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করে। এরই ফলে একীকরণ বা সংহতি আনয়ন সম্ভব হয়।[1] ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি এক একটি পৃথক পৃথক পাঠ্যবিষয়। প্রতিটি বিষয়ের সংজ্ঞা ও সীমা যেন নির্দিষ্ট দূরতিক্রম্য প্রাচীর। একীকরণের নীতিতে এই সীমার কোন চিহ্ন থাকে না, অথচ বিষয়বস্তু অবিকল রয়ে যায়।[2] একীকরণ বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে ; যেমন, কোন বিষয়কে একক ধরে তাকে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ : 'আমাদের খাদ্য' বিষয়টি একটি একক। এখন খাদ্যের উৎপাদন পর্যায়ে ভৌগোলিক প্রভাব ; সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বণ্টনে অর্থনীতি ও পৌরনীতি ; খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও বণ্টন-সমতা রক্ষায় মানববিদ্যা ; খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরতায় আন্তর্জাতিকতা ; খাদ্যের পুষ্টি নির্ধারণ, পুষ্টিরক্ষা ও মূল কৃষিজ বা বনজ খাদ্য থেকে রূপান্তর সম্পর্কে বিজ্ঞান শাস্ত্র থেকে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা যায়। ঠিক সেইরূপ 'প্রাচ্য সংস্কৃতিকে' একক ধরে যদি বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে হয় তাহলে শুধু ইতিহাস, ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে নয়, সেই যুগের শিল্প, কলা, সাহিত্যাদি থেকেও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু

1. "Integration means the creation of understanding that consists in integrated materials of instruction from several fields, in order to present a whole picture of a phase of knowledge rather than a part."

2. "There are no pass-ports or visas required at the boundaries of subjects. Students may cross and recross at will. Subjects are classfications and not restraing walls."

সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তা' হলে সেই যুগের সভ্যতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই দায়িত্ব পালনের জন্য বহুবিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সমাজবিদ্যার ক্ষেত্র ও পরিধির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদিতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তবেই শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় নির্বাচিত বিষয়ের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। শুধু পুস্তক রচনায় নহে, সমাজবিদ্যা পাঠে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন আছে।

একাত্মকরণ (Fusion) : একাত্ম করণ বলতে শুধু বিষয়গত গণ্ডী বা সীমানা নিশ্চিহ্ন করা নয়। এর ফলে নির্বাচিত বিষয়াদির রূপও পরিবর্তিত হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ইতিহাস তার সাল-তারিখ ও ঘটনার ঐতিহ্য হারায়, ভূগোল প্রাকৃতিক সীমা অতিক্রম করে মানব জীবন ও সমাজের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, অর্থনীতি অর্থতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মানব ও সমাজের নীতিগত বিষয়ের দিকে প্রসারিত হয়। এই নীতিতে বিশ্বাসী এমন অনেকে বলেন, একাত্মকরণে পাঠ্যসূচী সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের উন্নতিই মানুষের উন্নতি, মানুষের উন্নতিই সমাজের উন্নতি। তাই প্রতিটি বিষয়কে সমাজভিত্তিক করে গড়ে তোলাই বাঞ্ছনীয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিদ্যাই একমাত্র বিষয় যাকে বিনা দ্বিধায় সমাজভিত্তিক করে রচনা করা যায়। মানুষের এই সীমিত জীবনেও বহুকিছু জানবার ও শিখবার আছে। কিন্তু পৃথক পৃথক সবকিছু জানা বা শেখা সম্ভব নয়। একাত্মকরণ (fusion) নীতিতে বহু বিষয়কে একত্রে সুসংহত করা যায় এবং বহু বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষাও মিটতে পারে। সমাজবিদ্যার নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সংস্থাপন ও সুবিন্যাসের জন্য একাত্মকরণ (fusion) নীতিও এজন্য একান্ত অপরিহার্য।

৪। প্রচলিত পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা (Analysis of the existing Syllabus) :

মূলতঃ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারত সমাজবিদ্যাকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করবার প্রেরণা লাভ করে। নতুন বিষয়টির পাঠ্যসূচী সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা, চিন্তা, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চলেছে ও চলছে। পাঠ্যসূচী

সম্বন্ধে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এযাবৎকাল যতগুলি প্রতিষ্ঠান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন :

(১) ভারত সরকার ঘোষিত পাঠ্যসূচী।[1]

(২) নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি (All India Council for Secondary Education) কর্তৃক গঠিত পাঠ্যসূচী।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

(৪) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত মাধ্যমিক (দশম মান) বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

উচ্চ পাঠ্যসূচীগুলির মধ্যে প্রথমটি যথেষ্ট ত্রুটিবহুল। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সংগঠনের নীতিকে অগ্রাহ্য করে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি ইত্যাদি স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে একই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে মাত্র। তবে ভারত সরকারের এই পাঠ্যসূচীকে সমাজবিদ্যা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ধরা যেতে পারে। সেই হিসেবে এই পাঠ্যসূচীর মূল্য যথেষ্ট। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে উক্ত পাঠ্যসূচীর ন্যায় নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি (All India Council for Secondary Education) নতুন পাঠ্যসূচী ঘোষণা করেন। এই পাঠ্যসূচী ভারত সরকার ঘোষিত পাঠ্যসূচী অপেক্ষা যথেষ্ট ত্রুটি বর্জিত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ (Board of Secondary Education) এই পাঠ্যসূচীকে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে যেটুকু পার্থক্য দেখা যায় তা স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে গৃহীত। ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সামঞ্জস্য ও মান-সমতা রক্ষার জন্য নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি গঠিত। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা সাফল্যের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। এই পাঠ্যসূচীকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত একাদশ ও দশম মান বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীর ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করাও চলে। এক্ষণে আমরা (ক) নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি, (খ) পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ

---

1. Published in pamphlet No. 70, the Ministry of Education.

মাধ্যমিক এবং (গ) উচ্চতর মাধ্যমিক—মোট তিনটি পাঠ্যসূচীর পরিচয় ও বিষদ পর্যালোচনা করছি :

SYLLABUS

(ক) নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি (All India Council for Secondary Education) :

Part A

1. Living in Communities.

(i) Living in the local community—(i) How does the community meet the primary needs of food, clothing and shelter (this pre-supposes an intimate knowledge of the physical features, climatic conditions and natural resources of the locality. It includes items as the need for the right food, proper Sanitary houses and suitable clothing.)

(ii) How does the community provide for our safety, health, recreational and cultural needs ? Study of localities, water-supply, sanitation and lighting arrangements. Prevention of diseases and health services, recreational, cultural, and educational facilities. Protection againt fire and traffic accidents, prevention and control of crime.

(iii) How does the community meet its economic needs—survey of the main agricultural and industrial activities; interdependence of the community, the neighbouring region and the outside world ; trade and means of communication and transport; job opportunities for the young people in the localities.

2. Living in pre-historic and ancient communities :

(i) Early human settlement, primitive tools and occupations, earliest forms of Govt., family, clan and tribe ; the river valley civilization with emphasis on Mohenjodaro and Harappa—Unique achievement in the Sind Valley civilization reflecting concern for public welfare.

(ii) The abiding elements of the Greek and Roman civilization.

(iii) The Aryan civilization—a survey of early and later Vedic civilization; social and economic life of the people, the caste system and its effects; art, science and religion—Jainism, Buddhism, the age of Ashoka; th civilization of the Mouryas and Guptas. Expansion of Indian Culture, trade and commerce.

(iv) Indian life and art under the Sultanate and the Mughal rules. The spread of Islam, its impact and contributions. Medieval religions in India. Reformation and Bhakti movement. Heading towards a national monarchy (Alauddin Khalji, Shershah, Akbar). Mughals and their contributions to social and economic life, education, administration, art and architecture.

3. Communities in the world of to-day :

(i) A Malayan community. How the aborigines of the Malaya-Semang satisfy their basic needs through fruit gathering, fishing, hunting, and shifting agriculture. Growth of rubber plantation through imported Asian labour and European supervision. Development of other economic activities and trade. Reference to Congo and Amazan basins for comparison.

(ii) A mining community in West Australia. How the aborigines live in West Australia. Growth of mining towns in the desert and the solution of the problems of communication, and water and food-supply. For comparative study ; Bedowins of Arabia & Fellabin of Egypt.

(iii) A North-Chinese Community. Forms of forty centuries. Intensive agriculture and subsidiary occupations, such as Sericulture. Progress in New China.

(iv) A collective farm in Israel. Life before large-scale migration of Jews. Rapid development of agriculture

and industry under the planned economy. For Comparative study, Italy & Spain.

(v) A. Dutch community near Zuider-Zee-Land below sea-level, dykes. Fighting the sea for redaming land. Intensive mixed farming and dairy-farming.

(vi) An Industrial Community in Rhineland. Richness of natural resources and their suitable location; mining and industry; exchange of German Coal and French iron-ore. The effects of repeated wars.

(vii) Cattle and wheat farming in Argentine and in American Prairies. Comparative study for the two communities to bring out differences based on different levels of civilization in the two regions.

(viii) A Community on the bank of the St. Lawrenec Saw mills and paper mills running an hydro-electricity. Seasonal occupations of lumbering and trapping. Trade with the Red Indians and Eskimos.

(ix) A collective Reindeer Farm in North Sibeira. The old way and the new. Growing vegetables and wheat in the polar regions. Use of aero-planes and ice-breakers.

Part B.

Problems of living in the Modern World.

1. The Modern World takes shape in the West.

(i) A brief survey of the middle ages and Feudalism. Renaissance, the age of discovery and the development of oceanic trade. First contact of India with the west.

(ii) The rise of democracy in Great Britain. The French Revolution, its effects on other countries. The Industrial Revolution and its effects.

2. How India's civilization was influenced by the West.

(i) The British traders become rulers of India. Early European settlements. The decline of the Mughals.

The rise and fall at the Marathas, the Sikhs, Haider Ali and Tipu. The Regulating and Pitts India Act. Permanent Settlement of Bengal. Lord Bentinck's Reforms. Policy of annexation and expansion. National Resurgence of 1857 and Royal Proclamation·

(ii) India under the crown and growth of national consciousness.

Development of representative Institutions and Local Self-Government. Cultural and educational movements led by Raja Ram Mohan Roy and Sir Syed Ahmad Khan, Establisment of Indian national Congress. Morley-Minto and Moulague Chelmsford Reforms. Mahatama Gandhi, Non-Co-operation and Khilafat movements. Round Table conferènces and the act of 1935. Events leading to the partition. Independence, Integration of states, establishment of the Republic.

3. Living as citizens of Free India.

(a) Contributing to Happy Family Life. Young people as the architects of India's Destiny. Citizenship begins at home. Family as the fundamental social and economic unit in all communities, past and present. Family satisfies the basic needs of its members. Obligations of parents and children. Recent changes in the Indian family. Problem of "Improvident Maternity" and its remedies. Problems of crowded home slums.

(b) How well is the Community organised to satisfy our need for Education and Government.

(i) The school : Learning to know the school, the class-fellows, and the staff to get the most out of the school. Being a good citizen of your school. Organising the school as a democratic community, Choosing a vocation filling one's aptitudes and interests ; facilities for occupational training and suitable employment.

(ii) Local Government : Structure of local Govt. and its functioning. How we participate in local Govt., local

taxes and elections. Relationship of the local administration to the district and State administration.

(c) The Need for a National Government.

The National and State Governments have certain functions that they can discharge better than the local and district administration. Study in the outline of the Indian constitution and its relationship to other administrative units.

Fundamental rights and the role of the Judiciary.

4. The Task of National Reconstruction.

(i) Feeding India's Increasing Millions. Need for self sufficiency in food and its proper distribution. Bringing new lands under cultivation. Irrigation and multipurpose projects. Grow more food campaign, demonstration farms, better seeds, implements and manures. Intensive agriculture and increase in yield by the new methods. Consolidation of holdings, abolition of Zamindary, and Bhoodan Movement, credits facilities to cultivators and encouraging farmer's co-operatives.

(ii) Industrial Development for raising standard of Living. The Textile Industry : Our mineral power resoures, progress of heavy industries ; localisalion of Iron and steel Industry ; Small scale and cottage industries ; Educational and cultural development.

(iii) Study of the Five-year-Plans.

5. Living in the World Community.

(i) Development of Transport and communication. Commercial interdependence. A closely knit world.

(ii) Two world wars and the need for peace, league of Nations, U. N. O. and its Agencies. India's constribution to World peace. Panch sheela. Atomic Energy in the service of mankind.

নিখিল ভারত মাধ্যমিক-শিক্ষা সমিতি কর্তৃক ঘোষিত পাঠ্যসূচীর সমালোচনা মূলক বিশ্লেষণ

(Critical analysis of the syllabus suggested by All India Council for Secondary Education) :

নিখিল ভারত মাধ্যমিক-শিক্ষা সমিতি (All India Council for Secondary Education) কর্তৃক প্রচারিত সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী বহুলাংশে ত্রুটিমুক্ত বলা চলে। সমাজবিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ এই পাঠ্যসূচীতে স্পষ্টতর। ভারতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এই পাঠ্যসূচীতে মূর্ত। মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন নীতি যথাসম্ভব গৃহীত হয়েছে। এই পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর কৃতকার্য বা অকৃতকার্য বিচার করা ছাড়াও বিভিন্ন জীবন প্রচেষ্টায় এরা যথেষ্ট উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই পাঠ্যসূচীতে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতিকে সংযুক্ত করে বিষয়বস্তুর কলেবর বৃদ্ধির চেষ্টা হয় নি। বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানব জীবন আর তাকে পরিবেষ্টন করে বিষয়ান্তর থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংগৃহীত ও সংশ্লেষিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর বিন্যাসের জন্য একীকরণ (Integration) ও একাত্মকরণের (fusion) নীতি এখানে যথাসম্ভব রক্ষিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে মূল লক্ষ্য ও উপযোগিতার দিকে নজর রেখে এই পাঠ্যসূচী সংগঠিত। শিক্ষার্থীর অঞ্চল, গ্রাম, নগর ও দেশকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জানবার অপূর্ব সুযোগ প্রদত্ত হয়েছে এই পাঠ্যসূচীতে।

সমাজবিদ্যা আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতির প্রচেষ্টা প্রগতিমূলক। ভারতের রাজ্য সরকারগুলি স্থানীয় প্রয়োজনে একে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে প্রচলন করলে শিক্ষা-পুনর্গঠনের পথে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। অধিকন্তু এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষায় পুনর্গঠনমূলক বিবিধ গবেষণা কর্মে নিয়োজিত। সুতরাং সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী দেশকাল-পাত্র অনুযায়ী ক্রমশঃ উন্নত ও পরিমার্জিত হবে—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রচারিত একাদশ মানের বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ :

The Syllabus is divided into three main parts—I, II and III—dealing respectively with elements of Human Geography, the evolution of Indian culture and its contacts with other peoples, and some principles of Citizenship and Goverment. Section II will carry 50 Percent of the total marks allotted to Social Studies in the evalution of the work of the students ; Sections I and III will carry 25 percent each. It is proposed that Section I is to be covered in class IX and Section III in class X, while Section II may be studied in both the classes. A school should however have the freedom to depart from the proposed order to suit its own special convenience.

Some reference to books have been included. They are meant for the teachers and for authors who may have to write handy text-books for the students. The references however are illustrative rather than exhaustive.

SYLLABUS

Section I : Living in communities.

(a) Living in the Local Community in our own land : How does the community help us to meet our primary need of food, dress, shelter ?

(i) Food-gathering Economy :

The Andamanese—country and the people—fishing and hunting—collection of roots and leaves from the

jungle—houses and settlements—dress, utensils, weapons—family and group life—religion, music and dancing.

(ii) Pastoral Economy :

The farmers and pastoral people of the Almorra Hills—Seasonal migration moving with the cattle—temporary shelters and permanent villages—fairs and market scenes.

(iii) Agriculture :

Cultivation of rice and jute in the south of Bengal; plantations and forestry in the north. The Country where rice and jute are grown—food and clothing in the plains—transport by bullock carts or boats in the first stage—the sale and uses of jute and food crops—life in the villages of Lower Bengal. Plantation and manufacture of tea in the North—scenes and life in a tea-garden—villages and towns in the hills—forests and their uses—floating down timber to the plains.

(iv) Industries in Bengal :

Coal mining in the Asansol area—scenes in the iron works in Burnpore—Chittaranjan and the manufacture of railway engines and wagons—engineering works in Calcutta and Howrah—the organisation of rail and road transport—the port of Calcutta—the scattered small workshops—the new constructions is the DVC area. Contrast between an old town like Howrah and a new town like Chittaranjan.

(v) Villages and Towns in our country :

Scattered villages of lower Bengal or Kerala—compact villages of the Uttar Pradesh or the Panjab—different kinds of towns—our houses. Market villages—villages with Crafts like weaving or pottery. Fairs in the countryside for buyiug and selling of grains, cattle, cloth, implements, building materials, fisheries, etc. How villages grow larger and may fuse into towns. Story of the growth of Calcutta from three small villages.

(b) Living in different Regional Communities in foreign land—(Not more than four foreign regional communities out of the eight below are to be studied.

(i) A Collective reindeer farm in North Siberia.
(ii) A Malayan community.
(iii) A Community on the Bank of the St. Lawrence.
(iv) A Dutch Community near Zuyder Zee.
(v) A North Chinese Community.
(vi) Cattle and wheat farming in the American Prairies.
(vii) A mining community in West Australia.
(viii) An Industrial community in the Rhineland.

Section II :

Indian culture and contacts with the world (a review of the broad currents and significant epochs of Indian cultural evolution : a political frame work will be used only to the extent necessary to Preserve Continuity and the time-sequence)

(i) Basic factors in history : Man and his environment the physical features of India and the influence of geography on Indian history. Different races, languages, religions. Ways of life as well as common feature. Unity in diversity in India.

(ii) Types of source-material : archaeological relics, inscription and coins, literary records, Travel-accounts.

(iii) Our Pre-historic ruins : The story of important discoveries – the romance of archaeology—the Indus Valley culture.

(iv) The Aryan Vedic Civilization : Society, literature, religions Inter-action with non—Aryan culture—the emergence of the Great Epics and the social and institutional changes represented in them.

(v) Two great new religions : Buddhism and Jainism—their main teachings and importance in Indian history—the evolution of Buddhism and its advance into foreign lands.

(vi) The Maurya Age: The greatness of Asoka in histroy—inscription of Asoka—Maury society and culture—Megasthenese' account.

(vii) The Persian and Greek impacts on India: Extent and importance of Indo-Greek intercourse—The Greeks in the borderlands of India—the Indian contacts with Roman Empire—the question of Hellenic influence on India and Indian influence on the classical world.

(viii) The Age of Transition: the evolution in the five centuries after Asoka—art aud literature, society and religion, trade and economic conditions—the reign of Kanishka—The Sakas and other foreigners in the border-country.

(ix) The Gupta Age: Society and religion, art and literature, economic conditions, administration—the Huns and the fall of Gupta Empire—Harsha and his times—The Chinese Travellers Fa-hien and Hiuen Tsang.

(x) Early history of Bengal: Social, economic and cultural life from the Guptas to the age of the Palas and the Senas,

(xi) South Indian history: Early kingdoms and settlements—art and culture under the Pallavas, the Chalukyas, the cholas—Trade and economic conditions and activities—Hindu revivals from the south.

(xii) Indian culture abroad: Indian maritime and commercial activity—religious missions—Colonial enterprise and cultural expansion.

(xiii) The Rajputs in Indian history: Origin and activities—the dymastic struggles and disunion. Coming of Islam to India. The nature of Muslim conquest. Alberuni's account.

(xiv) Society and culture in Early Muslim Days: the Sultanate of Delhi and condition under it—the interaction between Hindu and Muslim cultures—conditions in the provincial regions, especially in Bengal and Vijayanagar.

xv) The Mughal Empire : the importance of Akbar —the Mughal system of administration—art and architecture society and economic conditions—literature—foreign travellers.

(xvi) The fall of the Mughal Empire : the advent of the Europeans—the rise and fall of the Marathas, Mysorean, and Sikh power—life and conditions in the 18th century.

(xvii) The building up of the British power in India : landmarks in the process of conquest—the administrative organisation—the relation with the Home Govts.—Popular struggles against the British—the Revolt of 1857.

(xviii) British impact on Indian economy : the destruction of the old order—the land settlements—changes in trade, transport, industry—modernisation in the economic life of the country sets in as a Process.

(xix) The Western cultural impact on India : the 19th century awakening in Bengal and elsewhere—liberal and scientific education from the west—creative literature and learning—social reform—religious reform—modern thought and out look in the conntry.

(xx) The National Movement and Liberation : national consciousness in early 19th century—genesis of national movements and agitations—the birth of National Congress and early leaders—gradual growth of a Left Nationalism—Bengal's Swadeshi upsurge—revolutionary terrorism—the impact of Gandhiji and his movement—the struggles for independence and its achievment. The Tasks Ahead—peace and prosperity for the people—national reconstruction and a Welfare state—a socialist pattern of society as the goal.

Section III : Citizenship and Government.

(a) Life in the Family and in a Locality : how we need the inner cricle of the family and relations and the outer

circle of different associations—What we learn from family life and the life in the associations—the elements of the Good Life and the qualities essential for developing such life.

(b) The Health of the Community : civic virtues and duties—the necessary provisions and amenities for the main tenance of public health and prevention of disease. Recreation and culture of community—organisations and activities of different types of Eduction.

(c) The peoples and its goverment : elections from time to time in modern communities—the right to vote and participate in public affairs—parties and what they want—freedom of the press, expression and association and consequent responsibilities—political life in a modern Community. Ideals of a democratic society. Democratic conduct in everyday life.

(d) Organisation of Local Administration : the Corporation in culcutta—the Municipalities in the towns—local self-government and local authorities in the districts and the countryside—modern Community Devolpment activities. The Protection of the Community, a necessary organisation for it.

(e) Democratic Govt. in our states and the Indian Union : how government is carried on ; the processes of deliberation, legislation adjudication and routine administration—the division of work between the centre and states—the various organs in the govermental system in India.

(f) Contacts with the outside world : political, economic and cultural contacts and the agencies for the same—Indian foreign policy—aims of peace and good will—the U. N. O. and the ideals of moving towards a World Community.

N.B. The Syllabus sketched above is not intended to be adhered to in a closed rigid, mechanical manner. It is only an attempt to map out field of social studies which can be followed as compulsory course in our Schools. The Schools

also should have the liberty to change the order in teaching to suit their convenience and to experiment on the course in any constructive way.

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যা পাঠ্যসূচীর দোষগুণ (Merits and demerits of the Social Studies Syllabus Suggested by the Board of Secondary Education) :

নিখিলভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি (AICSE) কর্তৃক প্রচারিত সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যসূচীর অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর নিমিত্ত নতুন পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেছেন। এই পাঠ্যসূচী প্রস্তুতির মূলে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এসম্পর্কে কমিশন বলেন—ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানকে পৃথক পৃথক না পড়িয়ে সামগ্রিক ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীতে রক্ষিত (Comprehensive study) পাঠ্যরূপে সমাজবিদ্যাকে প্রচলন করা যুক্তিযুক্ত। কমিশনের নির্দেশমত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ১৯৫৭ খ্রীঃ সমাজ-বিদ্যার নতুন পাঠ্যসূচী প্রচলন করেন। ভারত সরকার ঘোষিত পাঠ্যসূচী অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী অধিকতর ব্যাপক।

প্রথমতঃ, এই সমাজবিদ্যার প্রথম খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে মানবিকা ভূগোল (Element of human Geography)। এই খণ্ডে দেখা যায় আধুনিক সুসভ্য মানব, খাদ্য আহরণ ভিত্তিক ও পশুচারণ ভিত্তিক জীবনযাত্রা এবং আমাদের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ও শহর-নগর-গ্রামের বিবরণ আর পৃথিবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক জন-সমষ্টির জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় বিবরণ। এই অংশ পাঠে শিক্ষার্থীর মনে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু ইতিহাসের অতীত গতিধারা থেকে বিমুক্ত হয়ে ভারতীয় সমাজ-জীবনের বিকাশ ও বিবর্তন বিবৃত করেছে। সমাজবিদ্যাতে ইতিহাস শুধু সম্রাট, রাজা, মন্ত্রী, সাল-তারিখ, সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদির বিবরণ না হয়ে, ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যা সম্পর্ক অর্থাৎ জনগণের জীবন-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সমাজবিদ্যার এই অংশে অতীতের আলোকে বর্তমান ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের মানব

সমাজ গঠনের ইঙ্গিতে রয়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে আমাদের দেশের পৌরনীতি ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বিশ্বশান্তির জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ঘোষনা বরেছেন যে, বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় প্রয়োজন এবং সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দ্বারা সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনে সাফল্য লাভের চেষ্টা করতে পারেন।[1]

অবশ্য উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীতে ত্রুটীর পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য এত স্পষ্ট যে একাত্মকরণ, (fusion) ও একীকরণের (integration) একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র নির্ধারণ না করে একটি পুস্তকে শুধু ইহা একত্রে সংগ্রহ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক বিবর্তনে ভারতীয় সমাজের ধারা, ইতিহাসের যুগ, সাল-তারিখের বিভেদ-বিচারের ফলে এই পাঠ্যসূচীটি বিছিন্ন। অনেক শিক্ষককে বলতে শোনা যায়, সমাজবিদ্যার দ্বিতীয় অংশটুকুর পরিবর্তে ইতিহাস পড়ানই বাঞ্ছনীয়। রাজনীতির যুপকাষ্ঠ থেকে এই অংশ মুক্ত নহে। সম্রাট, সেনাপতি এবং তাঁদের যুদ্ধ-যাত্রার ঘটনাবলীর বাহুল্যে সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারনা এজন্য এখানে অবহেলিত।

তৃতীয়তঃ, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীতে ব্যবহারিক বিষয়সূচীর নির্দেশ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মমুখী শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে বঞ্চিত।

চতুর্থতঃ, আমাদের দেশে সকল শিক্ষাপ্রচেষ্টা পরীক্ষামুখী (examination-oriented)। বিশেষতঃ সাধারণী পরীক্ষার (public examination) প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক যে-সব বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয়, শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ সে-সব বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু সমাজবিদ্যার পরীক্ষা বিদ্যালয়েই গৃহীত হয়।

1. The Syllabus is not intended to be adhered to in a closed rigid, mechanical manner............The schools should also have the liberty to change the order in teaching to suit the convenience to experiment on the course in any constructive way.

প্রাপ্ত নম্বর যথাসময়ে একাদশ শ্রেণীর শেষ পরীক্ষার সময় নম্বর-পত্রে (Mark sheet) উল্লিখিত হয়।[1] অথচ সমাজবিদ্যা শেষ (final) সাধারণ পরীক্ষায় স্থান পায়নি। শিক্ষকগণ শুধু লক্ষ্য রাখেন সাধারণী পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা যেন ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের নিকট বিষয়টি অবহেলিত। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মূল্যায়নের জন্য বিশেষ প্রকারের পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়; অন্যথায় বিষয়টির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়—ইহা অবহেলিতই থেকে যাবে।

৭। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত দশম মান স্তরে সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী ঃ

Social studies has been introduced as an alternative course of Indian History and Geography to enable our boys and girls to know India as a whole and in relation to other parts of the world. Historical facts and geographical features find a place in it in so far as they contribute to this understanding. The course plans to give an idea of :

(i) Essential Geographical features of India.
(ii) Our basic needs and how we meet them,
(iii) Our cultural and social heritage,
(iv) Our struggle for independence,
(v) Our constitution and Government,
(vi) Our programme for social and economic reconstruction,
(vii) The place of India in the Comity of Nations,
(viii) The concept of 'One World'.

---

1. Schools should maintain necessary records of work done by students in these five (Core) Subjects. The Board may check the records from time to time.

The mark-sheet to be issued to a student on the results of the Boards' examination will also contain a record of his performance in the subjects assessed internally ; but the marks secured in these Core subjects will not count towards place in a division—Board of Secondary Education West Bengal., P. 8-9.

The course is to be tought in classes IX & X of X-class —schools in lieu of Indian History and Geography.

The timetable should be so adjusted that two consecutive periods are available when project work is undertaken.

SYLLABUS

Paper I : 100 marks

A. Introduction

Unit 1. The country we live in—its physical background—geographical position in relation to the rest of the world—the political set-up –the Indian Union and the constituent States—Living as citizens of free India.

B. Our basic Needs

Unit 2. Food–food taken in different parts of India–influence of environment (nature & social) on food habits—composition of our food and its nutritive value.

A comparative study of food in India and a few typical countries e.g. Arab countries, Mediterranean countries, Japan, Laplands etc.

Unit 3. Clothing–clothing worn in different parts of India —influence of environment (natural and social) on clothing —aesthetic factor in clothing.

A comparative study of clothing in India and a few typical countries e.g. Desertlands, undeveloped African countries, European countries, Polar Regions.

Unit 4. Shelter—types of our houses in different parts of India–influence of environment (natural and social) on housing–modern developments and problems of housing in India.

A comparative study of housing in India and a few typical countries e.g. Desert Lands, Polar Regions, European countries and U. S. A., African jungles.

Unit 5. Other needs—Consumers' goods and services.

C. How we Meet our Needs.

Unit 6. Our principal occupations for meeting the basic needs : agriculture and supplementary occupations, forestry, mining, fishing and pastoral occupation, industry, transport, social services e.g. education, health, entertainments, administration, law and order.

Unit 7. Detailed studies of important occupations and services.

(i) Agriculture—Principal crops—types of agriculture—geographical factors and methods of cultivation. Need for irrigation—the role of the River Valley projects in India's economic progress. The problem of self—sufficiency in food.

A comparative study between India and a few other countries e.g. Japan, Egypt, U. S. S. R. regarding crops, methods of cultivation and yield.

(ii) Occupation supplimentry to agriculture—fishing, animal husbandry, poultry, dairy, preservation of food.

(iii) Forestry—Important forest areas and products—utilisation, conservation and afforestation.

(iv) Mining—Mineral wealth of India—Important mining centres—utilisation and conservation.

(v) Industries—different types—heavy Industries e.g. iron and steel, Textile (jute, cotton, wool, silk, synthetic), chemical, ship-building, Locomotive, automobile and air craft industries.

Our cottage industries—Chief centres of production in West Bengal.

(vi) Transport and Communication in India—

Forms of communication and transport in rural and urban areas.

A comparative study of different forms of transport in typical areas e.g. desert land, polar regions, mountains etc.

A brief account of development of transport through the ages—invention of wheel and mechanical power—use of Steam, gas, electricity and atomic power—recent developments e.g. space ship.

Paper II : 100 marks

D. Our culture and Heritage.

Unit 8. (a) The past background—a short survey of the evolution of Indian culture and heritage through the ages (only land marks to be touched).

(b) Our Religion—Principal religions in India—Hinduism—Buddhism, Jainism—Christianity and Islam—teaching of some impotant religious reformers of medieval and modern times.

(c) Our Language—the chief language groups and linguistic areas—federal language and regional languages—medium of instruction at different stages of education.

(d) Our Art—some notable forms of art—Ajanta, Elora, Gandhara, Mohavalipuram, Mughal and Rajput art—modern art.

(e) Our architecture—Some notable forms of architecture—temples, Mosques, and other famous historical buildings.

(f) Our Music—Classical and other forms of music—Baul, Bhatiali, folk songs, Rabindra Sangeet.

(g) Our Dance—classical, modern and folk dances of India—their characteristics.

In the teaching of the above items it is not necessary to go into technical details. Attempt should be made to present things like music, dance, art and architecture in realistic settings with ample suitable illustrations.

E. Our National Government.

Unit 9. (a) Living as citizens of free India—Achievents of independence in 1947—building up a New India—a free,

sovereign, democratic republic with a rich heritage and culture—unity in diversity.

(b) How we attained independence in 1947. First war of independence against the British in 1857—growth of nationalism and the Indian National Congress—Partition of Bengal—Swadeshi Movement—Mahatma Gandhi and non-violent & non-co-operation Movement—Armed struggles in Bengal—August movement1942—Netaji & the 9. N. A: achievement of Independence in 1947.

c) Our National Government—the new constitution, fundamental rights, duties—federal character—Centre and Constituent units—Parliamentary government—Universal Suffrage and democratic government—how our loss are made and administered—our local administration.

India, a Welfare State—increasing role of goverment in the economic life of the people—India's striving for a socialistic goal.

F. India to-day.

Unit 10. Past indepence efforts towards reconstruction.

(a) Our immediate problems—growing population—economic problems—problems of health and education—our efforts to solve them. The Five year plans—the main features—development of power, heavy industries, commuuity devlopment etc. family planning.

(b) India's foreign trade—Commodities we generally export and commodities we import, countries with which most of the trading take place—change in the nature of trade especially with reference to trade-balance.

(c) India's foreign policy—policy of non-alignment—participation in world organisations—India's efforts in the preservation of World Peace—India's place in the comity of Nations.

G. Man as citizen of the world.

Unit 11. Shrinkage of distance through development of transport and communication facilities—growing interdependence of Nations and countries—necessity of World peace—World organisations and their efforts towards solution of international problems—Need of devoloping World-Mindedness.

PRACTICAL WORKS

The Practical work should consist of the following :

(a) Visits of educational value e.g. to factories, farms posts, museums, industrial and agricultural fairs, National Library etc. and preparation of individual and group reports of visits.

(b) Educational projects and activities and preparation of hand work, models, charts graphs and short reports.

(c) Maintenance of individual scrap book.

(d) Organisation of cultural and educational functions including educational exhibition.

(e) Celebration of Independence day and Republic Day.

Two consecutive periods should be available when project work is undertaken.

৮। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত দশমমান স্তরে সমাজবিদ্যা-পাঠ্যসূচীর দোষ-গুণ

(Merits and demerits of the School Final Syllabus announced by the West Bengal Board of Secondary Education) :

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ১৯৬৩ খ্রীঃ দশমমান স্তরে শেষ পরীক্ষায় (School Final) গ্রহণ করার জন্য সমাজবিদ্যার নতুন পাঠ্যসূচী প্রচলন করেন। পাঠ্যসূচীর গোড়াতেই পর্ষৎ ঘোষণা করেছেন যে, সমাজবিদ্যা ভারতীয় ইতিহাস ও

ভূগোলের পরিবর্তে প্রবর্তিত করা হয়েছে যাতে ছেলে-মেয়েরা ভারতকে সমগ্র ভাবে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সম্পর্কীভূত অবস্থায় জানতে পারে।[1]

দশমমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীও এই ঘোষিত নীতির উপরেই নির্ভর করে রচিত।

দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও রাজনীতির বিষয়বস্তুর সীমারেখা ভেঙ্গে একাত্মকরণ (fusion) ও সংহতির (Integration) এক বিশেষ প্রচেষ্টা এই পাঠ্যসূচীতে পরিলক্ষিত হয়। এখানে ইতিহাস যেন তার প্রাধান্য হারিয়েছে। রাজার রাজত্ব, সৈন্য সমাবেশের জাঁকজমক, সন্ধি-চুক্তি, সন-তারিখ ইত্যাদি যেন বিলীন হয়ে মানুষ আর তার জীবনকে কেন্দ্র করে সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব ও অগ্রগতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভূগোল এখানে ভূখণ্ডের আকৃতি, প্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বতের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেয়ে ভৌগোলিক পরিবেশে মানব ও মানব-সমাজের পারস্পরিক প্রভাবে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। অর্থনীতি ও পৌরনীতি তত্ত্বগত আলোচনার নাগ-পাশ থেকে মুক্তি পেয়ে শুধু মানব সমাজের বাস্তব প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক অংশ টুকুই সমাজবিদ্যার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এক কথায় সমাজবিদ্যায় জনগণের জীবনই কেন্দ্রীয় বিষয়; তাকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত করার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেন একাকার হয়ে গেছে।

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু একক নির্ধারক পদ্ধতিতে (unit procedure) সুবিন্যস্ত। এই পাঠক্রমে আছে মোট এগারটি একক। এককগুলি সাতটি অংশে এবং অংশগুলি দুটি পত্রে বিভক্ত। আমাদের দেশের পরিচয়, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, প্রয়োজন মেটাবার উপায়, আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, জাতীয় সরকার, নব্য ভারত, বিশ্বের নাগরিক হিসেবে মানুষ—ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বদেশ ও সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবে—আর জানবে, পৃথিবীর মানুষ এক, প্রত্যেকেই মানব জাতির অংশ। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক: 'আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর' (Our basic needs) মধ্যে খাদ্য একটি ইউনিট বা একক। এখানে কেবল বাঙ্গালীর খাদ্য নহে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও পৃথিবীর বিশেষ

1. Social Studies has been introduced as an alternative Course to Indian History and Geography to enable our boys, and girls to know India as whole and in relation to other parts of the world.

বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের খাদ্য ও তার উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সার্বিক ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী। এর ফলে সমাজবিদ্যার মাধ্যমে শুধু জাতীয় সংহতি নহে আন্তর্জাতিক ভাবধারাও শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চতুর্থতঃ, পাঠ্যসূচীতে ব্যবহারিক কর্মসূচীর (Practical works) নির্দেশ আছে। এই অংশ পাঠ্যসূচীর তত্ত্বগত বিষয়কে সহজ ও প্রাঞ্জল করে তুলেছে। পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যার পরিণাম শিক্ষার্থীর জীবনে ভয়াবহ। "আমাদের জীবন পুঁথিশালার অন্ধকারাচ্ছন্ন বদ্ধ ঘরে মাথা খুঁটে মরছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিও আমাদের লুপ্ত প্রায়।" সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক দিকটা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই কর্মতৎপর করে তুলবে। ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই যথেষ্ট চিন্তা করবার ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের জন্য কর্মতৎপর হবার সুযোগ এতে পেতে পারেন। পাঠ্যসূচীর এই ব্যবহারিক অংশ সমাজবিদ্যায় জীবনীশক্তি সঞ্চার করেছে।

পঞ্চমতঃ, পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকারদের প্রতি নির্দেশগুলিও প্রনিধানযোগ্য। পর্ষতের নির্দেশ হচ্ছে—"পুস্তকখানি যথাযোগ্য উদাহরণ সম্বলিত হবে। ছক্, ছবি ও প্রশ্নাবলী দিয়ে পুস্তকের কলেবর অনধিক ৫৪০ পৃষ্ঠা হবে। শতকরা দশ পাতা অতিরিক্ত লেখা যেতে পারে। বইয়ের ভাষা সহজ ও সরল হওয়া চাই।"[1]

পুস্তক রচনার এই নির্দেশের জন্য প্রয়োজন যোগ্য গ্রন্থকার। যোগ্য রচয়িতা যদি শিক্ষক হয়ে থাকেন তবে তাঁর রচিত পুস্তক একাধারে যোগ্য লেখকের গুণ এবং শিক্ষণ কার্যের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হবে।

ষষ্ঠতঃ, প্রতি অধ্যায়ের শেষে (i) রচনাধর্মী (Essay type), (ii) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক (Short answer type) এবং (iii) বস্তুধর্মী (Objective type) প্রশ্ন সংযোজনার নির্দেশ আছে। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে

---

1. The book should be suitably illustrated. The total volmue of the book, including diagrams, pictures and questions, should not rxceed 540 pages. A relaxation up to 10 P. C. over the total page limit may be allowed. Language of the book should be very simple.

জ্ঞান অর্জনে ও প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশে এসব প্রশ্ন সংযোজনের যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

বর্তমানের মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত সমাজবিদ্যার পাঠসূচী সম্পর্কে প্রশংসা করবার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও সূচী ও নির্দেশনা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রশ্নপত্র ইংরেজীতে রচিত হবে। আমরা মনে করি, এ নির্দেশ যুক্তিযুক্ত নয়। শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করে ইংরেজী প্রশ্নপত্রের জন্য প্রস্তুত হবে, ইহা ঠিক নহে। ইংরেজী ও বাংলা বা মাতৃভাষায় প্রশ্নপত্র রচিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানব সভ্যতার ধারাও চিরপরিবর্তনশীল। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের এই পট পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীতে এই পরিবর্তন বা নতুনত্বের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্ত বিষয় হিসেবে সমাজবিদ্যার অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করার অবকাশ আছে। ইতিহাস ও ভৌগোলিক বিষয় ছাড়া সমাজবিদ্যার মধ্যে প্রয়োজনীয় বহু বিষয় আলোচিত হয়। ভবিষ্যৎ নাগরিককে উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলার জন্য তাদের 'ভবিষ্যৎ দৃষ্টি' (forward look) প্রসারের যথোপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সংযোজনার প্রয়োজন। তাই সমাজবিদ্যাকে বাঁধাধরা সীমিত গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলিত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাদান পদ্ধতি

(Method of teaching)

১। শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্ব (The importance of the Method of teaching):

মানব সভ্যতা চির পরিবর্তনশীল। সভ্যতার প্রগতির পথে এমন এক একটি সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় যখন নতুন পথের সন্ধানে এক একটা জাতি সামগ্রিক ভাবে আত্মনিয়োগ করে। স্বাধীনোত্তর ভারত ঠিক এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছে। তাই এখানে জাতীয় সর্বস্তরে চলেছে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখা ও প্রগতির পথে অগ্রসর করে দেওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা ও গবেষণার অন্ত নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক ও অবিভাবক মহলে স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রশ্ন উঠেছে। সমাজবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী শিক্ষককে এর শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ার কি প্রয়োজন আছে? অনেকে বলেন, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর পাণ্ডিত্য অর্জনই আসল প্রয়োজন। পাণ্ডিত্য থাকলে তিনি নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীদের যথাযথ সাহায্য করতে সমর্থ হবেন। তিনিই জানেন, কি উপায় অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীকে মনের মত করে তৈরী করা যায়। এর জন্য পৃথক পদ্ধতি শিক্ষণের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে, অন্য একটি দল পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের পক্ষপাতী।

তারা বলেন, শিক্ষক সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন—এটা সম্পূর্ণ আশা করা যায় না; কোন না কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক। ফলে, পদ্ধতি প্রয়োগে জ্ঞান লাভ করলে শিক্ষার্থীর অভাব অভিযোগ জানতে ও বুঝতে সুবিধা

হয়। প্রতিভাবান্ শিক্ষকের (born teacher) সংখ্যা অতি নগণ্য। জাতির প্রয়োজনে শিক্ষায়তনের সাথে সাথে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকতায় রত সকলকেই প্রতিভাবান্ শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। পূর্বোক্ত উভয় মতের সত্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্বেই এ বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রত্যেকের প্রয়োজন। শিক্ষক যে স্ব-স্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন তাতে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু পঠন-পাঠনের সময় যদি তিনি ছাত্রের বয়স, মানসিক শক্তি প্রভৃতিকে পূর্ণমাত্রায় বিচার না করে স্বীয় পাণ্ডিত্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ব্যর্থ হবেন। মনোবিজ্ঞান শিক্ষা ক্ষেত্রে এনেছে বিবর্তন ও গতিশীলতা। শিক্ষাদর্শন মনোবিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং পদ্ধতি ব্যতীত শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাদানে ব্যর্থ হবেন—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সমাজবিদ্যার জন্যও এ অভিমত প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীনোত্তর ভারতে পাঠ্যরূপে ঘোষিত এই নবজাত বিষয়টিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন পদ্ধতি ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করা। অন্যথায়, শুধু শ্রেণীকক্ষে নয়, সমাজবিদ্যার প্রয়োগ ক্ষেত্রে অর্থাৎ সমাজের সুবিস্তৃত পরিসরে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা মোটেই সম্ভব নয়।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ শিক্ষাপরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলে অনেক সমস্যাবহুল ব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। পর্ষতের নির্দেশ মত সমাজবিদ্যার শেষ পরীক্ষা বিদ্যালয়েই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হিসেবে গৃহীত হয়। সুতরাং যে-কোন শিক্ষক যে-কোন উপায়ে পাঠ্যপুস্তকখানির কয়েকখানি পৃষ্ঠা পড়িয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। তাঁদের শুধু দৃষ্টি থাকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কারণ এই নম্বরটি মধ্যশিক্ষা পর্ষতের গোচরীভূত করতে স্কুল বাধ্য থাকে। দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে সমাজবিদ্যার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে দেখা যায়। কারণ, শেষ সাধারণী পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত এই সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন পদ্ধতির গুরুত্ব অত্যধিক। এই গুরুত্ব শিক্ষাপরিবেশে সমাদৃত হলে সমাজবিদ্যার লক্ষ্য ও উপযোগিতা সার্থক হবে।

এক্ষণে আমরা উপযুক্ত বা উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার প্রস্তাব করছি। কারণ, সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে যে পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলি আমরা গ্রহণ করি তার অনুকূল উপযোগিতা থাকা চাই।

২। উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a good Method of Teaching):

উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান:

(ক) এটা শিক্ষার্থীর সক্রিয় প্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করে।

(খ) উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতি শ্রেণী কক্ষের বাস্তব পরিবেশে শিক্ষকের পরিচালিত কর্মের ভিতর দিয়ে উদ্ভূত হয়।

(গ) উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপযোগিতা বাস্তবে রূপায়িত হয়।

(ঘ) উত্তম পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে সৃষ্টি হয় নতুন শিক্ষা পরিবেশ। এই পরিবেশে শিক্ষার্থী বাস্তব অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার সমাধানে নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাপৃত রাখে।

(ঙ) উত্তম পদ্ধতি শিক্ষককে মানসিক শান্তি ও কর্মে স্পৃহা দান করে। এই পদ্ধতি একপ্রকার কলা (Art), যা সৃষ্টির আনন্দ বিতরণ করে।

শিক্ষাদান যদি শিক্ষককে আত্মনিয়োগের প্রেরণা দান না করে, তাহলে সে কর্ম সৃষ্টিমূলক হতে পারে না। বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের প্রয়োগের কলা-কৌশল কর্মে প্রেরণা সৃষ্টি করে শিক্ষকতায় সার্থকতা আনতে পারে।

৩। পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ নীতি (General Principles regarding Method):

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এসব পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে পদ্ধতি সম্পর্কিত কতকগুলি সাধারণ নীতির কথা স্মরণ রেখে সমাজবিদ্যার শিক্ষককে শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও পদ্ধতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

(ক) প্রথমতঃ, মনে রাখা উচিত, সমাজবিদ্যার শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতামুখী। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজবিদ্যার তত্ত্বগত বিষয় যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। শিক্ষা হল গতিশীল এবং অভিজ্ঞতার সম্পদে পরিপূর্ণ। ফলে এই

অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই শিথার্থীকে সামাজিক পরিবেশের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত করতে এবং সমস্যা নিরসনে সাহায্য করে। কেবলমাত্র পুস্তকপাঠ ও ভাষায় বর্ণিত জ্ঞানের মধ্যে শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করলে তা বাস্তবের সহিত মুখোমুখী হতে পারে না, ফলে তার লব্ধজ্ঞান অচিরে বিলুপ্ত হয় এবং জীবনে কোন কাজে আসে না।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার পদ্ধতি হবে কর্মমুখী। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই আত্মনিয়োগ করতে হবে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠনে। এমন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে যেন উভয়ের চোখে থাকে সন্ধানী দৃষ্টি, আর মস্তিষ্কে থাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ; উভয়েই যেন সমাজের বাস্তব পরিবেশ থেকে নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতালাভের অদম্য প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতে পারেন। শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার্থীকে কর্মে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করা এবং সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় নির্ধারণ ও নির্দেশ দেওয়া। তাহলে শ্রেণীকক্ষের বাঁধাধরা রুটিন থেকে শিক্ষার্থী পাবে মুক্তি, আর বাস্তব কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা হবে জীবন্ত ও গতিশীল। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সময়-তালিকাকে (routine) একেবারে অবহেলা করা যায় না, তবে তালিকা-বাঁধা সময়ের মধ্যেও কর্মে প্রেরণা জাগান সমাজবিদ্যার পক্ষেই সহজসাধ্য।

(গ) সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হবে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, তেমনি শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের মানদণ্ড হবে শিশুর বয়স, শ্রেণী, আগ্রহ ও প্রবণতা অনুসারে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শনের শিশুকেন্দ্রিকতার কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। সমাজবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য থাকলেও শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক গ্রহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বিচারে উপযুক্ত বিষয়বস্তু শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) চতুর্থতঃ, সমাজবিদ্যার শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ উপলক্ষে শিক্ষককে আত্মসংযমী হতে হবে। বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষকের পাণ্ডিত্য থাকবে অথচ অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশ থেকে তাঁকে বিরত হতে হবে। অন্যথায় পাণ্ডিত্যের গর্ব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহজ সম্পর্ক সৃষ্টির প্রতিবন্ধক হবে। এজন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষককে যথেষ্ট কৌশলী ও সংযমী হওয়াও প্রয়োজন। অন্যথায় শিক্ষার্থী তার স্বতঃস্ফূর্ত ভাব হারিয়ে প্রথমে যন্ত্রের

মত বাধ্য হয়ে কাজ করে যাবে এবং এর ফলে সে বিশৃঙ্খল, উদ্ধত প্রকৃতির হয়ে বিদ্যালয় ও সামাজিক পরিবেশের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

(ঙ) পঞ্চমতঃ, পদ্ধতি প্রয়োগের অন্যতম উপযুক্ত উপায় হ'ল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এমন শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার যেন শিক্ষক অতি স্বাভাবিকভাবে পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। খোলা মনে ছাত্রদের সঙ্গে মিশবার সময় তাঁকে শিক্ষাপরিবেশের গুরুত্বের কথা ভুললে চলবে না। শিক্ষাপরিবেশ শিক্ষার্থীর চিন্তা ও মননকে সরাসরি কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

৪। সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods in teaching Social Studies):

সমাজবিদ্যা পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছবার জন্য আমরা তিনটি উপায় উদ্ভাবন করতে পারি। প্রথমতঃ, পুস্তকে লিখিত বিষয়বস্তুগুলিকে জানা। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি এবং তৃতীয়তঃ, পঠন-পাঠনের মাধ্যমে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ সাধন। পুস্তকে লিখিত বিষয় দ্বারা বিষয়গত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। বিষয়গুলির তাৎপর্য বোঝার অর্থই হ'ল সঠিক উপলব্ধি করা। বিষয়বস্তুর জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভের পথে অগ্রসর হলে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জন সহজসাধ্য হয় এবং এর ফলে তার বিবিধ গুণের বিকাশ ঘটে। সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন কালে শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে শিক্ষার্থী যেন, (১) বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে (২) কতকগুলি দক্ষতা, কৌশল ও অভ্যাস আয়ত্ব করতে পারে। এজন্য শিক্ষালাভের দুটি পন্থা বিদ্যমান, (১) বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা আর (২) সৃষ্ট পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষালাভ—যে পরিবেশে শিক্ষার্থী নতুন কৌশল, দক্ষতা ও বিবিধ গুণ অর্জন করতে পারে।[1]

প্রথম অংশের নিমিত্ত (ক) বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture method), (খ) গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি (Text book method), (গ) আলোচনা পদ্ধতি

1. "Social Studies has two sides; (1) Knowledge and concepts and (2) Development of attitudes and skills. Corresponding to these there are two ways of learning--learning via subject-matter and learning through organised situation to enable children to develop desirable attitudes and learn essential skills."—V. R. Taneja.

(Discussion method) যথেষ্ট কার্যকরী। দ্বিতীয় অংশের অর্থাৎ পরিবেশ সৃষ্টি করে এমন আচরণ, কৌশল, অভ্যাস ও দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত, (ঘ) প্রকল্প বা পরিকল্পনা পদ্ধতি (Project method), (ঙ) সমস্যা মূলক পদ্ধতি (Problem method), (চ) একক নির্ধারক পদ্ধতি (Unit method), (ছ) উৎস বা সূত্র সন্ধানী পদ্ধতি (Source method), (জ) সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি (Socialised recitation method) প্রভৃতি অনুসরণ করা যায়।

প্রথম তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে যে বিবিধ গুণ, কৌশল ও দক্ষতার বিকাশ ঘটে না—তা নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কিছু কিছু আচরণ, অভ্যাস, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ব করা যায়। তেমনি দ্বিতীয় অংশের পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও ধারণা লাভ করা সম্ভব। প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে মাত্রাগত পার্থক্য ছাড়া উভয় প্রকার পদ্ধতি পরস্পরের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত।

৫। (১) বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের পদ্ধতি (Methods for knowing subject matter) ঃ

বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) ঃ বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বহু সভ্য দেশে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। মধ্যযুগে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির সাথে সাথে এই প্রথার উদ্ভব ঘটে। গ্রীক পণ্ডিতদের মতবাদ শিক্ষার্থীদের গোচরীভূত করার জন্য তাঁদের পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এই প্রথাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। শুধু শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নয়, শিক্ষকদিগের জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি, নতুন নতুন বিষয়ের সংযোজন, সংশ্লেষণে এই পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয় আরো সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রথম এই বক্তৃতা পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে সমস্ত দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি গৃহীত হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথার পরিবর্তে বহু নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই বক্তৃতা পদ্ধতিকে নিতান্ত অবহেলার চোখে দেখে। সেখানকার অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে নিষেধ করেন। আবার কোথাও কোথাও বহু সংখ্যক ছাত্রবিশিষ্ট শ্রেণীতে বক্তৃতাদান পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না। ইউরোপ, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড এই পদ্ধতির মাধ্যমে যথেষ্ট সুফলও লাভ করেছে। এসব দেশের সাফল্যের পশ্চাতে উপযুক্ত শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। অতীতে ভারতেও এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। ইংরেজ রাজত্বে ভারতে পাশ্চাত্য দেশের প্রভাবে বক্তৃতাদান পদ্ধতির বহুল প্রচলন হয়। কিন্তু তবুও আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন বা অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে এই পদ্ধতির সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের যোগ্যতা। শিক্ষকের এই যোগ্যতা বিষয়বস্তুর উপর তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর ভাব, ভাষা, কণ্ঠস্বর, উপস্থাপনার কৌশল ও ক্ষমতায় অভিব্যক্ত। শিক্ষক তাঁর বক্তৃতাকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করার জন্য ছক, ছবি, নমুনা, মানচিত্র প্রভৃতি শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা (Advantage and disadvantage of lecture method) : সুবিধা (Advantage) : অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বক্তৃতাদানে শিক্ষক থাকেন শিক্ষার্থীর নিকট সান্নিধ্যে। ফলে শিক্ষার্থীদের সুবিধা, অসুবিধা ও বোধগম্যতা সম্পর্কে তিনি সহজে জানতে ও বুঝতে পারেন। প্রয়োজন মত তিনি বক্তৃতার ধারা ও ভাষা পরিবর্তন করে শিক্ষা-সহায়ক দ্রব্যাদির সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকে লিখিত ভাষা অপেক্ষা কথ্য ভাষা অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও সক্রিয়। কারণ, বক্তৃতাদান কালে শিক্ষক শুধু নিজস্ব ভাষা নয়, বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং সেই সঙ্গে তিনি নানা প্রকার ভাব ও ভঙ্গিমা প্রকাশ এবং দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারেন। এমনকি বক্তৃতার মাধ্যমে পুঁথিগত বিমূর্ত বিষয়কে সরল,

সহজ, জীবন্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার করার সুযোগ কথ্য ভাষাকে আরও প্রাঞ্জল করে তুলতে পারে।

তৃতীয়তঃ, বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শ্রবণ-অভিজ্ঞতা লাভেও সাহায্য করে। এই সকল শিক্ষার্থীরাই উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অথবা সংসারের বাস্তব পরিবেশে বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, কথোপকথন দ্বারা পারস্পরিক ভাব বিনিময় করবে। এর ফলে ভাষার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কথা বা বক্তৃতা শুনে তা' বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা শিক্ষার্থী অর্জন করবে। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ক্ষমতা অর্জন করা সহজ সাধ্য।

চতুর্থতঃ, সুশিক্ষক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সারগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের শুধু আকর্ষণ করেন না, তাদেরকে সৎপথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণাও দান করতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, বক্তৃতাকে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য শিক্ষককে পূর্ব থেকে প্রস্তুত হতে হয়। পূর্ব চিন্তিত ও সুপরিকল্পিত বক্তৃতা সহজে যেমন হৃদয়গ্রাহী হয় তেমনি বহু বিষয় উপস্থাপিত করার অপূর্ব সুযোগ থাকে। পাঠ্য বিষয়ের বাহুল্য শিক্ষার্থীকে অনেক সময় বিব্রত করে। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হলে শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়বস্তু সহজ ও প্রাঞ্জল হয় এবং সীমিত সময়ের মধ্যে সে পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করতে ও সামঞ্জস্য বিধান করতে সমর্থ হয়।

এসব সুবিধাগুলি ছাড়াও নিম্নোক্ত কারণে বক্তৃতা পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। প্রথমতঃ, কোন নতুন বিষয়ের পাঠ শুরু করার পূর্বে বিষয়বস্তুর পূর্ব সূত্র বজায় রাখার জন্য বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, এর ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বক্তৃতা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পূর্ব সূত্র বজায় রাখার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা অসম্ভব না হলেও সহজসাধ্য নয়। শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগতভাবে নতুন পাঠের প্রতি আকর্ষণ করা, নতুন বিষয় জানবার জন্য তাদের আগ্রহান্বিত করবার পক্ষে বক্তৃতাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীরা কোন নতুন অধ্যায়, একক সমস্যা বা ঘটনা পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না। তখন শিক্ষক কর্তৃক বিষয়টির ব্যাখ্যা, অন্বয়সাধন, দৃষ্টান্ত স্থাপন প্রভৃতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে বক্তৃতাই অন্যতম পন্থা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রাঞ্জল ভাষায়

বিষয়টিকে শ্রেণীকক্ষে সহজ ও সাবলীল করে তুলতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থী বিষয়টিকে সহজে এবং অল্প সময়ে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ের উপস্থাপনা শেষ হলে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি, সংক্ষিপ্তসার, মর্মকথা বা বিষয়টির অতি প্রয়োজনীয় ধারাগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন।

অসুবিধা (Disadvantages): এত গুণ থাকা সত্ত্বেও বক্তৃতা পদ্ধতি ত্রুটি মুক্ত নয়। প্রথমতঃ, শ্রেণী শিক্ষকই একমাত্র বক্তা—আর শিক্ষার্থীরা শ্রোতা। সময় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের শুধু বক্তৃতা শুনবার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। শুধু সমাজবিদ্যার জন্য নয়, এই পদ্ধতির বহুল প্রচলনে শিক্ষার্থীকে প্রতি ঘণ্টায় বক্তৃতা শুনেই কাটাতে হয়। সুতরাং তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। নিম্ন শ্রেণীতে বক্তৃতা মোটেই ফলপ্রসূ নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও উহার বাহুল্য যে নিতান্ত ক্ষতিকর, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তৃতার প্রাচুর্যে ছাত্র-ছাত্রীরা একান্তভাবে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে কোন সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত বা কোন বিষয়ের তাৎপর্য বোঝবার জন্য শিক্ষার্থী শিক্ষকের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কর্মের মাধ্যমে অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই আসল শিক্ষা। এই শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ থাকে। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। সক্রিয় অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ব করতে পারে। বক্তৃতা পদ্ধতি তাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ডিগ্রীধারী আবেদনকারীকেই কর্মে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সকলেই যে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারবেন এমন কোন নিশ্চিতি নেই। সুতরাং বক্তৃতা পদ্ধতির প্রাচুর্য এজন্য মোটেই সুফলপ্রসূ নয়। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতিটিকে একমাত্র বা অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করাও অযৌক্তিক।

মোট কথা, এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় বক্তৃতা পদ্ধতির নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি সুবিধা আছে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি

অপরিহার্য হিসেবে গণ্য। সুতরাং এই পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষক মহাশয়ের জেনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

(i) বক্তৃতাকে হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল করার জন্য শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক। কোন নতুন অধ্যায় বা এককের শুরু, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, সুদীর্ঘ বিষয়কে সংক্ষিপ্তকরণ, সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসামুখী ব্যাখ্যা, পরবর্তী পাঠক্রমের জন্য নির্দেশক সূচনা ইত্যাদি পঠন-পাঠনমূলক কর্মের নিমিত্ত শিক্ষক পূর্ব থেকে সময়, সুযোগ ও অবস্থা বুঝে বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হবেন। তাহলে বক্তৃতা হবে প্রেরণামূলক ও হৃদয়গ্রাহী।

(ii) প্রতিটি বক্তৃতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপকরণের প্রস্তুতিও বিশেষ প্রয়োজন। সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করলে শিক্ষার্থী সহজে উহা লিপিবদ্ধ করতে পারে। এরূপ করার ফলে শিক্ষার্থীকে যেমন ক্রিয়াশীল করা যায়, তেমনি শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা শিক্ষক সহজে অনুধাবন করতে পারেন এবং সেই ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করতেও পারেন।

(iii) শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতাদান কালে শিক্ষক নিশ্চয়ই সংযমী ও মনোযোগী হবেন। সুস্পষ্ট ভাষায় ধীরে ধীরে এমনভাবে তিনি বিষয় পরিবেশন করবেন যেন শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব মানসিক ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তিনি কোন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন না। তিনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন, আর তাদের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করছেন—এরূপ মনে করাই বাঞ্ছনীয়। এজন্য ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিমার পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কণ্ঠস্বরের তারতম্য ও ভাষার কলাকৌশলের পূর্ণ প্রকাশ হওয়া দরকার। এক ঘেয়েমির কুফল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কৌতুকের অবতারণা করাও যুক্তিসঙ্গত।

(iv) বক্তৃতা পদ্ধতির ফলাফল বিচারের জন্য মাঝে মাঝে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। তবে এমন ক্ষেত্রে নৈর্বক্তিক পরীক্ষা যুক্তিপূর্ণ। পদ্ধতির ফলাফল আশাপ্রদ না হলে শিক্ষক বিষয়টির পুনরাবৃত্তি দ্বারা সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারেন।[1]

---

1. "As a means of presenting Social Studies material, the informal lecture is a method and not the method. It should be used not freequently nor too hopefully."—E. B. Wesley.

(খ) গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি (Text Book Method): শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মে গ্রন্থানুসারে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া আমাদের দেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত। সেই প্রচলিত প্রথা বর্তমানে গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে গৃহীত। প্রথমদিকে পুস্তকে লিখিত বিষয় অবিকল মুখস্থ করার দিকে প্রবণতা ছিল বেশি। বিষয়বস্তুর প্রতিটি কথা ও চিহ্নাদি পর্যন্ত মুখস্থ করতে হত। এই প্রথায় শিক্ষক মহাশয়ের নিজস্ব কোন পরিশ্রম ছিল না। তিনি শ্রেণী কক্ষে সমষ্টিগত বা ব্যষ্টিগত ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তরগুলি ঠিক পুস্তকে মিলিত বিষয়ের অনুরূপ হচ্ছে কিনা এইটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য করায় বিষয়। ক্রমশঃ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ থেকে নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি লক্ষ্যণীয়।

(i) মুখস্থ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা (Attempt to increase the power of retention): মুখস্থ প্রণালীতে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কোন অধ্যায় বা তার কিছু অংশ পরবর্তী দিনের পাঠ্য হিসাবে মুখস্থ করার নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীরা গৃহে বার বার চেষ্টা করে নির্দিষ্ট বিষয়টি শিখবার বা আয়ত্ব করবার চেষ্টা করে। নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি মুখস্থ বলতে হয়। অনেকে সেটিকে অবিকল মুখস্থ বলে, আবার অনেকে নিজের ভাষায়—সহজ করে প্রকাশ করে। এই নীতি প্রয়োগে শিক্ষক বিষয়টিকে নানা অংশে বিভক্ত করে প্রতি অংশের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যদি কোন স্বল্প মেধার শিক্ষার্থী বিষয়টিকে আয়ত্ব করতে না পারে তবে সে অন্যের উত্তর শুনে শ্রেণীকক্ষেই পড়া তৈরী করতে পারে। কারণ, উত্তরগুলি শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে এই পদ্ধতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি আমরা আলোচনা করছি: প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর নিছক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশি এবং সেইটাই যেন হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে মুখস্থ খুব বেশী করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। ফলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির চর্চা খানিকটা হলেও বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত ভাবধারা বুঝবার দিকে প্রবণতা থাকে না এবং এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিজস্ব হতে পারে না। পুথিগত বিদ্যার কুফল তাই সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার সঙ্গে এই পদ্ধতির কোন সঙ্গতি থাকে না। তোতাপাখীর বুলি শেখানর প্রচেষ্টার সঙ্গে এই পদ্ধতিকে তুলনা করা চলে।

কারণ, অর্থ না বুঝে কতকগুলি বিষয়কে মুখস্থ করানর প্রবণতাই এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে।

(ii) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গ্রন্থপাঠ অনুশীলন (Study-habit of teacher and the taught : গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির অন্যতম শিক্ষাদান পরিকল্পনা হল পাঠ্য-পুস্তকে লিখিত বিষয় হুবহু অনুসর করা। এই রীতিতে পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক পাঠ্য পুস্তকের কোন একটি অংশ পড়তে শুরু করেন। পড়তে পড়তে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা, পূর্ব সূত্র সংযোজনা, কঠিন শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ—ইত্যাদি কার্যে লিপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যার উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা ও বোধশক্তির খানিকটা চর্চা হয়। অনেক সময় শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট একটি বিষয় পড়তে নির্দেশ দেন। পঠিত বিষয়ের প্রতি অন্যের মনোযোগ যাচাই করবার জন্যও তিনি নানা প্রশ্নের অবতারণা করেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শিক্ষক পাঠ্য বিষয়কে আরও সহজ-সরল করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এমনি করে তিনি গ্রন্থপাঠের মধ্যে শ্রেণীকক্ষের পাঠ শেষ করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও যুক্তি বিকাশের পথ সুপ্রশস্ত হয়। গ্রন্থ ব্যবহারের উপায় ও উহার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সংগ্রহের উপায় শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকে না। শিক্ষার্থীরা গৃহে পাঠচর্চার অভ্যাস হারিয়ে শুধু শ্রেণী শিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নিম্নশ্রেণীতে পুঁথি পাঠের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও উচ্চতর শ্রেণীতে এর কোন উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা নেই।

গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির দুটি দিক—মুখস্থ শক্তি বিকাশের প্রবণতা আর শিক্ষক শিক্ষার্থীর গ্রন্থপাঠ প্রবণতা। এ দুটিকে একক ধরে সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির দোষগুণ বিচার করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের এ আলোচনা সাহিত্য (literature) এবং ভাষা (language) শিক্ষণের বেলা প্রযোজ্য নয়। কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, উদাহরণ স্বরূপ, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ইত্যাদি সম্পর্কে এ সমালেচনা প্রযোজ্য।

গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির গুণ (Merit of Text-Book Method) : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থরচনা পদ্ধতি দু'প্রকারের হয়ে থাকে : (ক) মনোবিজ্ঞানসম্মত (Psychological) উপায়ে আর (খ) যুক্তি-ভিত্তিক

(Logical) প্রণালীতে। মনোবিজ্ঞান সম্মত ধারায় লিখিত পুস্তকাদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর উপযোগী কিন্তু যুক্তিবিন্যাসী (Logical) পুস্তকাদি বয়স্ক শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা সমাজবিদ্যা মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত উভয় ধারায় রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাঠ্য পুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু আপন সঙ্গতি অনুসারে বিন্যস্ত হয়। পাঠ্যপুস্তক অনুসারে পাঠে অগ্রসর হলে পাঠ্যপুস্তকে সুবিন্যস্ত বিষয়গুলির ধারা অনুসারে পাঠ পরিচালনা করা যায়। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে পূর্ব-পরিকল্পিত পন্থায় শিক্ষালাভ করতে পারে। পুস্তক নির্ভর ব্যতিরেকে শিক্ষা গ্রহণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব না হলেও বহুল পরিমাণে অসুবিধাজনক। গ্রন্থানুসারে ক্রমিক পর্যালোচনায় শিক্ষার্থীদের মনন, চিন্তন ও অনুধাবনের শক্তি বিকশিত হয়। পাঠ্যপুস্তকে অনেক মন্তব্য, চিত্রাদি বা অনুরূপ পরিপূরক বিষয়বস্তুর আলোচনা থাকে। শিক্ষার্থীরা এসবের মাধ্যমে স্ব-স্ব শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করাতে পারে। অনুরূপ বা পরিপূরক পুস্তকাদির সন্ধান পেলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পুস্তকের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অধিক জ্ঞানলাভের চেষ্টা করতে পারে ও স্বীয় জ্ঞানের সীমাকে অধিক সম্প্রসারিত করার সুযোগ পায়। অধিকন্তু পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অথবা পুস্তকের শেষাংশে থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী। এসব প্রশ্নোত্তর অনুশীলনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তার তাৎপর্য অনুধাবনের যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির দোষ (Demerits of text-book Method) : গ্রন্থানুযায়ী পদ্ধতির গুণাবলী সত্ত্বেও থাকা এর ত্রুটি কম নয়। শিক্ষাকে গ্রন্থ সর্বস্ব করা কখনও উচিত নয়। গ্রন্থ সর্বস্ব শিক্ষার কুফল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনেক সঙ্কুচিত করেছে। এসব ত্রুটিগুলি আমরা পরপর সন্নিবেশিত করছি :

প্রথমতঃ, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের এমন পথে পরিচালিত করে যে তারা না বুঝে, না জেনে পুস্তকের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, এমনকি চিহ্নাদিও মুখস্থ করার প্রতি তাদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, গ্রন্থকারের ভুল মন্তব্যও তারা অন্ধভাবে কণ্ঠস্থ করে। ফলে গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষা গ্রহণের ভরকেন্দ্র (Centre of gravity); পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিক্ষার্থী কোন কিছু শিখবার বা পড়বার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে মাত্র উপায় (means) হিসেবে গ্রহণ করা যায়; কিন্তু একে শিক্ষার অন্তিম (end) স্বরূপ গ্রহণ করলে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্র ও ব্যাপ্তিকে সঙ্কুচিত করা হয়। কারণ এই বিশেষ বিষয়ের সীমা ও ব্যাপ্তি আজও নির্দিষ্ট হয় নি। বিষয়টি আজও পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক মোটেই নির্ভরশীল নয়। এর সীমা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে—সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে, জীবন-সমস্যার জটিল বাস্তবতায় পরিব্যাপ্ত।

তৃতীয়তঃ, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির প্রবণতা থাকে মুখস্থ করার দিকে। নোটবই, সংক্ষিপ্তসার (Sure Success, Fortnight Preparation, A Brief Survey) প্রভৃতি পুস্তিকার উপর শিক্ষার্থীরা নির্ভরশীল হয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দিকেই শিক্ষার্থীদের আসল লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। তারা জানে, এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সহায়ক পুস্তকগুলিই যথেষ্ট; অন্যথায়, একটু অসৎ উপায় অবলম্বন করলেও সহজে পরীক্ষায় পাশ করা যায়। এগুলি বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি হলেও গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি যে তার সঙ্গে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

গ্রন্থানুযায়ী পদ্ধতির ত্রুটি দূর করার উপায় (Means to eliminate the defects of the Text-Book Method) ঃ গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির কুফল দূর করতে হলে এই পদ্ধতি সম্পর্কে কতকগুলি নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সমাজবিদ্যার মূল (source) গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে বা সমাজবিদ্যার নির্দিষ্ট কক্ষে (social studies room) একটি পাঠাগার গঠন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তক প্রকাশকদের তালিকায় বিভিন্ন গ্রন্থকারের লেখা সমাজবিদ্যার নাম প্রকাশিত হয়। এসব পুস্তক পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করে সমাজবিদ্যার ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত করা দরকার। তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের পুস্তক তালিকায় সমাজবিদ্যার কোন নির্দিষ্ট পুস্তকের নাম না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন প্রকাশকের প্রকাশিত উপযুক্ত যে-কোন পুস্তক পাঠের নির্দেশ থাকলে বিভিন্ন শিক্ষার্থী সুযোগ মত বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহ করবে। ফলে পরীক্ষা-প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট ভাষা মুখস্থ করার প্রবণতা হ্রাস পাবে ও পুস্তক সর্বস্ব শিক্ষার কুফল কিছুটা প্রশমিত হবে। চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থীরা পরস্পরের পুস্তক বদল করে যাতে পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা

করা প্রয়োজন। তাহলে একাধিক পুস্তক পাঠের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চমতঃ, পাঠাগারের পুস্তকাদি যাতে ছাত্ররা পালাক্রমে পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ষষ্ঠতঃ, শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে বিষয় (topic) নির্দিষ্ট করে শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দেশ দিতে পারেন; যাতে ছাত্ররা নির্ধারিত বিষয়ের জন্য শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্ট গ্রন্থাদি পাঠ করে স্ব-স্ব ভাষায় বিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ খাতায় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এর ফলে কর্মের সঙ্গে গ্রন্থ পাঠের কিছুটা যোগাযোগ থাকবে এবং শিক্ষণীয় বিষয়টি পুঁথিগত না হয়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব হয়ে উঠবে।

এভাবে নতুন নতুন পন্থা সহযোগে গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হলে গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে জীবন্ত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

(গ) আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) ঃ সমাজবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতি অন্যান্য সমস্ত প্রকার পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী এবং শুধু সমাজবিদ্যা নয়, যে-কোন প্রকার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত। ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, গ্রহণক্ষমতা-ইত্যাদি কোন বিষয়বস্তুর আলোচনার মাধ্যমেই জাগ্রত এবং বিকশিত হয়। পরস্পরের আলোচনা দ্বারা বিষয়বস্তুকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার্থী অনুধাবন করার সুযোগ পায়। কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি বাস্তব জীবনে আলোচনা পদ্ধতি জ্ঞানার্জনে পরম সহায়ক। এ পদ্ধতি আমাদের বিচার বুদ্ধিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। কোন সমস্যা সমাধানের জন্য এই পদ্ধতির বহুবিধ প্রয়োগ আশ্চর্যজনক সুফল প্রদান করে থাকে।

বাস্তবক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতির সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও অনেক বেশী। অতি প্রাচীনকালে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন ধারণের মাধ্যমে রাষ্ট্র সংগঠনের চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টার মূলেও আলোচনা পদ্ধতি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে সামাজিক কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা এবং তার সমালোচনাই অন্যতম উপায়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই একটি সাধারণ মতামত আত্মপ্রকাশ করে। এই সাধারণ মতামত সমস্যা সমাধানের পক্ষে অতি মূল্যবান—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলাপ-আলোচনায় যে-কোন মানুষ খোলা মন নিয়ে স্ব-স্ব ইচ্ছা প্রকাশ করে—সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। বাস্তবতা বা সত্যকে কেউই অস্বীকার করে না—ক্রমশঃ সকলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সমস্যা সমাধান করতে সমর্থ হয়।

আলোচনার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান না হলে অথবা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলেও, এই পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে সুফলপ্রদ—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আলোচনা যদি পরিকল্পিত হয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যদি আগ্রহসহকারে প্রয়োজন মত অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে এই পদ্ধতি অবশ্যই ফলপ্রদ হবে। আলোচনা পদ্ধতি বিতর্ক সভা, সমালোচনা অথবা গোলটেবিল বৈঠকের মত যে কোন প্রণালীতে প্রযোজ্য হতে পারে।

আলোচনা পদ্ধতির পরিকল্পনা : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্থির করে শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুপরিকল্পিত আলোচনার সুফল সুনিশ্চিত। পরিকল্পনার তিনটি অংশ থাকা উচিত : (১) প্রস্তুতি, (২) আলোচনা, (৩) মূল্যায়ন।

আলোচনা পদ্ধতিতে প্রস্তুতি পর্ব অতি প্রয়োজনীয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রস্তুতি আবশ্যক হলেও শিক্ষকের প্রস্তুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ তিনি শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য পরিচালিত করবেন। সুতরাং তাঁকে প্রচুর পড়াশুনা করতে হবে। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিষয়গুলিকে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুবিন্যস্ত করতে হবে। বিষয়গুলি যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে অনুধাবন করতে পারে তার জন্য এই সুবিন্যস্ত বিষয়টি মনোবিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিবিন্যাসী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের ঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্ল্যাকবোর্ডে লিপিবদ্ধ করে দেওয়ার জন্যও প্রস্তুতি আবশ্যক।

আলোচনা পর্বে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, শ্রেণী-কক্ষে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন শৃঙ্খলা থাকে। এই সময় শিক্ষার্থীদের বসবার রীতি এমন হওয়া উচিত যে প্রত্যেকেই আলোচনার অংশ গ্রহণ করতে ও মনোযোগ সহকারে শুনতে বা আলোচনা করতে পারে। আলোচনা সভায় শিক্ষক তাঁর মন ও মেজাজকে এমন রাখবেন যেন সকলেই খোলা ও খুশিমনে আলোচনা করতে সাহসী হয়। শিক্ষক একের পর এক সকলকেই আলোচনার অংশ গ্রহণ করতে ও প্রত্যেককেই আলোচ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করতে আহ্বান জানাবেন। আন্তরিক পরিবেশ আলোচনা পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ। যতক্ষণ এই পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, ততক্ষণ এই পদ্ধতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

আলাপ-আলোচনার মূল্যায়ন হল সর্বশেষ অঙ্গ। যে উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল তা থেকে আলোচনা বিচ্যুত হল কিনা বোঝবার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন।

শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে সংবাদ সংগ্রহ, কুসংস্কার দূরীকরণ, মানসিক প্রসারতা সৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনান্তে এইসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপূর্ণ মূল্যায়ণ নিতান্ত প্রয়োজন।

তাছাড়া আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার সাফল্যের গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের উপরই ন্যস্ত। তিনি হলেন আলোচনার পরিচালক। সুতরাং তাঁকে আলোচনার্থে বিভক্ত দলগুলির পূর্ণ সহযোগিতা পেতে হবে। আলোচনা সভায় অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাকে যেমন সংযত করতে হবে, তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন শিক্ষার্থীর অহং বোধ (ego) বা অনুভূতি (sentiment) যেন আঘাত না পায়। সুতরাং আলোচনায় অংশ গ্রহণের সময় যথেষ্ট সংযত হতে হবে।

অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অপটু। বিভক্ত দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রবণতা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে। শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে আলোচনার লক্ষ্য যেন ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বিদ্বেষমূলক না হয়। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শিক্ষককে এমনভাবে সভা পরিচালিত করতে হবে যেন আলোচনাটি ঠিক পূর্ব পরিকল্পিত শিক্ষামূলক লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষক স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন না—স্নেহ, প্রীতি, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও সংযমের সহিত পরিচালকের ভূমিকা তাঁকে গ্রহণ করতে হবে।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা (Advantage of Discussion Method) ঃ সমাজবিদ্যার শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে আলোচনা পদ্ধতির সুফল অনেক। নিম্নোক্তভাবে সুফলগুলিকে আমরা সঙ্কলিত করতে পারি ঃ

(i) আলোচনা পদ্ধতিতে শ্রেণী কক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী অনুভব করতে পারে যে, সে শ্রেণীর একজন দায়িত্বশীল সভ্য এবং সততার সঙ্গে তাহার সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

(ii) এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে যাচাই করার সুযোগ পায়। আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য সে অজ্ঞাত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে জানবার জন্য পড়াশুনা করে। ফলে স্বীয় ভুল ত্রুটিগুলিকে সে অনায়াসে সংশোধন করে নিতে পারে এবং ক্রমশঃ তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়।

(iii) আলোচনার সময় একে অন্যের বক্তব্য ও যুক্তি শুনে বোঝবার চেষ্টা করে। স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি মিলিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ থাকে এই পদ্ধতিতে। এতে নতুন সত্যের সন্ধান বা নতুন কিছু আবিষ্কার সম্ভব হয়ে উঠে।

(iv) আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ ঘটে। এর দ্বারা তারা পরমতসহিষ্ণু, হয় তাদের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও ভাবসম্প্রসারণের ক্ষমতা তারা লাভ করে। সেই সঙ্গে নতুন বিষয় অধ্যয়ন ও সংবাদ সংগ্রহ করার প্রবণতা তাদের উদ্বুদ্ধ করে।

(v) আলোচনা পদ্ধতি এত মূল্যবান যে, এর মাধ্যমে দলীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব দূরীভূত হয়ে সহানুভূতি ও সাহচর্য বৃত্তি পরস্পরের মধ্যে বিকশিত হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষার্থীরা যুক্তি বিন্যাসের মানদণ্ডে যেন একটা নীতিগত বিষয়ে ধাবিত হয়ে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়।

(vi) শ্রেণীকক্ষের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অনেকেই লাজুক ও স্বল্পমেধাসম্পন্ন। আলোচনার সময় যখন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্পন্ন শিক্ষার্থীও একই সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সভ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। সকলেরই খোলা মনে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকায় এবং শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনায়—লাজুক তার লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারে, স্বল্পমেধাবী আলাপ-আলোচনায় স্বীয় ত্রুটি মুক্ত হয়, নতুন তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য সকলেই সমানভাবে পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র পাঠ, শিক্ষামূলক সভা-সমিতিতে যোগদান, শিক্ষকের নির্দেশ পালন প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করে। ফলে আলোচনা পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অহং বোধের অনুচিত আকর্ষণ কাটিয়ে প্রকৃত শিক্ষার দিকে সকলকেই অনুগামী করা যায়।

(vii) আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনের ধারণা ও গ্রহণ ক্ষমতার পরিচয় পেতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষার্থীকে কিভাবে যুক্তিগতভাবে ও মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনা করতে হবে তা তিনি বুঝতে পারেন এবং সেইভাবে শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করা যায়।

(viii) আলোচনা পদ্ধতি নিম্ন ও উচ্চ উভয় শ্রেণীর শিক্ষাদান কার্যে ফলপ্রসূ। আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ, স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ও প্রকাশ, সুন্দর ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ওঠা-বসার পদ্ধতি শিক্ষা, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করে কাজ করা, পারস্পরিক মত ও পথকে সম্মান দেওয়া, সুখে-দুঃখে পরস্পরের আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করা, ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করার উপায় উদ্ভাবন ও চিন্তা করা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগান প্রভৃতি বিষয় নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু আলোচনা পদ্ধতি উচ্চ ও উচ্চতর শ্রেণীতে একটু ভিন্ন উপায়ে প্রয়োগ করা উচিত। যেখানে বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা, আলোচনা ও তার মূল্যায়ন করে ; সেক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ সভ্য হিসেবে নতুন সংবাদ সংগ্রহ, জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, পারস্পরিক সহযোগিতা, পরামর্শ, পরমত সহিষ্ণুতা, বিষয়বস্তুর সারমর্ম গ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত করণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

(ix) আলোচনা পদ্ধতির শেষ ফলশ্রুতি হল, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মানসিক চিন্তাধারাকে বাস্তব কর্মে প্রণোদিত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে এবং উন্নয়ন ও প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যক্তির দেহ ও মনকে 'এগিয়ে চলার' দুর্বার শক্তি দান করে।

এক্ষণে আমরা বক্তৃতা পদ্ধতি, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি ও আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ ও তার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য (ক) বক্তৃতা পদ্ধতি, (খ) গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি এবং (গ) আলোচনা পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকরী। এই পদ্ধতি তিনটিকে কার্যকরী করে তুলতে গেলে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। মানচিত্র, ছক, উৎপন্ন শস্যাদির নমুনা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, গাছ-পালার ছবি ও নমুনা—ইত্যাদি যখন যা প্রয়োজন শ্রেণীকক্ষে তা দেখান যেতে পারে।[1] এর ফলে শিক্ষা হবে সজীব, শিক্ষার্থী পাবে আনন্দ, শিক্ষক হবেন সফল শিক্ষাব্রতী।

শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানের সাফল্যের জন্য উক্ত তিনটি পদ্ধতির পৃথক এবং মিলিত উপযোগিতার কথা চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতায়

1. এই অংশের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হল।

জেনেছি যে, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের মুখনিসৃত বিষয়বস্তু কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে ও শিখতে পারে। আলোচনা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের বাচনিক কথা শুনে শেখা সম্ভব। কিন্তু বক্তৃতা ও আলোচনাতে যে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হয় না এমন নয়, আবার গ্রন্থানুসারী পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতারও যথেষ্ট সুযোগ থাকে। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে এই তিনটির একত্র মিশ্রন সুফলপ্রদ হবে বলে আমরা মনে করি। এই পদ্ধতি তিনটির সঙ্গে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহার প্রচলিত শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সাফল্য আনয়ন করতে পারে—এ বিশ্বাস আমরা করি।

(২) সৃষ্ট পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষালাভ পদ্ধতি
(Method of Teaching under created environment) :

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে জ্ঞানকে সীমিত করা সমাজবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে শিক্ষা প্রসারিত হলে শিক্ষার্থীও বাস্তবধর্মী, সমাজধর্মী হবার সুযোগ লাভ করে। এজন্য শিক্ষক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে সেই পরিবেশে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত হতে পারে ; তার আচার-আচরণ সংগঠিত হয় এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কৌশল তাদের বিকশিত হয়। অধ্যক্ষ তানেজার (*V. R. Taneja*) মতে সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী সংগঠিত হবে পাঠ্যশিক্ষার জন্য নয়, কর্ম সম্পাদনার নিমিত্ত[1]। বক্তৃতার পরিবর্তে কর্ম-সম্পাদনার উপর গুরুত্ব থাকবে অধিক। এজন্য প্রয়োজন প্রকল্প পদ্ধতি, সমস্যা সূচক পদ্ধতি, ইউনিট বা একক নির্ধারক পদ্ধতি, উৎস পদ্ধতি, সমষ্টি গত শিক্ষণ পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ। এই পদ্ধতিগুলি শুধু যে আচরণ ও দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করে তা নয়, বরং কর্মমুখী ও অভিজ্ঞতা মুখী প্রচেষ্টায় যথেষ্ট তথ্য, বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুধাবন-ক্ষমতা লাভ করা যায় এবং তা বাস্তবধর্মী হয়ে শিক্ষাকে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল করে তোলে। পুঁথিগত বিদ্যার নির্জীবতা আমরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় দেখতে পাই। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও শিক্ষকের মুখনিসৃত

---

1. In terms of tasks to be performed rather than as lessons to be learnt.

বাণীকে বাস্তব, জীবন্ত ও কর্মমুখী করার জন্য উপযুক্ত নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই নতুন নতুন পদ্ধতিগুলির কয়েকটি পরবর্তী আলোচনায় সংযোজিত হল :

(ক) **প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method) :** প্রকল্প পদ্ধতি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি দ্বারা বাস্তব পরিবেশে কর্ম সম্পাদনা দ্বারা মূর্ত ফলশ্রুতি লাভ করে। বাস্তব পরিবেশে কর্মরত মানুষকে দেখলে মনে হয় মানুষটির হাত বা পা বা অন্য কোন অঙ্গ কর্ম করে যাচ্ছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানুষের মনই কাজ করায়; মানসিক প্রেরণা অনুসারে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন মত বাস্তব দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদনা করে। মন থাকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আয়ত্বের বাইরে, তাকে দেখা যায় না। কিন্তু বাস্তবে এই মনই কাজ করায়, আর দেহ কাজ করে যায়। প্রকল্প পদ্ধতিতে মন ও দেহ—এই দুয়েরই পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। তাই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত।

এখন প্রশ্ন হল, প্রকল্প পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি ? উত্তরে বলা যায়, বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকর্মে (শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান) অগ্রসর হওয়ার প্রণালীকেই প্রকল্প পদ্ধতি বলা যায়[1]।

এই সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করলে অনেক কাজই প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ সংজ্ঞানুসারে প্রকল্প পদ্ধতির অর্থ অতি ব্যাপক। ফলে ছাত্রদের যাবতীয় শিক্ষাকর্ম এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। অভিনয়, নমুনা তৈরী, মানচিত্র ও ছক অঙ্কন, ষ্ট্যাম্প ও ছবি সংগ্রহ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও রচনা লিখন প্রভৃতি এমন সব কর্ম যা শিক্ষার্থীদের কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও গুণের বিকাশ সাধন করতে পারে তা-ই প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। কিলপ্যাট্রিক (*Dr. Kilpatrick*) প্রদত্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, সামাজিক পরিবেশে উদ্দেশ্য মূলক যাবতীয় কর্মই প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ফলে বাড়ির বেড়া তৈরী থেকে ঐতিহাসিক

1. এই পদ্ধতি সম্পর্কে Dr. Kilpatric বলেন যে, "Whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment." Dr. Stevenson বলেন "It is a problematic act carried to completion in its natural setting."

সমস্যা সমাধান প্রভৃতি সমস্তই সমান ভাবে প্রকল্প পদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বিচার করা প্রয়োজন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকল্প কি হতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সমাজবিদ্যার শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এমন প্রকল্প প্রদান করা উচিত যা সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীরা প্রকৃত-জীবন পরিবেশের অনুভূতি পায়। বাইনিং (*Arther C. Binning*) বলেন, সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার্থীর কাছে প্রকল্প পদটির সীমিত অর্থ হ'ল, বাস্তব ও সজীব পরিবেশে শিক্ষার্থী কর্তৃক পরিকল্পিত কোন উদ্দেশ্য মূলক কাজের সঠিক রূপায়ণ।[1] এখন প্রশ্ন হ'ল, সমাজবিদ্যা শিক্ষা পদ্ধতিগুলির প্রায় সবকটিই কর্মমিশ্রিত—গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি, আলোচনা ও বক্তৃতা পদ্ধতি, সমস্যা মূলক পদ্ধতি প্রভৃতি কোনটিই কর্মবিহীন নয়। তাহলে সবই তো প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত অথবা অংশ হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকল্প পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। অন্যান্য পদ্ধতিতে সূত্রগুলি আগে আলোচিত হয়, পরে সেই সূত্র অনুসারে প্রয়োজন মত কর্মের অবতারণা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প পদ্ধতিতে কর্মই প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমেই কর্মের পরিকল্পনা ও সম্পাদনার পর শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলি আয়ত্ব করে। এই দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার্থীদের যে কোন শিক্ষামূলক কর্মকে প্রকল্প বা প্রজেক্ট বলা যায় না। প্রকল্প হল সেই জাতীয় কর্ম যা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য-সাধক সুপরিকল্পিত কর্ম-সম্পাদনার মাধ্যমে সূত্র নির্ধারণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে সাহায্য করে।

প্রকল্প পদ্ধতির স্তর (Steps in a Project) : প্রকল্প পদ্ধতি চারটি স্তরে বিভক্ত। যথা, (i) উদ্দেশ্য (Pusposing), (ii) পরিকল্পনা (Plannign), (iii) কর্ম-সম্পাদনা (Executing) এবং (iv) সূত্র নির্ধারণ ও ফলশ্রুতি বিচার (Judging)।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা পরিবেশে পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভূত বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস আসে শিক্ষার্থীর মনে। আগ্রহ বা প্রেরণা না থাকলে উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। শ্রেণীকক্ষে

1. From a common-sence point of view, the term (project) in the Social Studies should be restricted to a pupil-planned, purposeful task accomplished in a real-life situation.

শিক্ষক এমন ভাবে কোন বিষয় আলোচনা করবেন যেন কোন কর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে স্পষ্ট ধরণার সৃষ্টি হয়। তাহলে সেই কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা সৃষ্টি করবে—তারা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যত্নবান হয়ে উঠবে। এটিই হল প্রকল্প পদ্ধতির প্রথম স্তর। এই স্তরে শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্ম-সম্পাদনার প্রেরণা বা আগ্রহ জাগবে।

(ii) আগ্রহ সহকারে উদ্দেশ্য-সাধন করতে হলে পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীরাই পরিকল্পনা-প্রণয়নের দায়িত্ব নেবে। প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে, কে কোন্ কর্ম-করবে, কার কি দায়িত্ব থাকবে সে সম্পর্কে একটা খসড়া তৈরী করবে। তবে সম্পূর্ণ কর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। প্রয়োজন বোধে তারা শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু শিক্ষক সর্বদা এই উদ্দেশ্য সাধনের পশ্চাতে অবস্থান করবেন। তিনি অযাচিত ভাবে সাহায্য না করে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মত সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন। প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর আগ্রহে গৃহীত ও পরিকল্পিত (pupil-planning); যথাযথ কর্ম-সম্পাদনা নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে গৃহীত কোন পরিকল্পনার উপর। সুতরাং এটি হল প্রকল্প পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ।

(iii) প্রকল্প পদ্ধতির তৃতীয় স্তরে হবে কর্ম-সম্পাদনা। পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়গুলিকে বাস্তব রূপায়ণের জন্য এই স্তরে প্রয়োজন হাতে-কলমে সুষ্ঠুভাবে কর্ম-সম্পন্ন করা। পূর্ব নির্ধারিত দল বা উপদল স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করবার জন্য প্রয়োজন হলে একদিকে যেমন শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে, তেমনি—এক দল অন্য দলের মতামত ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করবে। শিক্ষক কর্ম-সম্পাদনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যে, শিক্ষার্থীরা দল ও উপদল নির্বিশেষে কাজটিকে সামগ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে এক ও অভিন্নরূপে কল্পনা করতে পারবে এবং তারা সামগ্রিক ঐক্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে। কর্মের একাংশ শেষ করে কর্মীরা এগিয়ে যাবে পিছিয়ে পড়া দলকে সক্রিয়-সহযোগিতার জন্য। সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করাই হবে সকলের একান্ত প্রচেষ্টা।

(iv) প্রকল্প পদ্ধতির চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে ফলশ্রুতি বিচার বা সূত্র নির্ধারণ করা কর্তব্য। প্রকল্পের এই স্তরকে আমরা মূল্যায়ন নামেও অভিহিত করতে পারি। শিক্ষার্থীরা কি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেছিল, পরিকল্পনা রূপায়ণে কি

কি কর্ম সম্পাদন করতে হল, কর্ম সম্পাদনে কি কি বাঁধা তাদের বিভ্রান্ত করেছে, কি উপায় অবলম্বন করলে সহজে কার্যোদ্ধার সম্ভব হত, কর্মের ফলশ্রুতি কি হল ইত্যাদি বিচার ও বিশ্লেষণ করা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন।

প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Project Method) : প্রকল্প পদ্ধতির চারটি স্তর সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করলে এই পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় :

(ক) শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাদান বা আলাপ আলোচনার পরিবেশে প্রকল্প সূচক সমস্যা উদ্ভূত হবে।

(খ) শিক্ষার্থীদের মনে জাগবে কর্মের আগ্রহ।

(গ) এর পরে আসবে প্রকল্প বা প্রজেক্ট নির্বাচনের পালা। এমন প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে তা যেন গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষাসূচক হয়। উপরন্তু শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা।

(ঙ) পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের।

(চ) শিক্ষক থাকবেন পরোক্ষে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে।

প্রকল্পের দৃষ্টান্ত : দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি প্রকল্পের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা,

(১) স্থানীয় যানবাহন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

(২) পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির রাষ্ট্রীয় পতাকা প্রদর্শন।

(৩) শ্রেণী পুস্তকালয় পরিচালনা।

(৪) বিচিত্রানুষ্ঠান সংগঠন ও পরিচালনা।

(৫) আঞ্চলিক মানচিত্র অঙ্কন।

(৬) বিদ্যালয় ম্যাগাজিন্ প্রকাশন।

(৭) নানা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পালন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

(৮) সরস্বতী পূজা—সংগঠন ও পরিচালনা।

(৯) দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশন।

(১০) শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও বিবরণ লিখন।

(১১) বিদ্যালয়ের উন্নতিমূলক কর্মসূচী।

(১২) সমাজবিদ্যার সমিতি সংগঠন।

(১৩) সমাজবিদ্যার প্রদর্শনী, গৃহ সজ্জা ইত্যাদি।

প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of Project Method): প্রকল্প বা প্রজেক্ট পদ্ধতি শুধু সমাজবিদ্যায় নয়, যে-কোন বিষয় শিক্ষায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এই পদ্ধতি পুঁথিগত বিদ্যার কর্মহীন পরিবেশে এনেছে ক্রিয়াশীল, জীবন্ত প্রচেষ্টা। সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি অতি প্রয়োজনীয়, কারণ ব্যবহারিক অংশটুকু প্রকল্পের মাধ্যমে অনুশীলন করা সম্ভব। প্রথমতঃ, প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে—মনন, চিন্তন ও অনুধাবন শক্তির বিকাশ সাধিত হয়। প্রকল্প নির্বাচন, কর্ম সম্পাদন, সিদ্ধান্তে পৌছান প্রভৃতি প্রতিটি স্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট চিন্তাশীল হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম সম্পাদনার জন্য শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দল ও উপদল নির্বিশেষে সকলের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এর ফলে, পরমত সহিষ্ণুতা, সক্রিয় সহযোগিতা, সমবায়মূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। অনেকেই পরিকল্পনা রচনা করতে পারে কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ অতি কঠিন কাজ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই পরিকল্পনা রচনা ও তাকে বাস্তবতায় রূপয়িত করে। ফলে শুধু কথা নয়, কাজে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ, কর্ম সম্পাদনাই এই পদ্ধতির লক্ষ্য। পরিকল্পনা রচনার সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা দল সমষ্টিগত ভাবে কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখে। ফলে, প্রচেষ্টাগুলি ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়ে গড়ে উঠে। এই সংহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চিন্তাশক্তির সংহতি সাধিত হয়। এই প্রচেষ্টার কর্মক্ষেত্র যখন বাস্তব জীবনের সঙ্গে অন্বিত হবে তখন জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার অনুকূল প্রবণতা গড়ে উঠবে প্রতিটি শিক্ষর্থীর মনে। এরই ফলে শিক্ষা হবে ক্রিয়াশীল, জীবন্ত ও সার্থক।

প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা যথেষ্ট থাকলেও এর প্রয়োগ সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করে। সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে অবশ্য মূলপাঠ্য হিসেবে গৃহীত। এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ভারে জর্জরিত। প্রকল্প নিয়ে অধ্যয়ন করার অবকাশ তাদের অত্যন্ত কম। পক্ষান্তরে, বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের সময়-তালিকা সীমিত। সেই সীমিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা ও তার রূপায়ণের চেষ্টা একেবারে অসম্ভব না হলেও যথেষ্ট

অসুবিধা জনক বলা চলে। তাই, এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। প্রকল্পগুলি পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হলে পাঠদানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থীরা পরিচালিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, আমাদের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন—খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান সমস্যা, যানবাহন, আঞ্চলিক শিল্প প্রভৃতিকে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে পরিকল্পনা রচনা করা চলে। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন—নবাগত ছাত্র সম্মেলন, উৎসব, পুরস্কার বিতরণীসভা রবীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত। তৃতীয়তঃ, দশমমান বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীর ব্যবহারিক অংশটুকুর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। তবে এই প্রকল্পের মূল্যায়ন ও সম্পর্কিত নম্বর যদি পর্ষতের শেষ পরীক্ষায় গৃহীত হয় তবেই প্রকল্প গ্রহণ ও কর্ম সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। একাদশমানের বিদ্যালয়গুলির নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যসূচীতে শিক্ষকের স্বাধীনতা স্বীকৃত। সুতরাং শিক্ষক মহাশয় এই দুই শ্রেণীর সমাজবিদ্যার জন্য প্রকল্প বা প্রজেক্ট পদ্ধতি নিজ ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করতে পারেন। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, শিক্ষার্থীরা যেন অন্য পাঠ্য বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে বিচ্যুত না হয়। তাহলে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাল ছাত্রেরও পরীক্ষায় নিরাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) **সমস্যাসূচক পদ্ধতি (Problem Method) :** প্রকল্প পদ্ধতির ন্যায় সমস্যাসূচক পদ্ধতি বিদ্যালয়ে অন্যতম শিক্ষাদান প্রথা। এই পদ্ধতি একমাত্র বা অনিবার্য প্রথা না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজবিদ্যা বিষয়টিই সমস্যাসূচক। এই বিষয়টি শিক্ষাদান কালে শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষে আলাপ আলোচনা, কথাবার্তা বা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রথমে একটা অনুকূল শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এই পরিবেশে সবার অলক্ষে তিনি প্রশ্নের ছলনায় কোন একটা সমস্যাকে সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরেন। অনুকূল পরিবেশে সমস্যা তুলে ধরলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যায় এবং সমস্যা অনুধাবন ও সমাধান করার চেষ্টা করে। শিক্ষক মহাশয়ের বুদ্ধি, যুক্তি ও পরিচালন ক্ষমতার উপর সমস্যার গুরুত্ব নির্ভর করে। যদি তিনি সুস্পষ্ট ভাবায় শৃঙ্খলার সহিত সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করতে

পারেন তবেই এই পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষাদান কার্য সত্যই আকর্ষণীয় ও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে।

সমস্যা এবং প্রকল্প পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্পের ন্যায় সমস্যাসূচক পদ্ধতির চারিটি স্তর :

(ক) প্রস্তুতি

(খ) পরিকল্পনা

(গ) সমাধান বা সিদ্ধান্ত

(ঘ) সিদ্ধান্ত বিষয়ের পুনর্বিবেচনা

প্রথম স্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয়ের দায়িত্ব গুরুত্ব পূর্ণ। তাঁর কর্তব্য হল সুস্পষ্ট ভাষায় সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা। এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে, সমস্যাটি তাদের নিকট সমধানের জন্য প্রদান করা হয়েছে এবং তারা যেন আগ্রহ ও প্রেরণা সহকারে সমাধানের জন্য অগ্রসর হয়। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সমস্যার দ্বারা শিক্ষা প্রদান হয় না। স্বতঃস্ফর্ত আগ্রহ শিক্ষা লাভের প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত। দ্বিতীয় স্তরে, শিক্ষার্থীরা উক্ত প্রেরণা-বশতঃ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রয়োজন মত প্রকল্প পদ্ধতির ন্যায় সমস্যা সমাধানের সুবিধার জন্য নিজেদেরকে কয়েকটি দলে (Group) বিভক্ত করে। সংবাদ বা তথ্য, উপকরণাদি সংগ্রহ, সংগৃহীত বিষয়াদিকে সুসজ্জিত করা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচীর দায়িত্ব অর্পিত হয় ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর। তৃতীয়স্তরে, শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের কর্মপ্রচেষ্টায় সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করে। সর্বশেষে তারা উপনীত সিদ্ধান্তগুলিকে সমবেতভাবে পুণর্বিবেচনা বা পুনঃ পরীক্ষা করে কর্ম সম্পাদন করে। সমস্যাসূচক পদ্ধতিতে যে-কোন মুহূর্তে শিক্ষকের পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে। সে জন্য তাঁকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়।

প্রকল্প পদ্ধতির ন্যায় সমস্যাসূচক পদ্ধতিতেও শিক্ষককে নীরব থাকতে হয়। অযাচিত ভাবে শিক্ষার্থীদের কাজে বাঁধা সৃষ্টি বা মাঝপথে মন্তব্য করে কর্মের সচ্ছন্দ গতিকে শিক্ষক নষ্ট করবেন না। এই পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষকের করণীয় থাকে তিনটি বিষয় ; প্রথমতঃ, তিনি সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। দ্বিতীয়তঃ সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তিনি নিজে জেনে শিক্ষার্থীদেরকে উপদেশ প্রদান ও পরিচালনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। তৃতীয়তঃ,

সিদ্ধান্তগুলির মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা যোগান শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য।

প্রকল্প ও সমস্যাসূচক পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও এই দুটি পদ্ধতির প্রয়োগগত পার্থক্য নিতান্ত কম নয়। হাতে কলমে কর্মসম্পাদনা প্রকল্প পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মানসিক চিন্তা, ধারণা, এবং প্রেরণা দ্বারা শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। মনই হল শারীরিক সক্রিয়তার উৎস। মনের ক্রিয়াশীলতা অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদিকে পরিচালিত করে। মন অচল হলে দেহও অচল হয়ে পড়ে; কিন্তু দেহ অচল হলে মন সচল থাকে। প্রকল্প ও সমস্যাসূচক পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীর ও মনের ক্রিয়াশীলতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি কর্ম সম্পাদনে তৎপর হয় বটে, কিন্তু শারীরিক শক্তির প্রাধান্য বেশি। দ্বিতীয়টির জন্য মানসিক চিন্তা, ধারণা, প্রেরণা প্রভৃতি বিমূর্ত শক্তির ক্রিয়াশীলতা পরিলক্ষিত হয়। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন, মূল উপকরণাদি সংগ্রহ, পাঠ ও বিশ্লেষণ করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং উহা পুনর্বিবেচনা নিছক মানসিক প্রক্রিয়া। এ দুই পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রকল্প হল ব্যবহারিক সমাধান আর সমস্যাসূচক পদ্ধতি হল মানসিক সমাধান। প্রকল্প বাস্তব পরিবেশে ব্যবহারিক কর্ম সমাধানের পক্ষপাতী আর সমস্যাসূচক পদ্ধতি পাঠানুশীলন ও গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুকূলে শিক্ষার্থীকে ব্যাপৃত করে।[1]

সমস্যাসূচক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and dis-advantages of problem method) : সুবিধা (Advantages) : পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই পদ্ধতি শিক্ষাদান ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি নয়; তবে মাঝে মাঝে ক্ষেত্রবিশেষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং নিম্নলিখিত সুফল আশা করা অবাস্তব নয়।

প্রথমতঃ, বাস্তবজীবনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই বিবিধ-সমস্যার সম্মুখীন হবে ও তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রত্যেককেই সচেষ্ট হতে হবে।

1. "The problem method differs from the project in that the emphasis in it is on the mental solution reached rather than on a practical accomplishment. Project method demands a practical accomplishment in a real situation and the problem method emphasises the mental conclusion that is drawn." —Bining & Bineng.

সমস্যাসূচক পদ্ধতিই শিক্ষার্থীদেরকে জীবনযুদ্ধের জন্য সচেষ্ট করে তোলে। সমস্যাসূচক পদ্ধতির মাধ্যমে তারা মনন, চিন্তন ও সুবিচারে দক্ষতা অর্জন করে, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা, সামঞ্জস্য রক্ষা ও মূল্যায়ন করতে শেখে। উপস্থাপিত (presented) সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং তার পুনর্বিবেচনার জন্য আগ্রহ সহকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার্থীদের যার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা সে পালন করবার চেষ্টা করে। ফলে দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষাও তাদের বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সমস্যা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদেরকে স্বাভাবিক উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত করে। এর ফলে উদ্দেশ্যগুলি হয়ে দাঁড়ায় তাদের নিজস্ব—তারা তা অনুভব করতে শেখে ও এর উপযোগিতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

তৃতীয়তঃ, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তাকে যুক্তি বিন্যাসী ধারায় চালিত করে। ফলে তাদের মনন শক্তি এত প্রখর হয় যে, কোন্‌টির পর কোন্‌টি করা উচিত তা তারা সহজে বুঝতে পারে।

চতুর্থতঃ, সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন সমস্যার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে শেখে, তেমনি তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, সমবায় মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের একত্রে কর্ম পরিচালন ও সম্পাদন যোগ্যতা, পরমত সহিষ্ণুতা, মানসিক প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমতঃ, সমস্যা-পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনা, উপদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ শিক্ষার্থীর মনে রেখা পাত করে। ফলে তাদের জীবনে ও কর্মে শৃঙ্খলা আসে। শিক্ষাধারায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যত সুন্দর ও মধুময় হয় ততই শিক্ষা উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে সুশিক্ষায় রূপায়িত হবে।

অসুবিধা (Disadvantages)ঃ অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় সমস্যাসূচক পদ্ধতিটিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বিধেয়। অন্যথায়—সুফলের চেয়ে কুফলের আশঙ্কা এতে যথেষ্ট দেখা দেয়।

প্রথমতঃ, এই পদ্ধতির বারবার প্রয়োগে একঘেয়েমির কুফল ভোগ করতে হয়। পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পেলে শিক্ষা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। অথচ স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাই সর্বজন কাম্য।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীকক্ষে সমাধান করার জন্য সমস্যা যত সহজ ও সরল হয় ততই মঙ্গল। আর মনে রাখা উচিত, সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, নিপুণতা, দক্ষতা বৃদ্ধি করে—তাদের মনন, চিন্তন ও ধারণা শক্তির বিকাশ সাধন করে এবং এই উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা মনে করতে পারে, তারা যে-কোন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করেছে। তাহলে তারা এই আত্মবিশ্বাস বলে সামাজিক জটিল সমস্যা সমাধানে গুরুজনদের কথা অবহেলা করতে শিখবে এবং স্বীয় সামর্থ্যে অতিরিক্ত গুরুত্ব অর্পণ করে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস যাতে অসংযমে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, এডগার উইস্‌লী (*Edgar B. Wesley*)-এর মতে সমস্যা পদ্ধতি অনেক সময় শিক্ষার্থীকে হীন অথবা অপ্রয়োজনীয় (অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন নেই এমন) বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে প্রণোদিত করে। এসব সমস্যাগুলিতে সাধারণতঃ সুচিন্তার অবকাশ থাকে না, অনুভূতি বা প্রক্ষোভ বিকাশে সাহায্য করে মাত্র। এই ত্রুটি থেকে এ পদ্ধতিকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হল, শিক্ষক কর্তৃক বিষয়বস্তু নির্বাচন।

চতুর্থতঃ, সমস্যাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ সমস্যা উপস্থিত করে এবং এর সমাধানে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দেয়।

পঞ্চমতঃ, উইস্‌লী (*E. B. Wesley*)[1] বলেন, সমস্যামূলক পদ্ধতি সহজেই সেমিনার পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হতে পারে—যা ছাত্রদের সামর্থ্যের তুলনায়—অনেক বেশি অগ্রসর। তাই সমস্যামূলক পদ্ধতি উচ্চতর শিক্ষায় প্রয়োগ করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ, অসন্তুষ্টি, হতাশা অনেক সময় শিক্ষার্থীদেরকে প্রভাবিত করে। দল থাকলেই প্রতিযোগিতা থাকে, আর প্রতিযোগিতা থাকলে, তাতে জয়-পরাজয়, আনন্দ ও হতাশার ভাব বিদ্যমান থাকে। তাই শিক্ষকের সতর্কতাই পদ্ধতি প্রয়োগে সাফল্য আনয়নের একমাত্র উপায়।

1. "The problem method may easily become a seminar method that is too advanced for the pupils."

(গ) একক নির্ধরক পদ্ধতি (**Unit Method**) : একক কি? (**What is a Unit ?**) : শিক্ষাক্ষেত্রে 'একক' শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় এবং ইহার অর্থও বহুবিধ। সুতরাং এই শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সমস্যাপূর্ণ। শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাখ্যা কর্তারা স্ব-স্ব মতানুযায়ী এই শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করে অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। সমাজবিদ্যায় 'একক' শব্দের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে *Michaelis*[1] বলেছেন, ইউনিট হলো কতকগুলি সহজ, সরল অভিজ্ঞতার সযত্ন-বর্ধিত রূপ মাত্র। বিশেষ বিষয়বস্তুর সঙ্গে এরা ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত এবং সমাজ-বিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক। পক্ষান্তরে, কুক (*Cook*), বেক্ (*Beck*), এবং কেয়ার্নি (*Kearney*) বলেন, অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক এককের বৈশিষ্ট্য হল ইহা ছাত্র-শিক্ষক কর্তৃক পরিকল্পিত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাবলী এবং ইহা শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূলে রূপায়িত। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রসঙ্গে বস্তুভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে এমন ভাবে কাজে লাগান হয়, যেন বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ধারার উদ্দেশ্যাবলীর প্রয়োগ এতে সার্থক হয়। পটার (*Potter*) বলেন যে, যা শিক্ষার্থীর ব্যবহারকে পরিমার্জিত করবে, যা তাকে বাস্তবজীবন পরিবেশের উপযোগী সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে এবং সামাজিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোক সম্পাত করবে, এমন উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাকে একক রূপে নির্দেশ করা চলে। জনসনের (*Johnson*) মত অনুসারে বলা যায় যে, একক হল অভিজ্ঞতার অংশ স্বরূপ, একক পাঠ্যাংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এইখানেই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিটি একক হল এক একটি প্রকল্প (Project)। একে প্রকল্প বলা যায় এই অর্থে যে, যে-কোন ব্যক্তি এর মধ্যেই কর্মকাণ্ডের সন্ধান করতে পারে।

1. A unit in the Social Studies may be defined as a carefully developed series of childlike experiences, related to a particular topic and designed to contribute to the achievement of the purposes of the Social Studies,"

2. An experience unit is a cluster of educative experiences organised through pupil-teacher planning, placed within the functioning frame work of the child in his social and physical environment, in terms of the needs and purposes of the child and his society, and utilizing to a great degree as possible, the useful recoures of the material and cultural environment to the end that the democratically determined purposes of the schools may be achieved."

অধিকন্তু প্রতিটি এককের একটা বিষয়বস্তু বা কাঠামো বা কোন সারমর্ম থাকে। প্রতিটি একককে আবার সন্ধি বা চুক্তি বলা যায়, কারণ কি করে বিষয়বস্তুগুলি পরস্পর সম্পর্কিত, কিভাবে তারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা বিষয়বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক কি এবং কিভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়-ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করার জন্য যেন চুক্তিবদ্ধ বা বাধিত। প্রতিটি একককে আবার সমস্যারূপে অবিহিত করা চলে, কারণ প্রতিটি সমস্যা মানুষের সম্পূর্ণ না জানা বা অল্প জানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

একক সম্পর্কে *Jarolimek*[1] বলেন, একক হল শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু সংযোজনার উপায় মাত্র। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা শারীরিক, মানসিক দিক থেকে সক্রিয় ভাবে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মে অংশ গ্রহণ করে ও গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবিষয়-বস্তুকে (Subject-matter Content) বাস্তবে প্রয়োগ করে। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা তাদের আচর-আচরণ ও কৌশলকে এমনভাবে গড়ে তোলে যেন, তারা নতুন পরিবেশে নতুন সমস্যার সঙ্গে আরও সার্থকভাবে সঙ্গতিস্থাপন করতে পারে।

একক সম্পর্কে উক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান পাই :

প্রথমতঃ, একক হবে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু দ্বারা সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ, একক শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কর্মের মাধ্যমে শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করবে।

তৃতীয়তঃ, একক শিক্ষার্থীদের স্বভাবকে এমনভাবে পরিবর্তিত করবে, যেন তারা নতুন কোন সমস্যার এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সমর্থ হয়।

একক নির্ধারক পদ্ধতির সুবিধা (Advantage of the Unit Method) : প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, দক্ষতা, গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও

1. "As a means of organizing materials for instructional purposes which utilises significant subject-matter content, involves pupils in learning activities through active participation intellectually and physically and modifies the pupil's behaviour to the extent that he is able to cope with new problems and situation more competently.

মতবাদের বিকাশ সাধনে একক পদ্ধতির উপযুক্ততা সর্ববাদীসম্মত। পক্ষান্তরে, একক পরিকল্পনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সমালোচনার শক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, পরমত সহিষ্ণুতা, কর্মে দায়িত্বশীলতা, আলোচনা, শ্রবণ, যথাযথ মতবাদ প্রকাশ এবং পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনিবার্য সহায়তা করে। জারলিকের (*Jerolimek*)-এর ভাষায় বলা যায়,[1] জ্ঞানের প্রসার এবং কৌশল, সামর্থ্য তথা অভিরুচির সুষ্ঠু বিকাশ—এ সবই সার্থক একক নির্ধারক পদ্ধতির সুফল মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, একক পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সংগঠন করার সময় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে তার দ্বারা তারা বহু বিষয় বহুকাল স্মরণ রাখতে পারে। কারণ সংগঠনের সময় বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে স্পষ্টভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ একক পদ্ধতি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষ। শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা অনুসারে এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে পারে। এর ফলে, স্বল্প মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত অথবা পশ্চাৎপদ হয় না।

চতুর্থতঃ, একক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর চাহিদা প্রাধান্য লাভ করে। ব্যক্তি-ভিত্তিক ভিন্নতা অনুসারে একক পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সর্ববিধ উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা, কর্মাবলী ও সুযোগ প্রদান করে; যেগুলি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত। সুতরাং এই পদ্ধতি একান্তই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।

পঞ্চমতঃ, একসঙ্গে সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করা অসম্ভব। একক পদ্ধতি যুক্তিবিন্যাসী, ফলে শিক্ষার্থীরা সহজ থেকে কঠিন ও কঠিনতর বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করতে পারে এবং শিক্ষালাভের বা শিক্ষাপ্রদানের ধারাও যুক্তিপূর্ণ অথচ শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

সার্থক এককের বৈশিষ্ট্যঃ সমাজবিদ্যার এককের সংগঠন, যাঁচাই-বাছাই এবং পরিকল্পনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য :

প্রথমতঃ, কোন্ একক দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে তাহা সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এককগুলি যেন সমাজবিদ্যা পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সুবিন্যস্ত হয়। এককগুলি যেন শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ

1. "The extension of Knowledge and the devolopment of skills, abilities and attitudes are all possible outcomes of good units."

বিধান করে, তাকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের জন্য স্বাধীন ভারতের সুনাগরিকরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, একক সংগঠনের সময় মনে রাখা উচিত যে এককের বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, তাদের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। মূল প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রেরণা বৃদ্ধি করবে। তারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও জানতে ও শিখতে চাইবে এবং এর ফলে শিক্ষার গতি হবে অবিচ্ছেদ্য, চিরন্তন, এবং অন্তহীন।

তৃতীয়তঃ, এককগুলি যাতে সঙ্গীত, কলা, অভিনয়, গল্প, কবিতা প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার প্রতি প্রেরণা সৃষ্টি করে তার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত।

চতুর্থতঃ, এমনভাবে এককগুলিকে সুপরিকল্পিত উপায়ে সংগঠন করা কর্তব্য যাতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, শ্রবণ-নিরীক্ষণ যন্ত্রাদি, অভিনয়, ভ্রমণ, রচনা লিখন, মানচিত্র অঙ্কন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা, সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের প্রেরণা পায়।

পঞ্চমতঃ, এককের বৈশিষ্ট্য এমন হওয়া কর্তব্য যেন শিক্ষার্থীরা জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন, প্রত্যক্ষের বিষয় থেকে যুক্তিমূলক, বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণের পথে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অগ্রসর হতে পারে।

ষষ্ঠতঃ সমাজবিদ্যা আমাদের মূল পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীদের সর্বস্তরের প্রস্তুতিপর্বে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্তর থেকে কেউ যাবে সাধারণ বা কারিগরী উচ্চতর শিক্ষার পথে, কেউ বা সংসার সংগ্রামে লিপ্ত হবে। কেউ বা শিক্ষাবিভাগের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতা কর্মে নিয়োজিত হবে। সুতরাং সমাজবিদ্যার একক সংগঠন ও বিন্যাসের মধ্যে শিক্ষার্থীর স্বদেশ ও স্বজাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র যেমন স্থান পাবে তেমনি পৃথিবীর বৈচিত্র্যপূর্ণ মানব, এবং বিভিন্ন সমাজের কথাও থাকবে। এককগুলির বিন্যাস কৌশলে শিক্ষার্থীর মন স্বদেশ ও স্বজাতির ন্যায় পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসতে প্রস্তুত হবে। যেন তারা ভাবতে শেখে যে, তারা এক পৃথিবীর নাগরিক। তারা এক জাতি—মানবজাতি।

পাঠ্যরূপে গৃহীত সমাজবিদ্যায় এককের দৃষ্টান্তঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রবর্তিত সমাজবিদ্যার (দশম মান বিদ্যালয়ের জন্য)

পাঠ্যসূচী unit বা একক হিসাবে সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত। এই পাঠ্যসূচী মোট ৭টি ভাগে বিভক্ত। সব কটি অংশের ইউনিট এর সংখ্যা ১১। এই এককগুলি সমান নয়; কোনটি বড়, কোনটি ছোট। বড় বড় ইউনিট আবার কয়েকটি উপ-এককে বা ইউনিটে বিভক্ত। কয়েকটি এককের দৃষ্টান্ত পাঠ্যসূচীর মূল তালিকা অনুসারে প্রদত্ত হল। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

A. Introduction

Unit 1. The country we live in

B. Our basic needs.

" 2. Food

" 3. Clothing

" 4. Shelter.

„ 5. Other needs. ইত্যাদি

উক্ত যে কোন একটিকে নিয়ে আমরা একক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি। পাঠ্যসূচী অনুসারে ধরা যাক্ ৩নং একক আমাদের পাঠ্য। পাঠ্যসূচীতে উল্লেখ আছে—

Unit 3. Clothing—Clothing worn in Different Parts of India—influence of environment (natural and social) on Clothing—aesthetie factors in clothing.

A Comparative Study of clothing in Iudia and a typical countries e.g. Desertlands, undevelcped African countries, European countries, Polar Regions.

নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে এই একক সুন্দর ভাবে গৃহীত হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীর আঞ্চলিক পোশাক পরিচ্ছদ থেকে সুরু করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন পরিবেশের পোষাক-পরিচ্ছদ আলোচিত হবে। পরবর্তী অংশে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পোশাক সম্পর্কে শিক্ষার্থী ধারণা লাভ করবে। অল্প বয়স্ক এবং নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এত বড় একক গ্রহণ না করে ছোট্ট অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে।

একক নির্ধারক পদ্ধতি সমস্যা পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন নহে। তেমনি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় প্রকল্পের। সুতরাং এই তিনটি পদ্ধতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সার্থক শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সুফল আশা করা যায় তবে মনে রাখা উচিত শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, নিপুণতা ও পরিচালন ক্ষমতার ওপর পদ্ধতি প্রয়োগ ও তার সার্থকতা নির্ভর করে।

(ঘ) **উৎস-পদ্ধতি (Source Method) :** অতীত ঘটনাবলীর উপকরণ ও বিবরণাদিকে আমরা কোন বিষয়ের মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করি। প্রাচীনকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক জীবনের বহু কিছু আমরা সেই যুগের উপকরণাদি থেকে জানতে পারি। এই সব উপকরণ কোথাও ভূপৃষ্ঠে, কোথাও জলাশয়, নদী বা সাগরে নিমগ্ন ছিল, কোথাও বা পর্বত শীর্ষে কোথাও বা মরুবালুকায় চাপা পড়েছিল। সভ্য মানুষ অজ্ঞাতকে জানবার জন্য সে সব সংগ্রহ করেছে ও করছে। সংগৃহীত সামগ্রীগুলি সংগ্রহশালায় রক্ষিত থাকে। এই সংগৃহীত বিষয় বা স্ব-স্ব স্থানে রক্ষিত বিষয় বস্তু আমাদের অতীত ইতিহাসের উৎস বা মূলসূত্র। শিক্ষাদান কর্মে এই উৎসের ব্যবহারকে বলা হয় উৎস পদ্ধতি। মূলগ্রন্থাদি পাঠও উৎস পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতি প্রথমে উৎস সন্ধান এবং পরে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

এই উৎস পদ্ধতি পরীক্ষণাগার (Laboratory) পদ্ধদ্ধি হিসেবেও অভিহিত। কোন বিষয়ের উৎস সন্ধানের জন্য প্রয়োজন হয় উপাদানগুলি সংগ্রহ, তাদের বিচার, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত। এই উপাদান বা উৎস মুখ্য (Original) বা গৌণ (Secondary) হতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গবেষক নয়। তারা মৌলিক উপাদান সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে না কিন্তু উপাদান ভিত্তিক পুস্তকাদি পাঠ করা ও বিষয় বস্তুর সঠিকতা সম্পর্কে বিচার করতে চেষ্টা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীর এই সন্ধানী দৃষ্টি, সংগ্রহ-প্রবণতা, বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ সর্বজন কাম্য।

উৎস পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of Source Method) :— শিক্ষদান ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে উৎস পদ্ধতির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। উৎস পাঠ্য বিষয়ের উপাদান ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই পদ্ধতি পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে একমাত্র ও অপরিহার্য উপায় হিসেবে গণ্য। সমাজবিদ্যা অতীতকালের

সমাজ ও ভৌগোলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অতীতের ঘটনা ও দৃশ্যাবলীকে শিক্ষার্থীর সামনে বাস্তব করে তুলতে পারে এই উৎস পদ্ধতি। উপকরণগুলি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যেন পুস্তকে লিখিত অমূর্ত বিষয়গুলি মূর্ত ও বাস্তব হয়ে ওঠে। সমাজবিদ্যা মানুষের বাস্তব জীবন, সমাজ, ও তাদের সমস্যাবলী আলোচনা করে। উপকরণ ও মূলগ্রন্থাদি শিক্ষার্থীরা হাতে পেলে তারা বুঝতে পারে সমাজবিদ্যার বিষয়গুলি তাদের জীবন সম্পর্কিত বিষয় ; ওগুলি রূপকথা, গল্প বা অবাস্তব কাহিনী নয়।

দ্বিতীয়তঃ, 'কিভাবে যথার্থ বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যায়'—মূলসূত্র বা উৎস পদ্ধতি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে। তাই পাঠ্যপুস্তকের বিষয় বস্তু সম্পর্কে তারা যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হোক না কেন ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই পদ্ধতি শিশু শিক্ষায় যেমন উপকারী তেমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী। শিক্ষার স্তর ভেদে এবং তদনুযায়ী এর প্রয়োগে পার্থক্য থাকে কিন্তু এ পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে উপকারী।

তৃতীয়তঃ, এই পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিচার, বিবেচনা অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুকূল দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

চতুর্থতঃ, শিক্ষাক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষা উৎপাদনের উপায় নির্ধারণ অধিক প্রয়োজনীয় ; বাস্তবক্ষেত্রে গন্তব্য স্থানে পৌছান অপেক্ষা সেই উদ্দেশ্যে অতিক্রান্ত পথের উপযোগিতা অনেক বেশী। উৎস সন্ধানের সময় বিষয়-বস্তুর সংগেও শিক্ষার্থীর নিবিড় সংযোগ ঘটে। সুতরাং সন্দেহ নেই যে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় সেই সব উপায়ের মধ্যে শিক্ষণীয় বহু কিছু থাকে। উৎস পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের লক্ষে পৌছবার পথে বা প্রণালীর মধ্য দিয়ে—তাদের বহু দক্ষতার বিকাশ সাধন করে।

পঞ্চমতঃ, মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস সমাজবিদ্যার অনেকখানি অংশ অধিকার করে। এই ঐতিহাসিক অংশ টুকুর জন্যে মূল উপকরণ পদ্ধতি সবিশেষ প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু সমাজবিদ্যায় পৃথিবীর বহু দেশের সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বিবরণ সংশ্লেষিত অবস্থায় লিখিত থাকে। সব বিষয় শিক্ষার জন্য মূল উপকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব হয় না ; তবে অনেক সময় মূল গ্রন্থাদি পাঠ করা যেতে

পারে। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা গবেষকের কর্ম সম্পাদন করান সমীচীন নয়। এতে পদ্ধতি প্রয়োগের কুফলটাই বেশি দেখা যায়। তাহলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই পদ্ধতি একমাত্র পদ্ধতি নয়। শিক্ষাদানক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কি ভাবে উৎস পদ্ধতিকে কাজে লাগান যায়? (How to utilise the Source Method): মূলসূত্র পদ্ধতি সমাজবিদ্যার শিক্ষাদান ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়।

(i) পুস্তকে লিখিত নীরস বিষয়গুলিকে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে দেখলে বিষয়গুলি সত্যই জীবন্ত, সুস্পষ্ট ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষণকে স্বতঃস্ফূর্ত করার জন্যে মূল গ্রন্থাদি পাঠের সুযোগ থাকা উচিত। মূলগ্রন্থ এবং; প্রাথমিক উপকরণাদি শিক্ষার্থীর মনোরাজ্যে অবিকল পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(ii) পদ্ধতিকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানর জন্য মাঝে মাঝে সমাজবিদ্যা থেকে বিশেষ বিশেষ বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই নির্বাচিত বিষয়গুলি কোন্ কোন্ মূলগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন। এই নির্দেশ অনুসারে যদি শিক্ষার্থীরা অগ্রসর হয় তবে প্রাথমিক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তারা এই পদ্ধতি অবলম্বনে অভ্যস্ত হবে। ক্রমশঃ তারা বিভিন্ন বিষয় পাঠ ও বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে শিখবে। শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষেত্রে মৌলিক সৃষ্টি কর্ম নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

(iii) শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে মনোযোগ সহকারে সমাজবিদ্যার সমস্যা অথবা প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্বাচন করতে পারেন। সমস্যা মূলক বিষয়গুলির সমাধানের জন্য মূল উপকরণাদি এবং মূল গ্রন্থাদি থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করার দায়িত্ব থাকবে শিক্ষার্থীর উপর। শিক্ষার্থীরা এই ভাবে যদি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাদের মনের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করবে। শিক্ষার্থীরা এমন বিষয় ভুলতে পারে না। ভ্রান্তি অথবা অসঙ্গতি মূলক বিষয়াদির সঠিক বিচার করার জন্য শিক্ষক মূল উপকরণাদি বা গ্রন্থাদি শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করতে পারেন। অসঙ্গত বিষয়াদির নির্বাচন ও বিচার করার জন্য শিক্ষার্থীর কার্যাবলী নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীকে বহু বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে। তারা হয়ে ওঠবে সুবিচারক,

সুনির্বাচক, পরমতসহিষ্ণু, সমস্যা সমাধানে ও অসঙ্গতিতে সঙ্গতি আনয়নে দক্ষ। এই পদ্ধতিতে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই যে-সব কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে অগ্রসর হতে হবে সেইগুলিই তার শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক।

(৪) যে-সব শিক্ষার্থী শিক্ষাগত বিষয়ে অধিক অগ্রসর, মেধাবী ও বুদ্ধিমান তারা এই পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় সমাজকে উপহার দিতে পারবে। তাদের এই অবদান সমাজের পক্ষে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। উৎস বা মূল উপকরণাদির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে করতে তারা উৎসের সন্ধানে আরও আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে। তাদের মৌলিক অবদান হয়ে উঠবে সমাজের অমূল্য সম্পদ।

শিক্ষকের জ্ঞান যত গভীর হবে, তাঁর পরিচালন ক্ষমতা যত সুদক্ষ হবে, এই পদ্ধতি অবলম্বনে ততই সুফল পাওয়া যাবে। কি ভাবে পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে হয় তা শিক্ষালাভ করাই যথেষ্ট নয়, পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিবিধ গুণ অর্জনের জন্য শিক্ষককে যে পরিশ্রম করতে হয় সেইটাই শিক্ষাকার্যে সাফল্য আনয়ন করবে। অন্যথায় স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যধিক ক্ষতিকর হবে।

(ঞ) **সমাজীকৃত পাঠচর্চা (Socialised Recitation method):** বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণীকক্ষের ন্যায় পাঠক্রমের মধ্যে সমাজ চেতনার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছে। ফলে এই পদ্ধতির মধ্যেও সমষ্টিগত বা সামাজিক প্রেরণা ক্রমশঃ প্রধান অংশ গ্রহণ করছে। কার্যতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সমষ্টি গত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অন্যতম নীতি হিসেবে গৃহীত হতে চলেছে।

ভারতে একসময়ে সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য আমাদের পরস্পরকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখত। তখন দেখা যেত, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুত্র পৈতৃক পেশা গ্রহণ করত। পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই সমাজ জীবনে সে প্রশংসা ও স্বীকৃতি অর্জন করত। সামাজিক জীবন যাত্রায় তার এই পেশাগত কাজ কখনও অবহেলিত হত না। শিক্ষা তখন সামাজিক ও পারিবারিক পেশার অনুগত ছিল। বর্তমান শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক পেশা থেকে সকলকেই বিচ্যুত করে বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করছে, ফলে সমষ্টিগত ভাবধারায় শিক্ষার্থীর মন উদ্বুদ্ধ হয় না। অবশ্য

ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ শিক্ষাই সমাজের দৃঢ় বন্ধনকে রক্ষা করেছিল কিন্তু ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত নব্য শিক্ষা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষার অবসান ঘটায়। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা সমাজীকরণের কোন মূল্য দেয়নি বরং স্ব-স্ব প্রাধান্য ও পার্থক্য বিস্তারই ছিল সেই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান শিল্পতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যালয়ই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং শিক্ষাধারার মধ্যে যদি সামাজিক চেতনা আনয়ন করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা পরিণত বয়সে স্বীয় সমাজকে আপন করে নিতে পারবে। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার্থীকে যদি সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা যায় তাহলে বাস্তব সমস্যা বিজড়িত সমাজে সে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারবে এবং সুনাগরিক হয়ে অপরাপর নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রতি তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পাদন করতে বিরত হবে না।

সমাজচেতনা জাগাবার জন্য সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি প্রয়োগের দিকে আধুনিক শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সকলেই আজ স্বীকার করেন যে শিক্ষার্থীর শিক্ষা যত সমাজমুখী হবে শিক্ষা ততই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রগতিশীল হবে। সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের এই সুযোগ প্রদান করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক ভাবধারায় প্রণোদিত করে এবং কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সমষ্টিগতভাবে চিন্তন, মনন ও প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সিদ্ধান্তটিও সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠে।

সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি প্রয়োগের বিভিন্ন রীতি বর্তমান। পুরাতন রীতি অনুসারে মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতিকে গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি বলা যায়। তবে কোন সমস্যামূলক প্রশ্ন থাকলে সরাসরি পুস্তক থেকে উত্তর সংগ্রহ করা যায় না। তখন শিক্ষার্থীদের অন্যান্য উপকরণাদি থেকে সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে হয়। এই প্রথার প্রধান অসুবিধা হল, শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে বক্তব্য পেশ করার সময় মুখস্থ করা বিষয়বস্তু বলার চেষ্টা করে। ফলে বিষয়টিকে হৃদয়ঙ্গম না করেও অনেকে মুখস্থ করে উত্তর দিতে পারে। এর ফলে মৌলিক চিন্তা বিকাশের কোন সুযোগ থাকে না। অথচ প্রকৃত সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতিতে সমষ্টিগত চিন্তার বিকাশ হয়; শ্রেণীকক্ষ পরিণত হয় গতিশীল সমষ্টিগত জীবনধারার কেন্দ্ররূপে। ফলে শিক্ষার্থীরা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পায়, কেউই পশ্চাৎপদ বা হতাশ হয় না।

প্রকৃত সমষ্টিগত শিক্ষণপদ্ধতির বিবিধ রূপ বা প্রকার ভেদ থাকে। প্রথমতঃ, এই পদ্ধতি কোন সভা অনুষ্ঠানের স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে। সভার কতকগুলি কার্যসূচী থাকে ; সেই সূচী সম্পর্কে সভ্যরা স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করতে পারে এবং পারস্পরিক মতবাদকে যাচাই ও বাছাই করে নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বহুমুখী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এই সভার আলোচনায় শ্রেণীর প্রত্যেক সভ্যই অংশ গ্রহণ করবে এবং শিক্ষক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ সমাজীকৃত শিক্ষণপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতিকে নির্বাচন করে লোকসভার রীতিতে (a Parliamentary procedure) সভা পরিচালনা করতে পারে। অনেক সময় শিক্ষক সভাকক্ষে না থেকে অন্তরালে থাকতে পারেন। কিন্তু এতে শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে দল সৃষ্টি ও পরে সভার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। সুতরাং সমাজীকৃত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে সভা পরিচালনা ও নির্দেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ও ভাষা প্রকাশে অসুবিধা দেখা দিলেও, পরে পরে শিক্ষার্থীদের মন সরল, সহজ, মুক্ত অথচ শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়।

সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of Socialised Recitation Method) : সমাজীকৃত শিক্ষাপদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগে নিম্নলিখিত ফলশ্রুতি লাভ করা যায় :

(ক) সমাজবিদ্যা পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা। সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীমাত্রই সামাজিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে।

(খ) এই পদ্ধতি নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করে।

(গ) শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে পড়াশুনা করে সমষ্টিগত পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ফলে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ সে পায়।

(ঘ) অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর আলোচনা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা এবং দক্ষতা বিকশিত হয়।

(ঙ) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে কাজের প্রতি আগ্রহ, কর্ম-সম্পাদন, সংগঠন ও সক্রিয় সহযোগিতার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়।

(চ) শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় পড়াশুনার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ ও সংযম লাভ করে। ফলে, উন্নত স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রগতিশীল চিন্তা ও ভাবরাশির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের সহায়তায় স্বল্পমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্ততঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সুমধুর হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সহানুভূতিশীল বন্ধু, যোগ্য পরিচালক ও বিজ্ঞ দার্শনিকরূপে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতির ত্রুটি (Demerits of the Socialised Recitation Method): প্রথমতঃ, অনেক পদ্ধতিবিদ শিক্ষক সমাজীকৃত পদ্ধতিকে শ্রেণীশিক্ষার অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সীমিত সময়ের অপব্যবহার হয়। বিষয়ভারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জর্জরিত। তাদের কর্মসূচীতে সময়ের ভাগাভাগি এমনভাবে করা হয় যে, তারা প্রতিটি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভের যথেষ্ট সময় পায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে মেধাবী কয়েকটি ছাত্র শ্রেণীকক্ষে প্রভাব বিস্তার করে, সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণে বঞ্চিত হয়। ফলে পরস্পরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কালক্রমে অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ সময় সময় যান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হয়। কারণ শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে শিক্ষকের আদেশ পালনে বাধ্য হয়। এরূপ শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ ঘটতে পারে না। সুতরাং এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অতি নিপুণতার সহিত শিক্ষকের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিকীকরণের তাগিদে সমাজবিদ্যা যেমন অন্যতম বিষয়, তেমনি এই পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ একান্ত কাম্য। সমাজবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতির উপযোগিতা প্রচুর বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, এই পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত।

(ক) সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত অনেক বিষয় থাকে যে-গুলির গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। তাছাড়া, বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের মতামতের মূল্য দেওয়াও যুক্তি যুক্ত।

(খ) আলোচনা কক্ষে বসবার ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যেন সকল স্তরের শিক্ষার্থী সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

(গ) শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা যাতে শিক্ষা পরিবেশকে কলুষিত করতে না পারে সে দিকে নজর রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব থাকবে যথেষ্ট, যেন শিক্ষার্থীরা সংযত হয়ে শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। ছাত্রের বয়স, কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধের উপর শিক্ষকের শাসন নির্ভর করে। অল্প বয়স্ক ছাত্র বিশেষ করে যাদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ তেমন জাগ্রত হয়নি তাদের প্রতি শিক্ষককে অধিক সাবধান হতে হবে।

(ঘ) পাঠ-পরিচালনা এমন হবে যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করা, প্রতি দলের দলপতি নির্বাচন করে একদিকে যেমন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি সকল দলকেই এক একটা বিষয় আলোচনায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(ঙ) আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে এক একটা দলের উপর আলোচনার ভার অর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুর পঠন-পাঠন শেষ করার সুবিধা হয়।

(চ) আলোচনা পরিচালন ব্যাপারে শিক্ষককে আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন:

(১) বিষয়বস্তুর আলোচনা যেন গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়।

(২) আলোচনা যেন ব্যক্তিকে আঘাত না করে, বিষয়গত উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত হয়।

(৩) আলোচনাকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত করার জন্য শিক্ষার্থীরা যেন প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির সাহায্য লাভ করতে পারে।

(৪) সিদ্ধান্তে পৌছানর প্রাক্কালে সমস্ত শিক্ষার্থীরা যেন বিষয়গত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।

(৫) শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতা দ্বারা লাভবান হয়।

সমাজবিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কোন পদ্ধতি একক ভাবে যথেষ্ট উপযোগী নয়। পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সর্বোৎকৃষ্ট—সে সম্পর্কে মত প্রকাশ করা দুরূহ। পদ্ধতির

সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পরিচালন ক্ষমতা এবং বিষয় বস্তু সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যের উপর। সুদক্ষ শিক্ষক কখনও একটা পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন না। প্রয়োজন মত বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষাকে জীবন্ত, ক্রিয়াশীল ও মুখর করে তুলতে পারেন।

কোন একটি পদ্ধতিই পূর্ণাঙ্গ নয়। উপযুক্ত পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি, যে পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ ও প্রচেষ্টার প্রেরণা সঞ্চার করে, শিক্ষার্থীর মনে আত্মসক্রিয়তা ও উদ্যমশীলতা সৃষ্টি করে, নিজস্ব চিন্তাধারা গঠন করে এবং শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা ও সমাজীকরণের পথে পরিচালিত করে আর শিক্ষাকে গতিশীল ও বাস্তবধর্মী করে তোলে।

শিক্ষক হলেন প্রভু আর পদ্ধতি তাঁর সেবক (servant) মাত্র। শিক্ষকের প্রয়োজনে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ হবে তখনই যখন শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ ও কর্মপ্রেরণা জাগবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এক কথায়, শিক্ষার্থীর জীবনে অভিপ্রেত শারীরিক ও মানসিক গুণ ও কৌশলাদির বিকাশ সাধন হল সার্থক পদ্ধতির লক্ষণ।

(ট) সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Interview and Questionaire Method) : বাস্তব জীবনে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য শিক্ষার্থীকে তৈরী করিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত সময় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। বাস্তব পরিস্থিতি অনেক সময় মানুষকে ভীতি-বিহ্বল করে তোলে। অজানা সঙ্কটের কল্পনাতে সে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। শিশুকাল থেকে যদি শিক্ষার্থীকে নানা সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য করা যায়, তবে সে অজ্ঞাত ভাবী সঙ্কটের সম্মুখীন হবার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে পারে। এর জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি হল সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক রীতিতে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা। এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেই সাক্ষাৎকারের জন্যে তৈরী হতে হয়। ফলে যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করে শিক্ষকের তৈরী পরিবেশে শিক্ষার্থীকে উপস্থিত হতে হয়। তাকে শিক্ষকের যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।[1] এর জন্যে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন বিষয়বস্তু (subject matter) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, অন্যদিকে

1. মূল্যায়ন অধ্যায় দ্রষ্টব্য

তেমনি সঙ্কোচ কাটিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়। সামাজিক মানুষ হিসেবে এই মানসিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা যুক্তিযুক্ত :

প্রথমতঃ, পাঠ্যবিষয়ের কোন 'একক' সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ ও তার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য শিক্ষক পূর্বেই শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্নাবলী রচনা করবেন যেন ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুর পরিচয় থাকে।

তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময় শিক্ষার্থীরা পরপর সাক্ষাৎ ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষকের নির্দিষ্ট কক্ষে তাঁর সম্মুখে হাজির হবে।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেককে সব-কটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে সময় সীমার পরিপ্রেক্ষিতে দু-একটি করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই বাঞ্ছনীয়। তাহলে শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কিছুই জানতে পারবে না। ফলে নির্দিষ্ট একক সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য সকলেই চেষ্টা করবে।

পঞ্চমতঃ, সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ণের নিমিত্ত তালিকা (Record) রাখা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের বার্ষিক কৃতকার্যতা বিচারে এই তালিকা হবে অপরিহার্য সোপান।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অনস্বীকার্য উপায়। শ্রেণীকক্ষে আলোচনা, গ্রন্থানুসরণ প্রভৃতি পদ্ধতিতে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তার ফল একটু অন্যরূপ। শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনে অন্য শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে অথবা একজন শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর চাইতে উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে ; কিন্তু সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যে—ভয়, সঙ্কোচ, সংকট কাটিয়ে ওঠার অদম্য চেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে স্ব-স্ব ভাব প্রকাশের বিশেষ গুণ লাভ করতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজবিদ্যা

(Social relationships & Social Studies)

১। সমাজ সংগঠন (Formation of Society) :

এই পৃথিবীতে কবে মানুষের জন্ম হয়েছে তার সঠিক সংবাদ ইতিহাস বলতে পারে না। মানুষের সমাজই বা কবে সৃষ্ট হয়েছে সাল তারিখের দ্বারা তার কোন ব্যাখ্যা, প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে মানব-সভ্যতার যে আদিমতম ইতিহাসের সংবাদ আমরা জানি তাতে দেখা যায়, আসঙ্গ লিপ্সাই মানুষের সমাজ সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। মানুষকে তার আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যও একত্র হতে হয়েছে, কেননা সভ্যতার প্রথম স্তর প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্বে কণ্টকিত। প্রকৃতির নিয়ম মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তাই প্রকৃতি ছিল সেদিন রহস্যময়ী ও ভয়ংকর। কিন্তু পরবর্তী স্তরে মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে—প্রকৃতি আজ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু।

সে যা'হোক, মানুষের আদিমতম সঙ্গচেতনা বা আসঙ্গলিপ্সার (grageriousness) পরিণতিই হল সমাজ। সঙ্গ-প্রেরণা মানুষের সহজাত ধর্ম। কোন মানুষের পক্ষে একাকী থেকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রাচীন আরণ্যক সমাজ থেকে সুরু করে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ সেই একই সঙ্গ চেতনার বহুমুখী প্রকাশ। প্রথমে পরিবার, তারপর গোষ্ঠী—গোষ্ঠী থেকে সমাজ এক বিবর্তনের ধারায় মানব ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সেই সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই—মানুষের সামাজিক চেতনা উদ্ভবের ইতিহাস মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে লুকিয়ে আছে। অনুমান ও বিশ্লেষণমূলক যে ব্যাখ্যা আমরা এ সম্বন্ধে প্রদান করি, তার অনেকটাই আমাদের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু তবুও এসব ব্যাখ্যা সমাজের সংগঠন ও স্বরূপ সংব্যাখ্যানে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। সমাজ বিজ্ঞানে সমাজের উৎপত্তি নির্ণয়ে সাধারণ দুটি মতই গৃহীত হয়ে থাকে—একটি সামাজিক চুক্তি (Social

contract) মতবাদ; অন্যটি আঙ্গিক (organismic) মতবাদ। প্রথম মতবাদের সপক্ষে রয়েছেন দার্শনিক হবস্, লক্, রুশো প্রভৃতি, আর দ্বিতীয়টির পক্ষে আছেন জার্মান রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ ব্লান্‌শলি (*Bluntchli*), রাশিয়ার সমাজতত্ত্ববিদ নোভিকভ, জার্মান দার্শনিক হেগেল, আমেরিকার মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাক্‌ডুগাল, ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ প্রভৃতি। প্রথম মতবাদ অনুসারে পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। উহা মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য পারস্পরিক চুক্তি-ভিত্তিতে সংগঠিত। এদের মতে আগে ব্যক্তি, পরে সমাজ। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে সমাজকে একটি প্রাণীদেহের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়, উহা একটি স্বাভাবিক জীবন্ত সংস্থা। মানুষ এই সমাজ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ। সুতরাং ব্যক্তির কোন নিজস্ব সত্তা নেই—সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কল্পনা মাত্র। এখানে আগে সমাজ, পরে ব্যক্তি। উভয় মতই স্ব-স্ব পক্ষের যুক্তিভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অথচ উভয়েরই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিরল। সমাজ সংগঠনের লক্ষ্যে মানুষের শুভবুদ্ধি কবে ও কোথায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য ক্রিয়াশীল হল বা ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখবোধ, চেতনা ও বিচার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে কিভাবে জীবন সংস্থা এই সমাজ ব্যক্তিকে গ্রাস করল—এ কথা চিন্তা করা যেমন দুরূহ; তেমনি এর নজীর দেখানও সম্ভব নয়। তবে একথা সত্য যে, ঐতিহাসিক বিবর্তনে রক্তের সম্পর্ক, ঐক্য ও সংহতিবোধ, সমষ্টি ও ব্যষ্টির স্বার্থে আজকের সমাজ স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। তাই এই সমাজ সত্যই গতিশীল ও জীবন্ত।

সামাজিক বন্ধনের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা প্রথমে দেখতে পাই, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের প্রয়োজন মেটানর তাগিদ। আদিম স্তরে এই প্রয়োজন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। খাদ্য সংগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া ছিল সেদিনের বড় কথা। গতিশীল সমাজে এই সামান্যতম প্রয়োজন দিনে দিনে বাড়তে থাকল। মানুষের অভাব হল অনন্ত, আর প্রয়োজন হল সীমাহীন। এই অভাব ও প্রয়োজন মেটাবার জন্যে দরকার হল ঐক্য ও সংহতির, আর এই ঐক্য ও সংহতির ফলশ্রুতি হল জীবন্ত ও সুদৃঢ় সমাজ।

সমাজ গঠনের মূলে দ্বিতীয় অনিবার্য বিষয় হল, আঞ্চলিক প্রভাব। তাই দেখি সমাজ কোথাও সুসংহত, কোথাও অস্থায়ী। মরুর বুকে স্থায়ী সমাজের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বেদুইন বা যাযাবররা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে অথচ

অস্থায়ী সমাজে তাদের বাস। পার্বত্য ভূমিতে প্রকৃতির আনুকূল্যে মানুষ দলবদ্ধভাবে একবার পর্বত শিখরে আবার কখনও তলদেশে চলাফেরা করে। সমুদ্র বেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীরা দলবদ্ধভাবে নৌ-যাত্রায় পটু, অথচ স্থায়ী ও সুসভ্য সমাজ গঠন করতে তারা সমর্থ নয়। কিন্তু সমভূমির সমাজে এর সংহত রূপ দেখা যায়। সেখানে গড়ে ওঠে জনপদ, নগরও পল্লী। এখানে স্থায়ী, অস্থায়ী সকল প্রকার সমাজের উপর আঞ্চলিক প্রভাব ক্রিয়াশীল। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক প্রভাবে গড়ে উঠেছে বিভিন্নরূপ সমাজ ব্যবস্থা।

সামাজিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়ার মূলে তৃতীয় উপাদান হল সংস্কৃতি ও আদর্শগত ঐক্য ও সংহতি। তাই এক একটা সমাজে এক এক প্রকার ভাব, লোকাচার, এবং কৃষ্টিগত আদর্শ গড়ে ওঠে। সমাজ বা সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সেই প্রচলিত আদর্শ ও লোকাচার মান্য করে ও সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করে। ফলে সমাজ হয়ে ওঠে জীবন্ত, গতিশীল ও প্রভাবশালী। ব্যক্তির উপর এই সামগ্রিক সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সমাজের ভাবধারায় ব্যক্তি বর্ধিত ও বিকশিত হয়। এক একটা সমাজের মধ্যেও রয়ে গেছে বৈচিত্র্য। স্বার্থগত ভিন্নতাই এই বৈচিত্র্যের মূল কারণ। এর ফলেই মানুষের ইতিহাস রচিত হয়েছে সংগ্রামের ইতিবৃত্তে। ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে বৈষম্য থাকলেও এক একটা সমাজের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাবধারা যেন একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত।

তাই শুধুজনসমষ্টি দ্বারা সমাজের সৃষ্টি হতে পারে না। যখন একই ভাবধারা বা সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের মনে সহযোগিতা ও পারস্পরিক্ সমবেদনা গড়ে উঠে, তখনই সৃষ্টি হয় প্রকৃত সমাজ। গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, সে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত।"[1] যে মুহূর্তে একজন আর একজনকে জানতে পারে বা তার সম্পর্কে সচেতন হয় বা পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতা অথবা বৈরীতার ভাব জেগে উঠে, তখনই সুরু হয় সামাজিকতা বা সামাজিক সম্পর্ক। তাই গিসবার্ট (*Gisbert*) বলেন,[2] 'সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি মানসিক

1. "Society, in general, consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconnected with his fellowmen." —P. Gisbert.

2. "Sociality or Society is essentially a mental phenomenon." —P. Gisbert. : 'Fundamentals of Socialogy'

ব্যাপার।' অধিকন্তু সমাজে থাকে নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি ও সামাজিক সম্পর্ক। যেখানে জনসমষ্টির মধ্যে কোন সমাজ-বোধ জাগরিত হয় নি, যেখানে পারস্পরিক আদান প্রদান সচেনতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সেখানে কোন সামাজিক বিধি গড়ে উঠতে পারে না এবং সমাজও সৃষ্টি হতে পারে না। এরূপ জনসমষ্টি সমাজ পদবাচ্য নয়। সামাজিক জনসমষ্টির থাকবে পারস্পরিক বুঝাপড়া ও স্বীকৃতি। তারা হবে সমতা ও ঐক্য বোধে উদ্বুদ্ধ।[1] এই সমতা ও ঐক্য বোধ গড়ে উঠে আত্মীয়তা বোধের (we-feeling) মাধ্যমে। ইহাই সমাজ জীবনের কেন্দ্র বিন্দু। এই প্রাণ কেন্দ্রের চারদিকে সমাজ জীবনে থাকবে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যই এনে দেয় সজীবতা ও ঐশ্বর্যপূর্ণ সম্ভাবনা। যার ফলে সমাজ পরিবর্তনশীল ও বিবর্তনমুখী হয়। দেশ কালের তালে তালে, এইরূপ সমাজ এগিয়ে চলে পরিণতির দিকে।

২। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক (Relation between Society and individual):

সমাজ হল বিচিত্র মানব সম্পর্কের জটিল জাল। তাই 'সমাজ' শব্দটি যেমন সংকীর্ণ অর্থে তেমনি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ, মাড়োয়ারী সমাজ, পণ্ডিত সমাজ ইত্যাদি সমাজকে আমরা ধর্ম, ব্যবসা বা সমস্বার্থ অর্থে সমাজ-শব্দরূপ ব্যবহার করি। আবার ব্যাপক অর্থে একত্র বসবাসকারী, বহুবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ—বৃহৎ জনসমষ্টি বুঝাতেও 'সমাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্র পরিবার ও পরিবেশ থেকে বিশ্বব্যাপী মানব গোষ্ঠী আজ 'সমাজ' শব্দের সঙ্গে জড়িত। 'সমাজ' শব্দটির ব্যাপকতার মত সামাজিক সম্পর্কও বিচিত্র এবং বহুমুখী। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক বিদ্যায়তনের সামাজিক সম্পর্ক। মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন প্রভৃতি পারিবারিক পরিবেশে সামাজিক সম্পর্ক। নির্বাচক ও নির্বাচন প্রার্থীর সম্পর্ক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক

---

1. If there were no sense of commnity, if there were no co-operative undertakings by man, there would be no social system, no society or societies—there would be practically nothing for sociologists to study. Hence the relationship which are central to sociology are those which involve both mutual recognition and the sense of something held or shared in common. Maciver & Page. : 'Society'

প্রকার সামাজিক সম্পর্ক। দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে যুদ্ধ, সন্ধি, শান্তি চুক্তি ও বাণিজ্য-চুক্তি ইত্যাদি সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উক্ত সামাজিক সম্পর্ক একাধিক সজীব প্রাণীর মধ্যেও রয়ে গেছে। গাড়ীর সামনের চাকা ঘুরলে পেছনের চাকাও ঘোরে, জলস্রোত প্রবল হলে হাইড্রো-ইলেট্রিক মেসিন চলে—এ সম্পর্ক যান্ত্রিক, সামাজিক নয়। সমামাজিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন চেতন প্রাণীর। তাই আমরা দেখি, পশু-পক্ষীদেরও সমাজ আছে; তারাও দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। কিন্তু এদের ঐক্যবোধ অস্পষ্ট। আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি, সন্তান উৎপাদন ও পালনের মধ্যে তাদের সেই সংগ চেতনা সীমিত। ফলে পশুর সমাজ জীবন্ত, গতিশীল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। তাই পশু সামাজিক জীবরূপে গণ্য নয়—মানুষই সামাজিক জীব। মানুষ অসামাজিক হতে পারে না। অসামাজিক হলেই—তারা হয় পশু না হয় দেবতা। সমাজ জীবন হ'ল মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

উল্লেখিত আলোচনার মূল বিষয় হ'ল, মানুষ সামাজিক জীব এবং সামাজিক সম্পর্ক বিচিত্র ও বহুমুখী। মানব সম্পর্কের এই বিচিত্র এবং বহুমুখী ধারার মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তা আজও সর্বজন জিজ্ঞাস্য। সমাজের উৎপত্তি সংক্রান্ত দুটি বিপরিত মতবাদের ন্যায় এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য দুটি মত পাওয়া যায়। যথা (১) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ (*Individualism*) এবং (২) সমাজতন্ত্র বাদ (*Socialism*)। প্রথম মতবাদে আছে ব্যক্তির প্রাধান্য। এখানে ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না, চেতনা, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি। এদের মতে আগে ব্যক্তি, পরে সমাজ। দ্বিতীয় মতে সমাজ আগে। সামাজিক প্রয়োজন ও কল্যাণ প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়। এদের মতে, আগে সমাজ ও পরে ব্যক্তি। ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যু আছে সমাজ অমর, চিরন্তন। ব্যক্তির জন্ম, বিকাশ ও শেষ পরিণতি এই সমাজ বক্ষে। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তিকে কল্পনা করা মিথ্যা। এখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা, স্বাধীন চিন্তা ইত্যাদি অস্বীকৃত। কিন্তু এই দুই মতবাদের কোনটিই ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এগুলি রাজনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। উভয় মতবাদের পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও এদের সমন্বয়ের মাধ্যমে আসতে পারে কল্যাণ। উভয় মতের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যকরণের মাধ্যমে যে নতুন বোধ গড়ে উঠে সেখানেই আছে ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্পর্ক। এই সম্পর্কে ব্যক্তি বা সমাজ কাউকে

অস্বীকার করবার উপায় নাই। এই সম্পর্কে দুয়ের কাউকে আগে আর কাউকে পরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এখানে সম্ভব ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের সমন্বয়। ব্যক্তি এগিয়ে আসবে তার সেবা ও কল্যাণ ধর্ম নিয়ে সমাজের মঙ্গলার্থে আর সমাজ স্বীকার করবে ব্যক্তির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব পরিলক্ষিত হলেও ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*) মতে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনি বলেন, "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের নীতির মধ্যে কোন সত্যিকারের বিরোধিতা আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তির প্রকৃতিকে সংকুচিত ও নিস্তেজ করে সকলের কল্যাণ কখনও লাভ করা যায় না।"[1] বস্তুতঃ, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হলেই আদর্শ সমাজের উদ্ভব হয়।

সমাজ সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র যে মানুষ তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব—পশু নয়, দেবতা নয়, জড় পদার্থও নয়। সুতরাং মানুষ ছাড়া সমাজকে কল্পনা করা যায় না। রক্তের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে পরিবার, পরিবার গড়ে তুলেছে গোষ্ঠী, আর এই গোষ্ঠী জীবনের পরবর্তী সংগঠন সমাজ। সামাজিক আদর্শ, কৃষ্টি, সভ্যতা, ভাবধারা, লোকাচার—এক কথায় সামগ্রিক সংস্কৃতি মূলতঃ মানুষের মত জীবন্ত ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের মূলে গোষ্ঠীবদ্ধ পারিবারিক ব্যক্তি সমষ্টির শারীরিক-মানসিক কর্ম-প্রয়াস ও কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজগঠনে যেমন ব্যক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না, তেমনি সামাজিক আদর্শ কৃষ্টি ও সভ্যতায় ব্যক্তিসত্ত্বার অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং ব্যক্তি হল সমাজের প্রাণকেন্দ্র।

অন্যদিক থেকে ব্যক্তির বিকাশে সমাজের অবদান অপরিসীম। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের গড়া সমাজকে মানুষই সংরক্ষণ করে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে দুটি সত্ত্বা—একটি ব্যক্তিসত্ত্বা, অন্যটি সামাজিক সত্ত্বা। এই দুটি সত্ত্বাই প্রাকৃতিক পরিবেশে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিকশিত হয়। শিশু যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে তখন তার মাতাপিতা,

1. "It does not apppear, however, that there is any real opposition between the principles of Individualism and of Socialism. The good of all can certainly not be secured if the nature of each is cramped and underfed." —Mackenzie. : 'The outlines of Social Philosophy'

ভাইবোন, পরিবার, গোষ্ঠী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশ তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের এইরূপ প্রভাব ও পরিবেশের মধ্যে শিশু বর্ধিত ও বিকশিত হয়। সামাজিক আদর্শ, কৃষ্টি, লোকাচার, ভাবধারা যেন ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান শিশুকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতই সে হয়ে ওঠে আপন সমাজের সভ্য। সামাজিক প্রভাব থেকে সে মুক্তি পায় না। ব্যক্তি আর সামাজিকসত্তা যে একই অঙ্গের বিপরীত দিক। এদেরকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ, কোন সম্পূর্ণ জিনিসকে খণ্ডবিখণ্ড করে সক্রিয় জীবনীশক্তি থেকে বঞ্চিত করা। দুটি সত্বাকে পৃথক করে চিন্তা করার অর্থ মনুষ্যোচিত চিন্তাকে বিসর্জন দেওয়া বা অসামাজিক হওয়া। সুতরাং ব্যক্তিসত্বার বিকাশের সময় শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্বাকে অবহেলা করা যায় না। উভয়সত্বার বিকাশ সাধনের অর্থ হল, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। শিক্ষায় এটা আমাদের অন্যতম অভিপ্রেত প্রচেষ্টা।

ব্যক্তি তার সমাজের সঙ্গে নানা ভাবে সম্পর্ক বিজড়িত। যতক্ষণ মানুষ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একক, ততক্ষণ সে নররূপী জীবমাত্র। সে ব্যক্তিত্বের সচেতনতা থেকে বঞ্চিত। ব্যক্তিবোধ তখনই তাকে উদ্বুদ্ধ করে যখনই সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে সে সমাজ সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় হয়। ক্রিয়াশীল হওয়ার অর্থ হল সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্তব্য নির্ধারণ করা। সামাজিক ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। যেখানে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবার বিশ্বজোড়া সামাজিক ক্ষেত্রের সর্বপ্রথম স্তর। পরিবারেই মনুষ্য জীবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়। তাই ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে 'পরিবার' শব্দটি সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয় অর্থে বিবেচিত হয়। সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত পরিবারে সভ্য সংখ্যা সীমিত। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী নিয়ে সাধারণতঃ পরিবার গঠিত হয়। ভারতীয় সমাজে আবার একান্নবর্তী ও যৌথ—এই দু'প্রকার পরিবার আছে। যৌথ পরিবারে সভ্য সংখ্যা আর একটু বেশি। ব্যাপক অর্থে পরিবার গোষ্ঠী বা বংশ হিসেবে গণ্য। এখানে সভ্য সংখ্যা সীমিত নয়। একই রক্তের ধারা বংশ পরম্পরায় বহু জনের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। ব্যক্তির উপর উভয় অর্থে পরিবার বা বংশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মাতা-পিতা, ভাই-বোনদের নিয়ে গঠিত পরিবারে শিশু প্রথম তার জীবন সুরু করে। স্নেহ,

মায়া, মমতার নিবিড় বন্ধনে শিশু তার ক্ষুদ্র পরিবারের প্রত্যেকের সাথে অন্বিত হয়। এই সম্পর্ক হ'ল সামাজিক সম্পর্কের মূলবিন্দু। এ সম্পর্কের নিবিড়তা তুলনাহীন। একটু বুদ্ধি ও চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে পারিবারিক মিলন ও সংঘাতের ঘাত-প্রতিঘাতের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক, পারিবারিক জীবনে স্বীয় কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুতঃ, এটাই হল শিশুর সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রকাশ। ক্ষুদ্র পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সে সামাজিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তার বংশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের বংশ গৌরব, সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ভাবতে শেখে। সংকীর্ণ এবং ব্যাপক উভয় অর্থে পারিবারিক জীবনের নিবিড় আর জটিল সম্পর্কে সে অন্বিত ও অভিব্যক্ত হয়। এই অন্বয়ের মুলে আছে পারস্পরিক 'আমরা ভাব' (we-feeling)। সাংসারিক নানা সংঘাতেও এই 'আমরা ভাব' খুন্ন হতে চায় না। সামাজিক জীবনে ব্যক্তির এই 'আমরা ভাব' ক্রমশঃ প্রশস্ততর হতে থাকে।

পরিবারের পরেই আসে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমাজজীবন। পারিবারিক 'আমরা ভাব' we feeling বা সম্পর্কের নিবিড়তা ও গভীরতা এখানে একটু কম। আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই—ইত্যাদি দ্বারা সম্পর্ক যতটুকু সুদৃঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে আঞ্চলিক সমাজসম্পর্কের ক্ষেত্রে 'আমার' বা 'আমাদের' শব্দের সুর অনেক নরম। পাড়ার দুলাল, আমার বা আমাদের ক্লাশের বন্ধু, আমাদের নবজাতক সমিতির সভ্য—ইত্যাদি দ্বারা একটু নরম সুরের 'আমরা' বোধটি অভিব্যক্ত হয়। পরিবারে ছিল রক্তের সম্পর্ক আর এখানে আছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, পাড়া বা অঞ্চল সম্পর্কে সৌহার্দ্য, সমস্বার্থের (same interest) বন্ধন। ব্যক্তির বিকাশে পরিবার বা বংশ প্রভাব যেমন কার্যকরী তেমনি আঞ্চলিক সমাজ বা পরিবেশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মানুষকে আঞ্চলিক সমাজে স্বীয় ভূমিকা নির্ধারণ করতে হয়।

পরিবেশ বা আঞ্চলিক সমাজের পরবর্তী স্তর জাতীয় সমাজ। জাতীয় সমাজ সমগ্র দেশ ভিত্তিক হলেও এর মাঝে জেলাভিত্তিক ও রাজ্যভিত্তিক সমাজও থাকতে পারে। দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণরত দু-জন বাঙ্গালীর পারস্পরিক

সৌহার্দ্য সহজে গড়ে উঠতে পারে. অথচ তৃতীয় পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠলেও সম্পর্ক যেন ততটা নিবিড় হয় না। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই জেলাভিত্তিক, রাজ্যভিত্তিক বা দেশভিত্তিক সমাজে সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ট পরিচয় বা বন্ধন নেই ; নেই প্রত্যক্ষ পরিচয়। তারা একই জেলার। রাজ্যের বা দেশের অধিবাসী মাত্র। তারা সকলেই স্ব-স্ব স্বার্থ চিন্তায় সচেতন। বিভিন্ন স্বার্থে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয় ও সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে তোলে সম্পর্ক। তাই আমরা দেখি শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক সমিতি, কৃষক সমিতি, ছাত্র সমিতি, ধর্মীয় মিশন প্রভৃতি বিবিধ সংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। ফলে স্বার্থভিত্তিতে গড়ে ওঠে—বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক। কিন্তু আঞ্চলিক সমাজ সম্পর্ক অপেক্ষা দেশীয় বা জাতীয় সমাজ-সম্পর্কের নিবিড়তা অনেক কম। তবুও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে আঞ্চলিক সমাজ-জীবনের সীমা অতিক্রম করে—দেশভিত্তিক সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এইখানে তাকে নিজস্ব স্বার্থের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করতে হবে। জাতীয় সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে তার ভূমিকা, অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে হয়। জাতি ও সমাজ ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করে। জাতীয় প্রভাব যত বৃদ্ধি পাবে ততই ব্যক্তির সমাজসম্পর্ক নিবিড়তর হতে সুরু হয়, জাতীয় সংহতি ততই সুনিশ্চিত হতে থাকে। একটা জাতির পক্ষে এই নিবিড় সম্পর্ক শুধু অপরিহার্য নয়, তার অস্তিত্বের সহায়ক।

মানব সমাজ আজ আর দেশাভ্যন্তরে সীমিত নয়। জাতীয় সমাজের উর্ধ্বে উঠেছে বিশ্ব-মানব সমাজ, আর তার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জ। বিবিধ জাতীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে শান্তিকামী মানুষ আজ প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে বিশ্ববোধ। বিশ্বজনীন 'আমরা'। এই বিশ্বসমাজ ক্রমশঃ শক্তি অর্জন করে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যক্তিকে এই বিশ্বমানব সমাজের সত্য হতে হবে। বিশ্বের মানব জাতির জন্য স্বীয় দায়িত্ব ; অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে মানুষকে পূর্ণতা লাভের আশায় সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সমাজ-সম্পর্কে সকল ক্ষেত্রে আসবে প্রীতি সৌহার্দ্যের সঙ্গে বৈরিতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে পরিবার, পরিবেশ, দেশ ও আন্তর্জাতিক বা বিশ্বমানব সমাজে ব্যক্তিকে তার ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে। স্তর-বৈশিষ্ট্যে সমাজ ও ব্যক্তির এই

সম্পর্ককে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অনুকূল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে শিক্ষা কর্ম হবে সার্থক। এই গুরুদায়িত্ব পালনের দায়িত্ব শিক্ষকের। আর সমাজবিদ্যা হবে সার্থক দায়িত্ব পালনের হাতিয়ার।

৩। সমাজে সমাজবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Social Studies in Sociaty):

সর্বত্রই দেশ-কালের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপিত হয়। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে, শিক্ষার বস্তুতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক লক্ষ্যকে কেউ অস্বীকার করেন না[1]। প্রায় সকল মাতাপিতাই আশা করেন, সন্তান এমন শিক্ষা লাভ করবে যেন সক্ষম ও সভ্য জীবন যাত্রার উপযোগী সাংসারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। মাতাপিতা এও আশা করেন যে সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা এরূপ কোন বৃত্তি গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। আবার অনেক আদর্শবাদী দার্শনিক উক্ত বস্তুভিত্তিক দিকটা কিছুটা অবহেলা করেন। তাঁরা শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা, কৌশল বিকাশের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ শিক্ষার্থীদের এভাবে আত্মকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী নন। তাঁরা চান শিক্ষার্থী এমন সামাজিক শিক্ষা লাভ করবে যেন কোন অসামাজিক প্রভাব তাদের স্পর্শ করতে না পারে। শিক্ষা হবে এমন যেন তা দার্শনিক, পণ্ডিত, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি সকলের সামাজিক সত্ত্বার বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়। কারণ সকলেই আধুনিক সমাজের সভ্য। সকলের অবদানে সমাজ হবে কল্যাণধর্মী। সকলের সেবা ও কল্যাণশ্রমে সমাজ হবে সংহত, সুসংগঠিত, জীবন্ত ও প্রগতিশীল। বর্তমান সমাজের শিক্ষার্থী হবে ভাবী সমাজের ধারক ও বাহক। শিক্ষার্থী যেন স্বদেশ, স্বজাতি ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে জানতে পারে। তার সকল শিক্ষা প্রচেষ্টা যেন মানসিক উদারতা, ও মানবপ্রীতি সঞ্জীবিত হয়। শিক্ষার্থীর মন যেন স্বদেশ ও জাতির সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। তাহলে আজকের শিশু-শিক্ষার্থীরা

---

1. V. R. Taneja—Teaching of Social studies—P. 12.

গণতান্ত্রিক ভারতের প্রকৃত নাগরিকরূপে আন্তর্জাতিক ভাবাপন্ন হয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হবে। তবেই এই বিশ্ব পরিণত হবে শান্তির আবাস ভূমিতে।

এখন প্রশ্ন হল, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি কি এসব সামাজিক শিক্ষা দিতে পারে না? উত্তরে বলা যায়—পারে, কিন্তু এসব বিশেষ বিশেষ বিষয় সামাজিক জ্ঞানকে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত করে উপস্থাপিত করে। কিন্তু মানবজীবন ও তার সমাজকে সামগ্রিক ও একক রূপে উপস্থাপিত করার মত কোন বিষয় নির্বাচন ও প্রবর্তন করা প্রয়োজন। ঠিক এমনি একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল সমাজবিদ্যা। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার পথে সমাজবিদ্যা প্রচলিত হয়েছে। সমাজবিদ্যাই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভারতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত করে তোলা যায়। সমাজবিদ্যা তাই আবশ্যিক পাঠ্যতালিকার (Core Subject) অন্তর্ভুক্ত। তবে আমাদের দেখা দরকার এই ভারতীয় সমাজ জীবনের বা সামাজিক পরিবেশের পটভূমিতে সমাজবিদ্যার ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ।

৪। ভারতীয় সমাজে সমাজবিদ্যার স্থান (The place of Social Studies in Indian Societies):

পরিবর্তনশীলতা জীবন্তও গতিশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য। যুগের গতিশীলতাই ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন এনেছে। একসময় ছিল যখন সামাজিক পরিবেশে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এক একটা পরিবার কৃষি, কুটিরশিল্প, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি যে-কোন কর্মে বংশ পরম্পরায় লিপ্ত থাকত। শিশুকাল থেকে মানুষ গৃহ-পরিবেশে পারিবারিক পেশার সঙ্গে পরিচিত হত। পাঠশালার লেখাপড়ার সঙ্গে পারিবারিক পেশায় অভ্যস্ত হয়ে সমাজে তারা বসবাস করত। স্বীয় পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলে সমাজে তারা স্বীকৃতি পেত। সক্ষম ও দক্ষব্যক্তি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিও অর্জন করত। কিন্তু আজ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এসেছে সামাজিক পরিবর্তন। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে আজ সামাজিক জীবনের সম্পর্ক ও সংগঠনে এসেছে নানা পরিবর্তন। স্বামী, স্ত্রী আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নিয়ে গঠিত হচ্ছে পরিবার। শিল্পবিজ্ঞান, কুটিরশিল্প ও পারিবারিক

পেশার পরিবর্তে এসেছে বৃহদায়তন শিল্প, কল-কারখানা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। মানুষের জীবিকা নির্বাহ সেই চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে চলেছে ভিন্ন পথে। আঞ্চলিক পরিবেশে সীমিত সংসার জীবন ত্যাগ করে মানুষ চলেছে দূর দূরান্তে তার অপরিচিত স্থানে। যোগ্য সন্তান আজ মাতাপিতাকে ফেলে রেখে চাকরীর তাগিদে চলে যান অনেক দূরে। বৃদ্ধ মাতাপিতা তখন চাকর ও প্রতিবেশীর কৃপাপ্রার্থী। যান্ত্রিকসভ্যতা গৃহ থেকে যেমন শ্রম ও উৎপাদন কর্মকে সরিয়ে নিয়েছে, তেমনি কর্মীকে করেছে ঘরছাড়া। ফলে যৌথ একান্নবর্তী পরিবার বিলুপ্ত হয়ে একক পরিবারের (Single Family) উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু একক পরিবারেও পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধন আজ শিথিল। নারীরা আজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভে সদাসচেষ্ট এবং পুরুষের সংগে জীবিকা নির্বাহে আজ তারা ব্যস্ত ও গৃহের বাইরে কর্মরত। এজন্য সন্তান সন্ততি অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক স্নেহ থেকে বঞ্চিত। এদের লালন পালনের ভার ভৃত্য এবং শিশু-শিক্ষার নানা সংস্থার উপর। ফলে আধুনিক সমাজজীবনে যৌথজীবনের মূল্য অনেকটা অস্বীকৃত, আত্মকেন্দ্রিতা সর্বস্তরে আজ উপস্থিত। পুরাতন সমাজ আর নেই। সে সমাজ তার সংহতি হারিয়ে মানুষকে করেছে আত্মকেন্দ্রিক। সামাজিক বন্ধন এবং পারস্পরিক দায়িত্ব হারিয়ে মানুষ যেন স্ব-স্ব জীবিকান্বেষণে ব্যস্ত। ভারতের এরূপ অবস্থায় অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে সামাজিক মনোভাব। ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সত্তার বিকাশ সাধন করতে হবে। যুগের এই সন্দিক্ষণে কে সেই দায়িত্ব নেবে ? বিদ্যালয়কেই নিতে হবে সেই দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্তা। তবেই সমাজে আসবে সংহতি। বিদ্যালয় যাতে এই দুরূহ কর্মসাধন করতে পারে তার জন্য শিক্ষার পুনর্গঠনের পথে প্রবর্তিত হয়েছে আবশ্যিক পাঠ্যরূপে সমাজবিদ্যা।

বিচিত্র এই ভারতে আরও বিচিত্র এর সমাজ-ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থায় এসেছে ভিন্নতা। শুধু তাই নয়, একই প্রকার পার্বত্য বা সমতলভূমিতে বহু রকমের সমাজ-ব্যবস্থাও দেখা যায়। অঞ্চল ও সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতার সঙ্গে আবার আহার-বিহার, আচার-আচরণ, ভাব-ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সর্বত্রই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে দেখা যায়

আদিম সমাজজীবন, মধ্যযুগীয় ভাবধারা আবার আধুনিক সুসভ্য সমাজব্যবস্থা। তরল জল ও কঠিন পাথরে ঘেরা এই বিচিত্র ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হল জাতীয় জীবনে সংহতি ও ঐক্য স্থাপন। তাই উদার জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ভারতবাসীকে।

এ শুভ প্রচেষ্টার ভার নেওয়ার একমাত্র অধিকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বয়স্ক ব্যক্তির মানসিক পরিবর্তন সাধন সহজসাধ্য নয়। সুতরাং অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে এই গণতান্ত্রিক ভারতে প্রকৃত মানবদরদী নাগরিক করে গড়ে তুলতে হলে, তাদের মনের আত্মকেন্দ্রিকতা ও সংকীর্ণতা দূর করতে হলে, তাদের সামাজিক সত্ত্বার বিকাশ সাধন প্রয়োজন। এর জন্যে চাই শিক্ষার পুনর্গঠন এবং উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় প্রবর্তন। সমাজবিদ্যাই এর যোগ্য সহায়ক। সমাজবিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। সামাজিক মানব-জীবনকে কেন্দ্র করেই বিষয়টি রচিত। তাই ভারতের সমস্যা সঙ্কুল বহুবিচিত্র ও জটিল সমাজে সমাজবিদ্যা অন্যতম আবশ্যিক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হলে বৈচিত্র্যময় ভারতে ঐক্যবোধ জাগরিত হবে।

সপ্তম অধ্যায়

*সমাজ সম্পদ

(Community Resources)

১। সমাজজীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগ-সূত্রের প্রয়োজনীয়তা (Need for two way-traffic between the Community and the School) ঃ

মানুষ তার প্রয়োজন মেটাবার জন্য গড়ে তোলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, বিধিব্যবস্থা, সুষ্ঠু পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে

---

* সম্প্রদায় (Community) হল বৃহৎ সমাজের অন্তর্গত অন্যতম সংস্থা। একই অঞ্চলে বসবাসকারী, একই জীবনযাত্রার অংশভাগী, বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহত ও ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিসমষ্টিকে Community বলা যায়। Community-এর মধ্যে নিয়ম-কানুন সহ একপ্রকার প্রভাবশালী শক্তিকেন্দ্র বিদ্যমান। Community-এর ঐক্য বন্ধনের সূত্র বহুবিধ —একটি নহে। সুতরাং Community-এর প্রতিশব্দ সম্প্রদায় হতে পারে না। বাংলা ভাষায় আমরা বলি 'বৈষ্ণব সম্প্রদায়', মুসলমান সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়—এখানে ধর্মসূত্র প্রবল। একটিমাত্র সূত্র ইংরেজী Community-কে প্রকাশ করে না। 'সম্প্রদায়' শব্দটি অতি সংকীর্ণ "Thus in India, the so called communities which gave rise to the problems of communalism are not communities in the sociologicol sense —they are rather ethnic groups within which certain social and religious interests are satisfied."—Gisbert.

"The mark of a community is that one's life "may" be lived wholly within it. One cannot live wholly within a business organization or a church; one can live wholly within a tribe or a city. The basic criterion of Community, then, is that all of one's social relationships may be found within it. The importance of the conception of Community is in large measure, that it underscores the relation between social coherence and the geographical area." MacIver & Page—Society, Page 7—9.

সুতরাং Community দ্বারা আমরা কোন একটিমাত্র সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টিকে না বুঝে বুঝব কোন এক অঞ্চলের অধিবাসীদের, যার মধ্যে ব্যক্তির সমস্ত প্রকার আশা-আকাঙ্খা, প্রয়োজন মিটতে পারে। ম্যাক্‌আইভার ও পেজ এর মতানুসারে Community এর সঙ্গে স্থানের প্রাধান্য বেশী। সুতরাং গ্রাম, সহর, নগর, এক একটা উপনিবেশ—প্রত্যেকেই সম্প্রদায় (Community)।

মানবিক প্রয়োজন মিটতে পারে।[1] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনি একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এক একটা অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য গড়ে তোলে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের গৃহ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আসবাবপত্র, পাঠাগার, ও প্রয়োজনীয় পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকাদি এসব কিছু মিলে তৈরি হয় বিদ্যালয় পরিবেশ। শিক্ষার জন্য এই পরিবেশের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষার জন্য শুধু বিদ্যালয় পরিবেশ যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয় পরিবেশের শিক্ষা একদেশদর্শী। সামাজিক মানুষ সমাজের উপযুক্ত সভ্যরূপে শিশুদের গড়ে তোলবার জন্য তৈরি করেছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কেবলমাত্র বিদ্যালয় কক্ষের শিক্ষা শিশুকে সমাজমুখী করতে পারে না, তার শারীরিক, মানসিক, সার্বিক গুণরাজির বিকাশ ঘটাতেও পারে না। এর জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের যোগসূত্র রচনা। শিক্ষার্থীর স্বীয় আঞ্চলিক পরিবেশ হল তার সত্যিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের সীমিত কক্ষ শুধু সমাজবিদ্যা নয়, যে-কোন বিষয় শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর নিকট বদ্ধ কারাগার। একে উন্মুক্ত করে শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসতে হবে সম্প্রদায়ের (Community) উন্মুক্ত প্রান্তরে। প্রকৃতি পরিবেশ হবে শিশুর প্রথম পাঠ্যসূচী। এখানকার শিক্ষা হবে গতানুগতিক ধারা থেকে মুক্ত অথচ উদ্দেশ্যমূলক।

দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের (Community) নিজস্ব ইতিহাস থাকে। সে ইতিহাস লিখিত অথবা অলিখিত যে-কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, এর মধ্যে আছে আমাদের জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থা শুধু সম্প্রদায় (Community) বা সমাজকে* পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে না। জাতীয় জীবনের মূলসূত্রের সঙ্গে এই ব্যবস্থা বিভিন্ন কার্য-কারণ সূত্রে জড়িত। সম্প্রদায় বা সমাজের মূলসূত্র (Principles of Community)

* এই অধ্যায়ের Community resources বলতে অথবা বুঝব, বিদ্যালয় যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের জ্ঞান সম্ভার। সমাজকে আমরা অনেক সময় সংকীর্ণ অর্থেও ব্যবহার করি, তাই 'সম্প্রদায়' শব্দের পরিবর্তে 'সমাজ' ব্যবহার করলে সমস্যা সঙ্কুল সংকীর্ণতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিদ্যালয় গৃহের বাইরে পড়ে আছে আঞ্চলিক জন সমাজ। এই 'সমাজ' শব্দে সম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ভাব নাই।

1. "The Social structure and machinery through which human society organises, directs and executes the multifarious activities required to satisfy human needs." Social Institution. P. 29—H. E. Barnes.

ও সমস্যাবলী পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্য-কারণের মাধ্যমে সর্বদা সক্রিয়ভাবে জাতিগঠনে নিয়োজিত। শিক্ষার মূলসূত্র হল—নিজেকে, স্বীয়পরিবেশকে, সমগ্রজাতিকে এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বিশ্ব সমাজকে জানা। সমাজ বিদ্যার শিক্ষার্থীর নিকট এই জানার সূত্র শিক্ষালাভের অপরিহার্য অঙ্গ।

আমাদের নিজস্ব পরিবেশ বা সমাজ (Community) বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আমরাই যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারি, এই সমাজের সমস্যাবলী কতখানি বাস্তব, কত জটিল, কত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবেশই আমাদের দিতে পারে তার কৃষ্টি, সভ্যতা, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি পৌরসমস্যা ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান।

নিজস্ব সামাজিক পরিবেশ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ অতি সহজ এবং এই তথ্যের বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই এগুলিকে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করতে পারে। এই কারণে শিক্ষার্থীর উচিত তার নিজস্ব সম্প্রদায় বা সমাজের জনগণের বিবরণ সংগ্রহ, তাদের সঙ্গে পরিচয়, মেলামেশা, সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা। শুধু তাই নয়, সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকর্মে সাহায্যার্থে। শিক্ষার্থী যাবে সমাজের কাছে আর সমাজ আসবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে—এভাবে যদি একই রাস্তায় পারস্পরিক গতাগতি সম্ভব হয় তবেই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম হবে জীবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত।[1]

মানুষকে ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষ—এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ব্যক্তি মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সমাজের পরিবেশে। আবার ব্যক্তি মানুষের বিকাশের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির বিকাশকে সর্বাঙ্গীণ করতে পারে না। সেখানে নিভৃতে যতই জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি পাঠের ব্যবস্থা হোক্ না কেন, শিক্ষা জীবন্ত হবে তখনই যখন ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশে বাস্তবতার সহিত তার অর্জিত জ্ঞানকে সামঞ্জস্য করতে পারবে। বিদ্যালয়ের নিজের সে ক্ষমতা থাকতে পারে না যদি বিদ্যালয়

---

1. "The School cannot be an island in the midst of the community It should be a 'watch-tower' not an 'ivory tower' institution. A two way traffic between the school and the community is necessory."

—H. S. S. Lowrence.

সামাজিক পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে পৃথক করে রাখে। তাই বিদ্যালয়কেই সামাজিক পরিবেশ মণ্ডিত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিদ্যালয় নিজেই সমাজকে শিক্ষার্থীর বাস্তবতা শিক্ষার পরীক্ষাগার রূপে গ্রহণ করবে, সেখানেই সে আবিষ্কার করবে নতুন সম্পদ, হৃদয়ঙ্গম করবে তার সংস্কৃতিকে, অনুধাবন করবে তার সমস্যাবলীকে আর নিজেকে ব্যাপৃত করবে সেই সমস্যা সমাধানে। পরিবেশ শিক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত করে দেবে তার প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিস্থিতিকে। প্রাকৃতিক দিক থেকে শিক্ষার্থী জানবে পরিবেশের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, খনিজসম্পদ ও বিভিন্ন উৎপাদন ইত্যাদি। মানবিক দিক থেকে সমাজ শিক্ষার্থীকে জানাবে জনগণের শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক অবস্থাদি। এসব সমস্যাদি জানার জন্যে সমাজ সম্বল হবে প্রধানতম পাঠ্যবিষয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের সীমিত গণ্ডী সামাজিক জীবন ও ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হোক্, সমাজ ও পরিবেশ হোক্ শিক্ষার শ্রেণীকক্ষ—ইহাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্দের একান্ত কামনা।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সর্বাধুনিক বক্তব্য হল, 'এস, আমরা সমাজকে দেখি (study), সমাজকে ব্যবহার করি, সমাজকে সেবা করি এবং সমাজকে শিক্ষার কাজে নিয়োগ করি।' ভারতেও এই কথা আজ সর্ববাদীসম্মত। আজ শিক্ষা সংস্কারের মূলসূত্র হল, বিদ্যালয়ের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র নির্ধারণ এবং তথাকথিত প্রচলিত শিক্ষার ফলে যে সমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সেই সমাজের সঙ্গে পুনরায় গভীরতম সম্পর্ক স্থাপন করা। এর ফলে বিদ্যালয় হয়ে উঠবে সমাজজীবনের কেন্দ্রভূমি। সমাজের সঙ্গে শিক্ষামন্দিরের যোগসূত্র পরিপূর্ণতা লাভ করুক। সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে, বিদ্যালয় যেন সমাজের সঙ্গে একটা সম্পর্কহীন দ্বীপ বিশেষ হয়ে গড়ে না ওঠে।

২। প্রয়োজনীয় সমাজ সম্পদ (**Important Community Resources**):

সামাজিক ভিন্নতার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের সামাজিক সম্পদ পরিলক্ষিত হয়। একজন গ্রাম্য শিক্ষকের পরিবেশের সঙ্গে সহরের শিক্ষকের পরিবেশের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজপাঠ অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষালাভের মাধ্যমে এই পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সামাজিক পরিবেশে গড়ে ওঠে কারখানা, গুদাম, দোকানপাট, অফিস আদালত ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পরিচালনায় নিজেরাই এসব দেখতে পারে, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্র থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষকের নির্দেশ যেন প্রাধান্য লাভ করে। শিক্ষককেই সমাজের বিভিন্ন সম্পদ বা তথ্য সম্পর্কে সব জানতে হবে। সমাজের পরিবেশে কোথায় কি বিষয় শিক্ষণীয় আছে সে-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষককেই একখানা তালিকা প্রস্তুত করা এবং তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা পরিচালকের সুনির্দেশের অভাবে ভুল পথে চালিত হবে এবং সমাজবিদ্যার প্রথম গ্রন্থ স্বরূপ যে সমাজ সেই সমাজের পাঠে অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণে তারা অকৃতকার্য ও ব্যর্থ মনোরথ হবে।

সামাজিক পরিবেশে সাধারণতঃ যে সব জ্ঞানরূপ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত ও তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে :

(ক) ভৌগোলিক জ্ঞান : পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, বনজঙ্গল, জলপ্রপাত, সামুদ্রিক ও বায়ুবন্দর, নদীউপত্যকা পরিকল্পনা, খনি, কৃষি-শিল্প অঞ্চল ইত্যাদি।

(খ) ঐতিহাসিক জ্ঞান : দুর্গ, প্রাচীন স্তম্ভ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, পুঁথিপত্র, খোদাই, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি।

(গ) সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান : থিয়েটার, শিল্প-গ্যালারী, যাদুঘর, সিনেমা, চিড়িয়াখানা, বেতার কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়, ফিল্মষ্টুডিও, স্কুল-কলেজ, বালকভবন, পুতুলবাড়ী, কলাভবন, বয়েজস্কাউট, গার্লগাইডস্, সংবাদপত্র অফিস ইত্যাদি।

(ঘ) অর্থ প্রাসঙ্গিক জ্ঞান : বাজার, বাণিজ্যকেন্দ্র, ইটনির্মাণকেন্দ্র, দুগ্ধকেন্দ্র, ব্যাঙ্ক, মিল, কলকারখানা, রেলওয়ে জংসন, টেলিগ্রাম অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কৃষিগোলা, ছাপাখানা ইত্যাদি।

(ঙ) বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পদ : যেমন, বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগার, তাপ-জলবিদ্যুৎকেন্দ্র, বেতার যন্ত্রাদিরকেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেতারবার্তাকেন্দ্র ইত্যাদি।

(চ) সরকারী অফিসাদি : পৌরসমিতি জেলাবোর্ড, হাসপাতাল, আইন-আদালত, পুলিস কেন্দ্র, অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র, সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল ভবন, বিধানসভা, সামরিক এলকা ইত্যাদি।

(ছ) সামাজিক রীতি নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান : সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি, আহার ও পরিধান সম্পর্কিত প্রথা, ধর্মনীতি, সামাজিক ধ্যানধারণা ইত্যাদি।

৩। সামাজিক জ্ঞান-সম্পদকে শিক্ষাকর্মে প্রয়োগের পদ্ধতি (Method of Utilizing Community Resources) :

শিক্ষক দুটি উপায়ে সমাজ সম্পর্কীত জ্ঞান সম্পদকে শিক্ষাকর্মে নিয়োগ করতে পারেন। যথা, (১) বিদ্যালয়কে সামাজ বিষয়ক বস্তুর বাস্তব সান্নিধ্যে নিয়ে আসা। (২) দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তিনি শ্রেণীকক্ষে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষাকর্মে অগ্রসর হতে পারেন।

(১) সামাজিক বাস্তব পরিবেশে বিদ্যালয় পরিবেশ সৃষ্টি (Taking the School to the Community) : শিক্ষার্থীর মন লিখিত শব্দ অপেক্ষা বাস্তব দৃশ্য এবং ব্যবহারিক বিষয়ে বেশী আকর্ষিত হয়। বাস্তব পরিবেশে যখন শিক্ষার্থী কোন দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন সেই বিবরণ তার কাছে স্থায়ী ও অবিস্মরণীয় হয়ে পড়ে। শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করি।

(i) **ক্ষেত্র পরিদর্শন (Field Trips) :** সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের কর্মসূচী বা কার্য্যক্রম পরিবেশ-ভ্রমণ ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। পরিবেশ-ভ্রমণ শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্য বিষয়াদির চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে না, পক্ষান্তরে এর মাধ্যমে তারা পরিকল্পিত উপায়ে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন, সংগঠন ও পরিচালন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শ্রেণী কক্ষের বাইরে প্রধানতঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সাংগঠনিক ভ্রমণ ও সাক্ষাৎ পরিচিতিকে পরিবেশ ভ্রমণ বলা যায়। বিদ্যালয় গৃহের বাইরে যে কোন স্থানে এরূপ পরিবেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর ফলে সংবাদ সংগ্রহ, মানসিক পরিবর্তন, প্রেরণা-সঞ্চার, অনুধাবন ক্ষমতার সম্প্রসারণ, মানসিক উন্নয়ন সাধিত হবে। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় প্রভৃতি যে-কোন শিক্ষাকর্মের জন্য এরূপ পরিবেশ বা ক্ষেত্র ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়। পাঠ্য তালিকার কোন এককে সূত্র ধরে ঐ এককের বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার

তাগিতে এরূপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা চলে। ক্ষেত্র বা পরিবেশ পরিক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার পুঁথিগত বিদ্যাকে বাস্তব পরিবেশে যাচাই ও বাছাই করে নিজস্ব করে নিতে পারে। বাস্তব পরিবেশে জ্ঞান অর্জ্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্বীয় গুণ, ক্ষমতা দক্ষতা প্রভৃতির বিকাশ দ্রুত সম্পন্ন হয়।

এরূপ পরিবেশ পরিক্রমণ কয়েকমিনিট, কয়েকঘণ্টা, সারাদিন অথবা একাধিক দিনের জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এক বা একাধিক দিনের জন্য পরিকল্পিত পরিক্রমাকে শিক্ষা ভ্রমণ (Study tour) নামেও অভিহিত করা যায়। সমাজবিদ্যা-শিক্ষাদান ব্যাপারে এই পরিবেশ পরিক্রমা বিভিন্ন দিক থেকে যথেষ্ট উপযোগী :

প্রথমতঃ, এরূপ পরিক্রমা শিক্ষার্থীদের অনুধাবন শক্তিকে সক্রিয় করে চিন্তা ও শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে কি ভাবে কাঁচ তৈরী হয়, কিভাবে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রাদি বয়ন করা হয়—সব কিছু তারা স্বচক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিক্ষালাভ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীকক্ষে যে-সব বিষয় শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করে, যে-সব পুঁথিগত বিষয়ে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হয়, সেই-সব বিষয় তারা বাস্তব পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে। পুস্তকে লিখিত বিষয়াদি বাস্তব পরিবেশে হয়ত একটু ভিন্নরূপে প্রতিভাত হতে পারে, কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষালাভ করে সেই শিক্ষাই হবে বাস্তব ও জীবন্ত।

তৃতীয়তঃ, পাঠ্য পুস্তকে লিখিত থাকে না এমন বহু বিষয় আছে যে-গুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ এই শিক্ষার্থীরাই সমাজের বাস্তব পরিবেশে জীবন যুদ্ধের সৈনিক হবে। অঞ্চল পরিক্রমার দ্বারা শিক্ষার্থীরা অপরিচিত অঞ্চলে অথবা পরিচিত অঞ্চলের অজানা পরিস্থিতিতে বহুজনের সঙ্গে মেলামেশা করার যথেষ্ট সুযোগ পায়। ফলে তারা সামাজিক সভ্যতা শিক্ষা করে মার্জিত রুচি সম্পন্ন নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে। আবার সমাজের বিবিধ রীতি-নীতি, জীবনযাত্রার পদ্ধতি প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখলে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংকীর্ণতা বহুলাংশে দূরীভূত হয়।

অঞ্চল পরিক্রমার দ্বারা এরূপ বহুবিধ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সাধিত হয় সত্য, কিন্তু সর্বদা খেয়াল রাখা উচিত, প্রতিটি পরিকল্পনা যেন গণতান্ত্রিক প্রথায় সুষ্ঠু ভাবে

সংগঠিত এবং যত্ন সহকারে সম্পাদনার ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও শ্রেণীকক্ষের শাসন-মুক্ত হয়ে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা যখন অঞ্চল পরিক্রমায় বেড়িয়ে পড়বে, তখন যদি সঠিকভাবে তারা পরিচালিত না হয় তাহলে যতখানি শিক্ষালাভের সম্ভাবনা থাকে, তার বহু গুণ হয়ে পড়বে কু-শিক্ষা। সুতরাং প্রস্তুতি থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে শিক্ষককে যথেষ্ট দৃঢ়চিত্ত এবং পরিচালনে সক্ষম হওয়া প্রয়োজন। তাই শিক্ষাকর্ম মূলক অঞ্চল পরিক্রমা সর্বদা শ্রেণীকক্ষের পুঁথিগত শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে শৃঙ্খলিত উপায়ে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। শুধু নতুন স্থানে ভ্রমন ও নতুন বিষয় দেখাই যেন পরিক্রমার উদ্দেশ্য না হয়ে তা যেন শ্রেণীপাঠের বিষয় বস্তুর পরিপূরক রূপে গৃহীত হতে পারে—এদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অঞ্চল পরিক্রমাকে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার পরিপূরকরূপে গ্রহণ কবার জন্য পর্যটন অন্তে-শিক্ষার্থীরা যদি তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রচনা লেখা, সংগৃহীত চিত্রাদি পুস্তকে সন্নিবেশিত করা, পরিভ্রমণ স্থানের সম্মানিত ব্যক্তিদের নিকট ধন্যবাদ দিয়া পত্রালাপ করা, শ্রেণীকক্ষে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা অথবা আলোচনা করা, স্ব-স্ব অভিজ্ঞতাকে নিজস্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হয়, তবেই তারা প্রকৃত শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে পারে। এই ভাবে যদি আমাদের শিক্ষার্থীরা অঞ্চল পরিক্রমার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, তাহলে তারা সত্যিই ভবিষ্যতে ভারতের সুনাগরিক রূপে গড়ে উঠতে পারবে।

(ii) **সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ বা পরীক্ষণ (Community Survey) :** মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিকট সকল সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ চমৎকার শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা প্রদান করে। সামাজিক অথবা প্রাকৃতিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এটি একটি সাংগাঠনিক এবং নিয়মানুবর্তিক উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়।

সামাজিক কাঠামো, তার দৈনন্দিন কর্ম পদ্ধতি এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমস্যাগুলিকে বিস্তৃত অথচ সম্পূর্ণরূপে জানবার উপায় হল এই সামজিক নিরীক্ষণ। এই সার্ভের দ্বারা শিক্ষার্থীদের অন্তর্দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়; ফলে তারা সামাজিক সমস্যাবলীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বরূপকে সহজে চিনতে পারে। সামাজিক সমস্যাবলী শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সান্নিধ্যে আসায় তারা

জীবন-সংগ্রামের সাহসী সৈনিক হওয়ার দক্ষতা অর্জন করে। সামাজিক বিভিন্ন তথ্য-সংগ্রহের সময় শিক্ষার্থীরা দেখতে পায়, সমাজ তার অধিবাসীদের নিয়ে একটা জীবন্ত ধারায় প্রবাহিত। সেই জীবন ধারায় মানুষ পরস্পরের সহিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ যে, সেখানে একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের কথা চিন্তা করা যায় না।

এরূপ নিরীক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীরা কোনও বিশেষ একটি সমাজের আঞ্চলিক ইতিহাস, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, গাথা, কথকতা প্রভৃতি বুঝতে পারে। তেমনি তারা বুঝতে পারে, কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বা অঞ্চলের গৃহ-সমস্যা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, বেকারত্ব, যাতায়াত এবং সমাজ-জীবনের এরূপ বহুবিধ সমস্যা। এর প্রতিটি বিষয় উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একান্ত শিক্ষণীয়।

সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ যদি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় তবে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে তা অসীম সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে। এর সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের পরিচালন দক্ষতার উপর। শিক্ষক তথ্য-নিরীক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে সামাজিক পটভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই এমনভাবে শ্রেণীকক্ষে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করবেন যাতে পরিপূর্ণ নিরীক্ষণ কাজ সমাধার জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষেত্র নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকের সহযোগিতায় ছাত্ররাই নিরীক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হবে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষক মহাশয় নিজেই জানবেন কিভাবে কোন্ পথে কাজ আরম্ভ করলে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সফল হবে। এর জন্য অবশ্য শিক্ষককে যথেষ্ট পড়াশুনা করে নিরীক্ষণের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে। চতুর্থতঃ, শিক্ষক মহাশয় পূর্বেই হয়ত সেই অঞ্চলে নিরীক্ষণের জন্য ছাত্রদের পরিচালনা করেছেন, কিন্তু তাঁকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন তিনি নতুন করে ছাত্রদের সঙ্গে নিরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করছেন। সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ-কাজ ছাত্র-শিক্ষকের সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন হবে। প্রয়োজন হলে সমাজবিদ্যার শিক্ষক বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করবেন। এছাড়া প্রয়োজন হলে সমাজের প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সরকারী অফিসের কর্মচারী, সমাজ সেবক প্রভৃতি সকলের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

অবশেষে তথ্য নিরীক্ষণের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীরা সংগৃহীত সামাজিক জ্ঞান সম্পদগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে বিষয়গুলিকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করবে, যেন ক্রমবিন্যস্ত উপায়ে তথ্যগুলিকে পরিবেশন করা সম্ভব হয়। এইভাবে সংগৃহীত তথ্য, অঞ্চলের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম-সম্পর্কীয় প্রভৃতি বিষয়গুলির সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতা যদি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে, তাহলে একদিকে যেমন তাদের স্ব-স্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি হবে, অন্যদিকে তেমনি তারা এমন দক্ষতা অর্জন করবে যে ভবিষ্যতে কি সমাজ জীবনে, কি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে, সর্বত্রই তারা সফলকাম হওয়ার উপযুক্ত উপায়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে।

(iii) **বিদ্যালয় শিবির (School-camping)ঃ** বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের সীমা থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিবির স্থাপন করা প্রয়োজন। এই শিবির হবে প্রকৃতির বিস্তৃত কোলে একটি শ্রেণীকক্ষ স্বরূপ। শিবিরের চতুস্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধূলার সঙ্গে চলবে পাঠপরিচালনা। শহরের কাঠ-পাথরের আবেষ্টনী আর যানবাহনসহ জনসমুদ্রের কলকোলাহল থেকে মুক্তি পেয়ে শিক্ষার্থীরা পাবে অনাবিল আনন্দ। মুক্ত আকাশ-বাতাস যেন সেখানে প্রাণের আহ্বান জানাবে। আর গ্রামের শিক্ষার্থীরা সেখানে শ্রেণীপঠনের একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাবে। একই বটবৃক্ষ, একই চালাঘর, একই কর্দমাক্ত পথ আর সেই একই সামাজিক কাজকর্ম গ্রামের শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর দেখতে পায়। এদের জন্য চাই একটু আধুনিক শহুরে অথবা পৃথক পরিবেশ। নতুন পরিবেশ শুধু আনন্দ দেয় না, পাঠচর্চায় নতুন উদ্যম ও উৎসাহ এনে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয় শিবির শিক্ষার্থীকে সরাসরি (direct) অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেয়। বিদ্যালয়-কক্ষে যে কথা তারা শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ে আগত অথবা আমন্ত্রিত সমাজকর্মীদের নিকট শুনেছে অথবা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছে, সেই বিষয়গুলি প্রকৃতি রাজ্যের বাস্তব পরিবেশে দেখে, শুনে, পরীক্ষা করে শিখতে পারে।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়-শিবির প্রকৃতির বুকে, বনাভ্যন্তরে ছোট্ট সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী হল এই সমাজের নাগরিক। এখানে দৈনন্দিন কাজকর্মে তাদের কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ ও রন্ধন, আবর্জনা দূরীকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার, স্বাস্থ্যচর্চা ও গৃহ পরিবেশ

জনিত বিবিধ কর্মসূচী শিবিরবাসীদের দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল কাজের মাধ্যমে শিবিরবাসীরা সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে উদার, পরমতসহিষ্ণু, কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। শিবিরের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে আচার-আচরণ, কৌশল-দক্ষতা ও বিবিধ গুণের বিকাশ ঘটে, শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন সেই সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখে। সুতরাং বিদ্যালয়-শিবিরের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

শিবির স্থাপনের পরিকল্পনা মাঝে মাঝে গৃহীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দু-একদিনের জন্য অথবা সপ্তাহ বা কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী শিবির স্থাপন করা যায়। শিক্ষার্থীদের বয়সের উপর শিবিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের অর্থাৎ উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সপ্তাহ বা তার অধিক সময় শিবিরে থাকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা ও সেখানকার কর্মসূচী নির্ধারণের উপর বিদ্যালয় শিবিরের উপযোগিতা নির্ভর করে। উপযুক্ত শিক্ষক, যথোপযুক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা সহ যদি শিবির স্থাপন করা যায়, তাহলে তা হবে প্রকৃতই বিদ্যালয় শিবির (School Camping); অন্যথা তা হবে ব্যর্থতারই নামান্তর।

(iv) **সমাজসেবা পরিকল্পনা (Community Service Projects) :** বিদ্যালয় কর্তৃক সমাজসেবা প্রকল্প গ্রহণ অন্যতম শিক্ষা প্রচেষ্টা। পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষার্থীদিগকে সমাজ-উন্নয়নে নিয়োগের জন্য রাজ্য শিক্ষাদপ্তর এবং শিক্ষাবিদরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সমাজীকরণের মাধ্যমে এরূপ প্রচেষ্টা সর্বজন কাম্য। এই শিক্ষার্থীরাই ভাবী সমাজের ধারক ও বাহক হবে। তাই সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় না থাকলে প্রচলিত শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা হবে সম্পর্কহীন। শিক্ষা শেষে যখন এই শিক্ষার্থীরা বাস্তবতার সম্মুখীন হবে তখন তারা হয়ে পড়বে বিব্রত ও হতবুদ্ধি সম্পন্ন। তাই শ্রেণী-শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সমাজীকরণের প্রচেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যায় :

(ক) শহরের শিক্ষার্থীদের জন্য আঞ্চলিক পরিচ্ছন্নতা, দুঃস্থ ও পীড়িতের সেবা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি।

(খ) গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃক্ষরোপণ, পথঘাট তৈরী, সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তাঘাট ও পুষ্করিণী সংস্কার, মন্দির, মসজিদ, উদ্যান প্রভৃতি সাফাইকরণ ; আর্তের সেবা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি।

(গ) নগর, শহর ও গ্রাম সর্বত্র শিক্ষার্থীরা দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও দৈব-দুর্ঘটনায় সেবার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে আত্মনিয়োগ করতে পারে। শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীরা যাতে একত্রে কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, গান্ধী জয়ন্তী, শিশু দিবস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিনে গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মিলিত কর্মসূচী পালন করা কর্তব্য।

সমাজসেবা পরিকল্পনায় শিক্ষোপযোগিতা (Utility of Community Service Project) :

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূ-কম্পন প্রভৃতি কারণে অথবা উৎসব পালনের নিমিত্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী যখন পরিকল্পিত উপায়ে কর্মসূচী পালন করেন তখন শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে লব্ধজ্ঞানের সঙ্গে পায় বাস্তব পরিবেশ। আঞ্চলিক মেলা ও উৎসবের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র্য মোচন, সেবার্থে চাঁদা আদায়ের কর্মী হিসেবে শিক্ষার্থী যখন শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, তখন তাদের মনে জেগে ওঠে সমাজ-সম্পর্কিত ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং সেবাপরায়ণতা।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হয় মধুর ও সৌহার্দপূর্ণ। এই সম্পর্ক শিক্ষাকর্মে অগ্রগতির প্রধান সহায়ক।

তৃতীয়তঃ, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থী চায় সমবায় কর্মসূচীতে যে-কোন উপায়ে অংশ গ্রহণ করতে। অংশ গ্রহণ প্রবণতা-শিশু-মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। বিদ্যালয়ে যেন শিশু-মনের এই প্রবণতার বাস্তব রূপায়ণ ঘটে, অন্যথায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূলতত্ত্ব হবে অবহেলিত ও শিক্ষা হবে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

সমাজসেবা পরিকল্পনা গ্রহণের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রতিটি পরিকল্পনা হবে সহজ, সরল, বিপদ মুক্ত—যাতে শিক্ষার্থীরা জটিল সমস্যা দ্বারা বিব্রত না হয়। গৃহীত প্রকল্প হবে শিক্ষামূলক, গণতান্ত্রিকও সার্বজনীন। সমাজ-সেবা ও সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজের প্রকল্প রূপায়ণের পর প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়ণ ব্যতীত শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ হতে পারে না।

(২) বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি (**Bringing the Commuity to the School**) : বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত :

(i) **সমাজকর্মীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ (Invitation to social workers to visit school.)**

বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

(ii) **শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন (Parent-teacher association)**

আমাদের দেশের শিক্ষা যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। সমাজের বাস্তব রূপের সঙ্গে শিক্ষালয়ের যোগসূত্র রচিত না হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। এই যোগসূত্র রচনার অন্যতম উপায় হল শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন।

আমাদের দেশে আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। শিক্ষার্থীরা গৃহ-পরিবেশ থেকে দৈনিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে এবং আট ঘণ্টার জন্য তাদের সহিত বিদ্যালয়ের সম্পর্ক থাকে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অবস্থার সঙ্গে শিক্ষকরা পরিচিত হতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষন কাজও পরিচালিত হয় না। এই ত্রুটি দূর করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন। সম্মেলনে অভিভাবকরা স্ব-স্ব সন্তান সম্পর্কিত সমস্যার কথা শিক্ষককে জানাতে পারেন। এই ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় শিক্ষাদান পরিচালিত হলে সেই শিক্ষাই যতদূর সম্ভব শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবক দিবসে শিশু দেখবে শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের মাতা-পিতার নিবিড় সম্পর্ক। পরিবারের গুরুজনদের মত শিক্ষকও অন্যতম গুরু। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে উঠবে সামাজিক ও পারিবারিক সৌহার্দ্য।

তৃতীয়তঃ, এই সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুসারে অভিভাবকরা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের নিকট বর্ণনা করতে পারেন। ফলে অধীত শিক্ষা হবে বাস্তব ও সজীব। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা যে-সব তথ্য ও সংবাদ শুনে থাকে; অভিভাবক-এর কাছ থেকে পুনরায় সেই তথ্য পরিবেশিত হলে শিক্ষার্থীর উদ্যম ও আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে।

(গ) নগর, শহর ও গ্রাম সর্বত্র শিক্ষার্থীরা দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও দৈব-দুর্ঘটনায় সেবার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে আত্মনিয়োগ করতে পারে। শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীরা যাতে একত্রে কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, গান্ধী জয়ন্তী, শিশু দিবস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিনে গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মিলিত কর্মসূচী পালন করা কর্তব্য।

সমাজসেবা পরিকল্পনায় শিক্ষোপযোগিতা (Utility of Community Service Project) :

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূ-কম্পন প্রভৃতি কারণে অথবা উৎসব পালনের নিমিত্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী যখন পরিকল্পিত উপায়ে কর্মসূচী পালন করেন তখন শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে লব্ধজ্ঞানের সঙ্গে পায় বাস্তব পরিবেশ। আঞ্চলিক মেলা ও উৎসবের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র্য মোচন, সেবার্থে চাঁদা আদায়ের কর্মী হিসেবে শিক্ষার্থী যখন শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, তখন তাদের মনে জেগে ওঠে সমাজ-সম্পর্কিত ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং সেবাপরায়ণতা।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হয় মধুর ও সৌহার্দপূর্ণ। এই সম্পর্ক শিক্ষাকর্মে অগ্রগতির প্রধান সহায়ক।

তৃতীয়তঃ, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থী চায় সমবায় কর্মসূচীতে যে-কোন উপায়ে অংশ গ্রহণ করতে। অংশ গ্রহণ প্রবণতা-শিশু-মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। বিদ্যালয়ে যেন শিশু-মনের এই প্রবণতার বাস্তব রূপায়ণ ঘটে, অন্যথায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূলতত্ত্ব হবে অবহেলিত ও শিক্ষা হবে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

সমাজসেবা পরিকল্পনা গ্রহণের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রতিটি পরিকল্পনা হবে সহজ, সরল, বিপদ মুক্ত—যাতে শিক্ষার্থীরা জটিল সমস্যা দ্বারা বিব্রত না হয়। গৃহীত প্রকল্প হবে শিক্ষামূলক, গণতান্ত্রিকও সার্বজনীন। সমাজ-সেবা ও সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজের প্রকল্প রূপায়ণের পর প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়ণ ব্যতীত শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ হতে পারে না।

(২) **বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি (Bringing the Commuity to the School) :** বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত :

(i) **সমাজকর্মীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ (Invitation to social workers to visit school.)**

বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

(ii) **শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন (Parent-teacher association)**

আমাদের দেশের শিক্ষা যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। সমাজের বাস্তব রূপের সঙ্গে শিক্ষালয়ের যোগসূত্র রচিত না হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। এই যোগসূত্র রচনার অন্যতম উপায় হল শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন।

আমাদের দেশে আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। শিক্ষার্থীরা গৃহ-পরিবেশ থেকে দৈনিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে এবং আট ঘণ্টার জন্য তাদের সহিত বিদ্যালয়ের সম্পর্ক থাকে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অবস্থার সঙ্গে শিক্ষকরা পরিচিত হতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষন কাজও পরিচালিত হয় না। এই ক্রটি দূর করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন। সম্মেলনে অভিভাবকরা স্ব-স্ব সন্তান সম্পর্কিত সমস্যার কথা শিক্ষককে জানাতে পারেন। এই ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় শিক্ষাদান পরিচালিত হলে সেই শিক্ষাই যতদূর সম্ভব শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবক দিবসে শিশু দেখবে শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের মাতা-পিতার নিবিড় সম্পর্ক। পরিবারের গুরুজনদের মত শিক্ষকও অন্যতম গুরু। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে উঠবে সামাজিক ও পারিবারিক সৌহার্দ্য।

তৃতীয়তঃ, এই সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুসারে অভিভাবকরা স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের নিকট বর্ণনা করতে পারেন। ফলে অধীত শিক্ষা হবে বাস্তব ও সজীব। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা যে-সব তথ্য ও সংবাদ শুনে থাকে; অভিভাবক-এর কাছ থেকে পুনরায় সেই তথ্য পরিবেশিত হলে শিক্ষার্থীর উদ্যম ও আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে।

চতুর্থতঃ, বিদ্যালয় কক্ষে অভিভাবক সম্মেলনে এক সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। সেখানে শিক্ষার্থীরা অভিভাবকদের মুখে শুনতে পারে রাজনৈতিক, ধর্মীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, পৌর প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কথা। শিক্ষার্থী বুঝবে বিদ্যালয় ও সমাজ অভিন্ন এবং অধীত বিষয় সমাজের বাস্তব পরিবেশ থেকে গৃহীত। এর ফলে সামাজিক মানুষ রূপে গড়ে উঠবার প্রবণতা জাগবে শিক্ষার্থীর মনে। তখন এই শিক্ষা সত্যই সামাজিক শিক্ষার মর্যাদা লাভ করবে।

(iii) **মেলা, উৎসব জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি (Fair, function and celebration of national day) :**

বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

(iv) **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচনা। (National and International Discussions :)** সমাজবিদ্যার কক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য শিক্ষক-পরিকল্পিত পন্থায় শিক্ষার্থীরা সভার আয়োজন করতে পারে। এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে; আবার আন্তর্জাতিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে নতুন উদ্যম ও উৎসাহে স্ব-স্ব কর্মে অগ্রসর হতে পারে।

উল্লিখিত উপায়গুলি ছাড়াও আঞ্চলিক প্রয়োজন হিসেবে শিক্ষক স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে যেমন সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন তেমনি আঞ্চলিক পরিবেশে শিক্ষাকর্ম পরিচালিত করতে পারেন। সমাজবিদ্যায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের উপর শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষোপকরণ

(Teaching aids and appliances)

১। ভূমিকা (Introduction) ঃ

বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে পুস্তক পাঠ ও শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই ছিল শিক্ষা লাভ ও শিক্ষাদানের একমাত্র উপায়। তখন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক পাঠ্য পুস্তক পড়ে ব্যাখ্যা করতেন অথবা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বক্তৃতা দিতেন। শিক্ষার্থীরাও নির্ধারিত বই পড়ত আর বক্তৃতা শুনে শিক্ষালাভ করত। আধুনিক কালে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিক্ষাদানের বহু বিচিত্র কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শুধু শুষ্ক কথার দ্বারা আর শিক্ষাদান সম্ভব হয়ে উঠছে না। আজকাল শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানকে ক্রিয়াশীল ও জীবন্ত করার জন্য দিকে দিকে চলেছে বহুবিধ প্রচেষ্টা ও গবেষণা। তাই এখন শুনে শেখা আর দেখে শেখার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলছে। এ চেষ্টার শুভ ফলশ্রুতির স্থচনা করে। কারণ, প্রকৃত পক্ষে বইয়ের কিছু আমরা শিখতে পারি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের মাধ্যমে। এই শিক্ষা পাঁচ ধরনের উদ্দীপক (Stimulas) যেমন—দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ সৃষ্টি করে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ উদ্দীপনা অনুভূতিতে রূপান্তরিত হলে সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা। এরূপ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক (Sense perception) শিক্ষাই স্থায়ী ও জীবন্ত শিক্ষা। শিক্ষাদানের ভাবধারা আজ এই পথে অনেকখানি অগ্রসর। তাই শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস (*Comenius*) বলেন, "সকল প্রকার শিক্ষার ভিত্তি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পূর্ণ উন্মেষ যাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদি অনায়াসে অনুধাবন করা যায়।" [1]

শিক্ষাদানের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত সহায়ক উপকরণ হিসেবে যে-সব কৌশল এবং বস্তু ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে শিক্ষোপকরণ বা প্রদীপণ রূপে

1. "The foundation of all learning, consists in representing clearly to the senses, sensible objects so that they can be appreciated easily".

অভিহিত করা যায়। এই শিক্ষোপকরণ বা প্রদীপণ যে-কোন রকমের সামগ্রী, উপায় বা কৌশল ও বিষয় হতে পারে। শিক্ষক এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, কৌশল, বোধশক্তি ও ধারণা লাভে সাহায্য করেন।[1]

২। সমাজবিদ্যায় শিক্ষোপকরণের প্রয়োজনীয়তা : (The need of aids in teaching social studies):

সমাজবিদ্যায় ভাবগত বিষয় নেই বললেও চলে। এখানে বস্তুগত বিষয়ের প্রাধান্যই বেশী। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে সংশ্লেষিত করে সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী এখানে রূপায়িত। বিষয়বস্তুর অতীত ও বর্তমান যেমন আছে তেমনি আছে শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে, বহুদূরের বহুবিষয়। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর' মধ্যে খাদ্য, পোশাক বা বাসস্থান সম্পর্কিত দেশীয় বৈচিত্র্যের যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ জলবায়ু ও আঞ্চলিক পরিবেশের খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভ করতে হয়। এসব বস্তুগত বিষয়কে শুধু বক্তৃতার দ্বারা পরিবেশন করলে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চিন্তা, ভাবনা ও অনুধাবন কখনও প্রাণস্পর্শী হয়ে শিক্ষার বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বা প্রদীপন। তাহলেই শুনে শেখা আর দেখে শেখার সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে। এর ফলে যে শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হবে— তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার মূল উদ্দেশ্যকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; (ক) বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও তার তাৎপর্য অনুধাবন, আর (খ) শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিবিধ গুণের বিকাশ সাধন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তাকে সার্থক করে তুলতে গেলে শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন

1. An instructional aid is any device that assists an instructor to transit to a learner facts, skills, attitudes, knowledge, understanding and appreciation. —S. K. Kochar : "The Teaching of Social Studies."

য়ত শিক্ষক যেমন উপকরণ ব্যবহার করবেন, তেমনি শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থী বহু সামগ্রীর সহায়তা গ্রহণ করবে; এমন কি, শিক্ষার্থীকে প্রকল্প রূপায়ণ বা সমস্যা সমাধানের জন্য হাতে-কলমে কাজ করতে হবে। অন্যথায়, বস্তুগত বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান্ লাভ সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং সমাজবিদ্যা শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষোপকরণ বা সহায়ক সামগ্রীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[1] এক্ষণে এইসব সহায়ক সামগ্রী সমাজবিদ্যাশিক্ষণে কেন অপরিহার্য, তা আমরা আলোচনার প্রস্তাব করছি।

শিক্ষোপকরণের অরিহার্যতার কারণঃ প্রথমতঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়ই হল আমাদের জ্ঞানের প্রাথমিক ও প্রথম সোপান। বহির্জগতের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উদ্দীপক (stimulus) বিভিন্ন ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে। পরিবেশ বা বাহ্যজগতের সংগে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের দ্বারা আমাদের মনে প্রত্যক্ষণ হয়, প্রত্যক্ষণ থেকেই ধারণা (Idea) সঞ্জাত হয়। জ্ঞান (knowledge) ধারণারই বিবর্তিত রূপ। অতএব দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ আর তারই সংব্যাখ্যান হল জ্ঞান। সুতরাং শিক্ষা প্রদানকালে যদি বিমূর্তজ্ঞান বা কোন ভাবরাশিকে আমরা মূর্ত বিষয় বস্তুর মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারি, তবে শিক্ষার্থী তা সহজে গ্রহণ করে এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তার ধারণা বা জ্ঞান সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। যেহেতু সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বস্তুভিত্তিক, উপযুক্ত শিক্ষোপরণের দ্বারা সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করলে, সে শিক্ষা হবে জীবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। অন্যদিকে, সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অনেকগুলি বিষয়ও শিখতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রবণ নিরীক্ষণ-সহায়কের (Audio-visual aids) সুস্পষ্ট, জীবন্ত, নাটকীয় আবেদন শিক্ষার্থীর আনন্দানুভূতিতে সাড়া জাগাবে। ফলে তাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা হবে প্রসারিত। জ্ঞানলাভের আকাজ্ক্ষা হবে প্রবল।

---

1. "As an aid is an aid only if and when it really aids, it will never aid maximally unless it is suitable to the back-grounds, abilities, interests and needs of the pupils. It must be suited to the physical, psychological, intellectual and social development of the group with which it is used."
—S. K. Kochhar. : "The Teaching of Social Studies."

তৃতীয়তঃ, স্বল্পমেধা, পশ্চাৎপদ, স্থূলবুদ্ধি, পাঠে ধীর গতি শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা দুরূহ। শিক্ষোপকরণের সহায়তা তাদের জন্য অপরিহার্য।

চতুর্থতঃ, দেখে শুনে শিখতে পারলে সেই শিক্ষাই স্থায়ী হয়। শিক্ষার ভিত্তি হয় পাকা; জ্ঞানের বুনিয়াদ হয় সুদৃঢ়।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষোপকরণ শুধু চিন্তা ও মনন শক্তির বিকাশে সাহায্য করে তা নয়, তা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধন করে। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য এই ক্ষমতা নিতান্ত অপরিহার্য।

৩। শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয় (Classification of teaching aids and appliances and their indentification) ঃ

শিক্ষা-সহায়ক উপকারণগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(১) শ্রবণ ভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Auditory aids) :
- (ক) বেতার (Radio).
- (খ) গ্রামোফোন (Gramophone).
- (গ) টেপ-রেকর্ডার (Tape-Recorder).

(২) দৃষ্টিসংক্রান্ত শিক্ষোপকরণ (visual aids) :
- (ক) ব্ল্যাকবোর্ড (Black Board).
- (খ) প্রকৃত বস্তুসমূহ (Real objects).
- (গ) মডেল ও নমুনা, ছবি, ফটোগ্রা_ (Models & Symbols, Pictures & Photograph).
- (ঘ) গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট, নক্সাদি ও চিত্রসমূহ (Globe, Maps, Charts, diagrams and Pictorial materials etc).
- (ঙ) বিভিন্ন প্রজেক্টর (Different Projectors).
- (চ) চলচ্চিত্র (Motion Pictures).

(৩) শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Audio-visual aids). :
- (ক) সবাক চলচ্চিত্র (Sound-Motion Pictures).
- (খ) টেলিভিশন (Television).

(৪) কর্মসূচক উপকরণ (Aids through activity) :

(ক) শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Excursion).

(খ) অঞ্চল পরিক্রমা (Field trip).

(গ) নিদর্শন সংগ্রহ (Collection of models, specimens etc.).

(৫) পরিবেশজনিত ও প্রেরণামূলক বিষয় (Aids through created environment) :

(ক) সমাজবিদ্যার কক্ষ (Social studies room).

(খ) সমাজীকৃত পাঠচর্চা (Socialised Recitation).

(গ) অবেক্ষণমূলক পাঠ (Supervised study).

(ঘ) রঙ্গ মঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ (Histrionic atmosphere).

(ঙ) শিক্ষা-প্রদর্শণী (Exhibition).

(চ) সমাজ কর্মীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন (Social workers' visit to school).

(ছ) লাইব্রেরী (Library).

(জ) সংগ্রহশালা (Museum).

(ঝ) আঞ্চলিক মেলা, উৎসব ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি (Of fairs, festivals and Celebration national days etc.)

(ঞ) সমাজবিদ্যার ক্লাব (Social studies Club).

(১) **শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Auditory aids) :** আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শুনে শেখার প্রবণতা একসময় খুব বেশি ছিল। শিক্ষকের বক্তৃতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু শিখতে হত। বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হত। তাই শুনে শেখার উপকরণগুলি প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) বেতার : শুনে শেখার উপকরণগুলিকে শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ নামে অভিহিত করা যায়। এই উপকরণগুলির মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে রেডিওর উপযোগিতা অপরিসীম। সমাজবিদ্যার উপযোগী বহু বিষয় রেডিওতে আলোচিত হয়। দেশবিদেশের সংবাদ, রাজনীতি, সমাজনীতি, সঙ্গীত, নাটক, কথোপকথন,

বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির ভাষণ প্রভৃতি বেতার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে বিদ্যার্থীদের উপযোগী বিষয়, হিন্দী শিক্ষার আসর, অতি আধুনিক ঘটনা, শিক্ষাগত নানা প্রশ্নের উত্তর প্রভৃতি বেতার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা থাকে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির অনুকরণে আমাদের সরকার বিদ্যালয়ে বেতার রাখার ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যালয়ের কর্মসূচী প্রণয়নের সময় রেডিও শোনার নির্দিষ্ট সময় ধার্য করে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের উপকার করতে পারেন।

শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বেতারের উপকারিতা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের (UNESCO) অভিমত প্রণিধানযোগ্য: "School broadcasting service provides training in selective and critical listening ; and it serves to interpret the School."

বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা শুনতে পায়। সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে এসব চিন্তা ধারায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়ে ওঠে। সমাজবিদ্যা শিক্ষার জন্য এগুলির মূল্য অপরিসীম বলা চলে। বেতারের সঙ্গীত, একাঙ্ক নাটক, রঙ্গ-রস যেমন শিক্ষার্থীকে আনন্দ দান করে, তেমনি পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে তারা স্ব-স্ব জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত করে।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পাঠ্যবিষয়ভুক্ত বহু বিষয় বেতারযোগে পরিবেশন করে। দেশের নাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি সে-সব দেশে বেতারে প্রচারিত হয়। ফলে সেখানকার সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থী সত্যই বেতারযোগে শিক্ষায় যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে।

বেতার মারফত শিক্ষার সর্বাপেক্ষা অসুবিধা হল: (i) এখানে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না; (ii) কথোপকথন বা বক্তৃতা অস্পষ্ট হলে পুনরায় তা উচ্চারিত হয় না; (iii) সঙ্গীত ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অল্প বয়স্করা অধিক অনুরক্ত হয়; (iv) বেতার সূচী শোনার পর পরবর্তী শ্রেণী-পাঠে শিক্ষার্থীর মন বসতে চায় না।

এসকল অসুবিধা দূর করার জন্য সর্বপ্রথমে স্মরণ রাখা দরকার যে, বেতারে যতই শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশিত হোক, এই যন্ত্র কখনও শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের

পরিবর্তমাধ্যমরূপে (substitute) ব্যবহৃত হতে পারে না। শিক্ষকের পাঠদানের সহায়ক উপকরণ হিসেবে বিদ্যালয়ে বেতারের উপযোগিতার কথা চিন্তা করাই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষক স্বীয় কর্মের সুবিধার্থে বেতারসূচীর বিষয়াদিকে পূর্বেই নির্বাচিত করে এবং রুটিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সাহায্য করতে পারেন। নির্বাচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা থাকাই বাঞ্ছনীয়। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উত্তর বেতার দেয় না। সুতরাং বেতার ভাষণ শুনবার পূর্বেই জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষককেই অল্পবিস্তর আলোচনা করতে হবে। কোন্ কোন্ পুস্তক থেকে ঐ সকল বিষয় জানতে পারা যায়, সে সম্পর্কেও শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দিতে পারেন। বেতার বক্তৃতা অনেক সময় বেতারসূচী প্রচারিত পত্রিকা 'বেতার জগতে' ছাপা হয়। সমাজবিদ্যার গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা অথবা সাধারণ পাঠাগারে এই 'বেতার জগৎ' পড়ে শিক্ষার্থীরা বেতারে পূর্ব পরিবেশিত বিষয় সম্পর্কে পুনরায় জানতে ও শিখতে পারবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টা থাকলে বেতার মাধ্যমে শিক্ষার এই সুযোগ থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে না।

(খ) গ্রামোফোন: বেতারের ন্যায় গ্রামোফোনও শিক্ষাকার্যের অন্যতম উপকরণ। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার সহায়ক হিসেবে গ্রামোফোন ব্যবহৃত হয়। গ্রামোফন মারফৎ উচ্চারণ ভঙ্গিমা, সঙ্গীত, হাস্যরস প্রভৃতি শিখবার ও উপভোগ করবার অনেক কিছু থাকলেও সমাজবিদ্যা শিক্ষায় গ্রামোফোন বিশেষ কার্যকরী উপকরণ নহে।

(গ) টেপ রেকর্ডার: শ্রুতিনির্ভর উপকরণ হিসেবে টেপ-রেকর্ডার বর্তমানে শিক্ষাকর্মে যথেষ্ট সহায়তা করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কোন বক্তৃতা বা আলোচনা এই যন্ত্রে ধরে রেখে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন। এতে শিক্ষকের মুখনিঃসৃত বাণী বা বক্তৃতার এক-ঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়ে শিক্ষার্থী একটু নতুনত্বের আস্বাদ পাবে।

(২) দৃষ্টিসংক্রান্ত শিক্ষোপকরণ (Visual aids): (ক) ব্ল্যাক বোর্ড (Black-Board): দৃষ্টিনির্ভর উপকরণের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার শুধু অপরিহার্য নহে, অদ্বিতীয়ও বলা চলে। আলোচ্য বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত, সুস্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে ব্লাকবোর্ডের ন্যায় সুলভ ও সর্বাপেক্ষা উপযোগী সামগ্রী আর দ্বিতীয়টি নেই। সমাজবিদ্যার বস্তুগত বিষয়ের শিক্ষাদানে

প্রয়োজন হয় ছবি, নক্সা, মডেল, চার্ট, টাইম লাইন, মানচিত্র প্রভৃতি। অঙ্কনে পারদর্শী শিক্ষক অনেক সময় উক্ত দ্রব্যাদির প্রয়োজন বোধ করেন না। পাঠদান কালে প্রয়োজনমত এগুলি তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে অধিকতর জীবন্ত করে তুলতে পারেন।[1] ব্ল্যাকবোর্ডের পাশাপাশি গ্রাফবোর্ড রাখা সমীচীন। তাহলে মানচিত্র, টাইম লাইন ও অন্যান্য পরিমাপ-নির্ভর বিষয়াদি অঙ্কনের সুবিধা হয়।

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের জন্য শিক্ষককে অঙ্কনে পারদর্শী হতে হবে। তাঁর হস্তলিপি সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে সাদা ও রঙিন চক্ এবং সুন্দর একখানি ডাষ্টার ও অঙ্কিত বিষয় দেখাবার জন্য একখানি পয়েন্টিং ষ্টিক (Pointing stick) হবে শ্রেণীকক্ষের অপরিহার্য উপাদান।

(খ) **প্রকৃত বস্তু সমূহ ঃ** দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণ সমূহের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ডের পর প্রকৃত বস্তু সমূহের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, বস্তুগত বিষয়ের আলোচনায় প্রকৃত বস্তু সমূহ শিক্ষাকে যত জীবন্ত ও সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে, অন্য কিছু তা পারে না। সমাজবিদ্যার যাবতীয় বিষয়বস্তুর জন্য প্রকৃত সামগ্রীর আমদানী করা অসম্ভব। যেমন, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার সময় ভারতের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, মরুপ্রান্তর ইত্যাদি বাস্তবে শিক্ষার্থীদের দেখান সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় কৃষিজ, খনিজ, শিল্পজ সামগ্রীর আলোচনার সময় মাঝে মাঝে প্রকৃত বস্তু সমূহ দেখান খুবই সম্ভব। সংগ্রহশালায় আমরা এই সকল বস্তু সমূহ সংরক্ষিত করতে পারি। ঐতিহাসিক অংশের আলোচনাতেও কোন কোন বিদ্যালয় প্রকৃত বস্তু সমূহ দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারে। অঞ্চল প্রদক্ষিণ, শিক্ষামূলক ভ্রমণের সময় প্রকৃত বস্তু সমূহের সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসা সম্ভব হয়। বিমূর্ত বিষয়কে জীবন্ত ও সুস্পষ্ট করে তুলতে প্রকৃত বস্তু দর্শনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

(গ) **মডেল, নিদর্শন, ছবি ঃ** দৃষ্টি-নির্ভর প্রদীপনের মধ্যে প্রকৃত বস্তু সমূহের অভাবে আমরা বস্তুর মডেল, নমুনা, নিদর্শণ, ছবি প্রভৃতি দেখাতে পারি। সমাজবিদ্যার পাঠদানের সময় উক্ত দ্রব্যাদি শিক্ষার্থীদের দেখানর উপযোগিতা অসীম। জ্ঞানমুখী বিষয় (knowledge subject) সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু।

---

1. "Black-board drawings, sketches and maps are superior to finished productions, at least in the early lessons."
—Raymont

একে মূর্ত করে তুলতে পারে মডেল, নিদর্শন, ছবি প্রভৃতি। এগুলিকে প্রস্তুত ও সংগ্রহ করে সমাজবিদ্যার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। শিক্ষক পাঠদানের সময় সেগুলি যথাযথ ব্যবহার করলে শিক্ষাদান প্রাণপ্রদ হয়ে উঠবে।

(ঘ) **গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা ও চিত্র সমূহ:** সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনে ভূগোলের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। সমতলে অঙ্কিত মানচিত্র অপেক্ষা গ্লোব পৃথিবীর আকৃতি, প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। এ দ্বারা উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, নিরক্ষরেখা, মূলমধ্য রেখা প্রভৃতির অবিকল অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রাকৃতিক যোগাযোগ ও তাদের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। সমাজবিদ্যার মাধ্যমে মানুষের এই নিবিড় সম্পর্কের কথা শিক্ষার্থীকে জানতে হবে। এই কাজ সম্পাদনের জন্য গ্লোবের সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় জানবার জন্য পৃথক পৃথক গ্লোব সংগ্রহ করতে পারলে সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থী যথেষ্ট উপকৃত হবে, আর শিক্ষকের শিক্ষাদান সার্থক হয়ে উঠবে।

সমাজবিদ্যায় **মানচিত্রের** উপকারিতা অপরিসীম। বস্তুগত বিষয় সকল প্রাকৃতিক পরিবেশে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ও মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের অবস্থিতি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিষয়বস্তু পরিবেশন জীবন্ত ও মূর্ত হয়ে উঠতে পারে না। এর সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারে মানচিত্র, ছবি প্রভৃতি। আন্দামান নিকোবর, মালয়, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি পৃথিবীর কোন্ প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত তার জ্ঞান না থাকলে ঐ সব অঞ্চলের মানব-সমাজ ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি জানবার কোন সার্থকতা থাকে না। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মানসপটে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না।[1] পুস্তকে লিখিত বা মৌখিক বিষয় সম্পর্কে স্থায়ী জ্ঞান লাভ করতে হলে মানসিক ক্ষেত্রে বিষয়ের সংযোগ (association) গড়ে উঠা নিতান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় ভুলে যাওয়া বা ভুল করার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা থেকে যায়। মানচিত্র ও অন্যান্য

1. "Verbal description aided by diagrammatic representation appears to be most effective than verbal description used alone." —Weber

শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীগুলিই জ্ঞাতব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট, জীবন্ত ও স্মরণীয় করে তুলতে পারে।

পাঠদান কালে ব্ল্যাকবোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন সব সময় সকলের দ্বারা সম্ভব হয় না। তাই সীমিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত মানচিত্রের প্রয়োজন হয়। শিক্ষক স্বহস্তে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কন করতে পারলে পাঠদান যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়। আজকাল বাজারে রেখ মানচিত্র (out line) কিনতে পাওয়া যায়। অঙ্কিত মানচিত্র অপেক্ষা রেখচিত্রের প্রয়োজনীয়তা অধিক। কারণ, রেখ মানচিত্রে প্রয়োজন মত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন্দর, শহর, নগর প্রভৃতির অবস্থান লিখলে বা নির্দেশ করলে (Point) খানিকটা ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কিত মানচিত্রের উপযোগিতা লাভ করা যায়।

সমাজবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় পরিবেশনের জন্য **নক্সা, চার্ট, গ্রাফ** প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। শিক্ষাদানের জন্য উক্ত দ্রব্যাদি যথেষ্ট ফলপ্রসূ। নক্সা, চার্ট প্রভৃতির মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে এবং দীর্ঘকাল বিষয়টি স্মরণ রাখতে পারে। শিক্ষার্থীদের দ্বারা যদি ঐগুলি অঙ্কন করান যায় তবে শিক্ষার বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় হয়। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীকে ম্যাপ, চার্ট, নক্সা প্রভৃতির অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া।

সমাজবিদ্যায় এমন অনেক বিষয় থাকে যে-গুলিকে ঠিক মৌখিক আলোচনায় বা ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা যায় না। এমন ক্ষেত্রে নক্সা, চার্ট, গ্রাফ প্রভৃতির ব্যবহার অপরিহার্য। এক্ষণে আমরা এসব উপকরণাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি :

নক্সা : কতকগুলি রেখা (line) এবং নিদর্শন (Symbols) দ্বারা নক্সা অঙ্কন করা হয়। নক্সা হল সরল, সহজ ও অমূর্ত বিষয়ের অল্পবিস্তর মূর্ত প্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংক্ষিপ্তসার (Summary) এবং সামগ্রিক বিষয়ের পুণরীক্ষণের (review) নিমিত্ত নক্সা ব্যবহার করা হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীর সম্মুখে নক্সা প্রদর্শনের পূর্বেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণা লাভে শিক্ষককেই সাহায্য করতে হবে। নক্সার মধ্যে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়, লেখা বা চিহ্ন বসান মোটেই উচিত নয়। নক্সাটি হওয়া উচিত স্বয়ং সম্পূর্ণ, সুস্পষ্ট, অকর্ষণীয় ও ব্যাখ্যা মূলক। মনে রাখা উচিত, বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর

অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দেওয়াই নক্সা বা এরূপ শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির একমাত্র উদ্দেশ্য।

চার্ট ঃ বিষয়ের ভাবগত ব্যঞ্জনাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করবার জন্য চার্ট-এর সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। চার্টকে গ্রাফিক এবং চিত্র-সূচক বিষয়ের যুগ্ম প্রতিরূপ বলা চলে। চার্ট-এর প্রধান কাজ হল বিভিন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, প্রগতি, শ্রেণীবিভাগ, সংগঠন প্রভৃতি বিষয় ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট করা। প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার চার্ট দেখান যায়। যেমন,

(i) বংশ তালিকা, (ii) সম্পর্ক প্রকাশ, (iii) সময় তালিকা, (iv) শ্রেণী বিভাগ, (v) সরবরাহ, (vi) তুলনা মূলক চার্ট, ইত্যাদি।

উল্লিখিত চার্ট গুলির কোনটি ভৌগোলিক, কোনটি ঐতিহাসিক, কোনাটি বা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয় দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নক্সার ন্যায় চার্টও সরল, সহজ, সুস্পষ্ট ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক নির্দেশিত কোন বিষয়ের চার্ট যদি শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরি করে, তা হলে বিষয়টি তাদের মনে স্থায়ীভাবে রেখা পাত করে। এ শুধু চার্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—মানচিত্র, নক্সা, চার্ট, মডেল প্রভৃতি প্রতিটি শিক্ষোপকরণ তৈরীর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টাই সর্বজনকাম্য। শিক্ষক কর্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যাদি শিক্ষার্থী প্রথমে চোখে দেখে, পরে মন-প্রাণ ও চিন্তা শক্তির দ্বারা বিচার করে এবং পরিশেষে শিক্ষালাভ করে। শিক্ষার্থী যখন নিজেই শিক্ষোপকরণ তৈরি করে তখন তার মন ও চিন্তা উভয়ই ক্রিয়াশীল হয়। মনে-প্রাণে সম্যক জ্ঞান আহরণ করে তবে তাকে কোন সামগ্রী প্রস্তুত করতে হয়। ফলে এ শিক্ষা হয় অধিকতর সক্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী।

গ্রাফ (Graph) ঃ পরি-সংখ্যান বিষয়াদি পরিবেশনের জন্য সাধারণতঃ গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। গ্রাফে পরিসংখ্যার পাশাপাশি এর অন্তর্নিহিত ভাব সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত হয়। সংখ্যাতত্ত্বের তুলনামূলক বিচারে গ্রাফের উপযোগিতা অপরিসীম। গ্রাফের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়বস্তু স্মরণ রাখতে পারে। গ্রাফেরও প্রকার ভেদ আছে। যথা,—

(i) রেখা-গ্রাফ (Line graph)
(ii) স্তম্ভ-গ্রাফ (Bar graph)
(iii) বৃত্তাকার গ্রাফ (Circle graph)
(iv) চিত্রসূচক গ্রাফ (Pictorial graph)

অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, জাতীয় আয়, দ্রব্যমূল্য, উৎপাদন ইত্যাদি; ইতিহাসের ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা; এবং ভূগোলের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, জলবায়ু, উচ্চতা প্রভৃতি প্রকাশের জন্য উক্ত গ্রাফগুলি কার্যকরী উপায়ে ব্যবহৃত হয়। বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারাকে গ্রাফ এমন ভাবে প্রকাশ করে যে, শিক্ষার্থীর মনে তা গভীর রূপে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সহজে ভুলে যায়.না। নক্সা, চার্টের ন্যায় গ্রাফ ব্যবহার করা তখনই উচিত যখন বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা শিক্ষার্থীরা লাভ করে। অন্যান্য শিক্ষোপকরণের ন্যায় শিক্ষার্থীদের গ্রাফ অঙ্কন শিক্ষা দেওয়াও নিতান্ত প্রয়োজন।

(ঙ) ছবিকে পর্দায় প্রতিফলের জন্য নিম্ন লিখিত যন্ত্রাদির ব্যবহার বহুল প্রচালিত: এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope): পুস্তকের ছবি, নক্সা, ম্যাপ বা ছোট আকারের চিত্রাদিকে পর্দায় সরাসরি প্রতিফলিত করবার জন্য এপিডায়াস্কোপ একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই যন্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক পাঠ-পরিবেশনের সময় এই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। ফলে শিক্ষক অল্প সময়ের মধ্যে জটিল পাঠ্যবিষয় সহজতর উপায়ে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। শিক্ষকের মৌখিক বিষয় যখন শিক্ষার্থীরা প্রতিফলিত চিত্রে দেখতে পায়, তখন শিক্ষা হয়ে ওঠে জীবন্ত ও ফলপ্রসূ।

ম্যাজিক লণ্টর্ণ (Magic lantern): এই যন্ত্রটিও পর্দায় ছবি প্রতিফলিত করে পঠন-পাঠনে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই যন্ত্রের অসুবিধা হল, পুস্তকের ছাপা চিত্রাদিকে প্রতিফলিত করা যায় না। এ জন্য পৃথক ভাবে আগে থেকে স্লাইড (Slide) তৈরী করে রাখতে হয়। তৈরী ছবি অপেক্ষা প্রতিফলিত ছবি আকৃতিতে অনেক বড় হয়, তাই বহু শিক্ষার্থী একসঙ্গে এগুলি দেখবার সুযোগ পায়।

(চ) চলচ্চিত্র (Motion Pictures): ম্যাজিকলণ্ঠন ও এপিডায়াস্কোপে স্লাইড এবং পুস্তকাদির ছবিগুলিকে পর্দায় প্রতিফলিত করে শ্রেণীকক্ষে সরাসরি দেখান যায়। কিন্তু এরূপ খণ্ড খণ্ড সম্পর্কহীন চিত্র শিক্ষার্থীর মনে খুব বেশি উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে না। স্থির চিত্রাদির পরিবর্তে যদি চলমান চিত্রের দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে ধরা যায়, তাহলে শিক্ষা

আরও জীবন্ত ও স্থায়ী হতে পারে। আজকাল শিক্ষাকে সুন্দর, জীবন্ত ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ বহু যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রথমতঃ, এর উল্লেখ স্বরূপ খণ্ড ফিল্‌ম্ ছবি (film strips)-এর প্রচলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন একটা ঘটনা বা দৃশ্যকে পরপর কতকগুলি ফিল্‌ম্ ছবির মাধ্যমে পর্দায় প্রতিফলিত করা যায়। এই ছবিগুলির সুবিধা এই যে, যতক্ষণ ইচ্ছা খুশি মত শিক্ষার্থীদের সামনে এগুলিকে দৃশ্যমান রাখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা ঘটনাপরম্পরার ছবিগুলি অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখতে পায় ও বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চোখে দেখে অনুধাবন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাক চলচ্চিত্র শিক্ষা জগতে অপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। এগুলিকে 'মোশান পিক্‌চার' বলা হয়। সরকারী প্রচার কার্যের জন্য প্রামাণিক চিত্রাদি (documentary films) দেখান হয়। সমাজবিদ্যার নির্দিষ্ট কক্ষে এরূপ ছবি দেখানর ব্যবস্থা থাকলে সমাজবিদ্যা শিক্ষা যে পরিমার্জিত ও জীবন্ত হয়ে ওঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষায় উন্নত দেশ-সমূহের ন্যায় ভারত সরকার বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর উপযোগী বিষয়বস্তু চলচ্চিত্রে দেখানর ব্যবস্থা করছেন। গৌতমবুদ্ধের জীবনী, ঝাঁসীর রাণী, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, কৃষি-শিল্প, এমনকি রাষ্ট্রসংঘের (UNESCO) সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক চিত্রাদি, এস্কিমোদের জীবনযাত্রা, ভূমধ্যসাগরীয় জীবনযাত্রা, জাহাজ পরিচালনা, সমুদ্রে মৎস্য শিকার প্রভৃতি চিত্র যদি সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীর চোখের সামনে পর্দায় দেখান যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক প্রতিফলিত চিত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহলে শিক্ষা যে শিক্ষার্থীর নিকট স্বতঃস্ফূর্ত হবে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং সমাজবিদ্যার শিক্ষাদান প্রসঙ্গে মোশান পিকচারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

(৩) শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Audiovisual aids) :

(ক) সবাক চলচ্চিত্র (Sound-motion pictures) : যুগপৎ শ্রবণ ও দর্শণের মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সম্ভাব্য উপকরণ হিসেবে সবাক চলচ্চিত্রের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে প্রধানতঃ আমোদ-প্রমোদের উপকরণ যোগায় সবাক-চলচ্চিত্র। ছাত্রদের শিক্ষার সহায়ক সামগ্রী হিসেবে এর বিশেষ উন্নতি হয় নি। তবে প্রচলিত ছবির মধ্যে কোনটিই যে শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয় না, তা বলা চলে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, পথের পাঁচালী, লবকুশ, নেতাজী প্রভৃতি ছবি শুধু

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নহে, সমাজের যে-কোন স্তরের নাগরিকের শিক্ষার ক্ষেত্রে উপাযাগী চিত্র। তবুও একথা সত্য যে, বিদ্যালয় পাঠক্রমের সরাসরি সহায়তার জন্য সিনেমার ব্যবহার আমাদের দেশে বিরল। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে সরকারী প্রচেষ্টায় পাঠক্রম অনুসারে বহু চিত্র তৈরি ও প্রদর্শিত হয়। চিত্র ও বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সেখানে বিদ্যমান। শিক্ষা পুনর্গঠনে এরূপ শিক্ষা বিষয়ক চিত্রের বহুল প্রচার সর্বজন কাম্য। আজকাল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অনেকেই শিক্ষাবিষয়ক চিত্র নির্মাণে সচেষ্ট ও অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। যে-সব বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার পৃথক কক্ষ আছে, সেখানে এই সরকারী চিত্রাদি স্ব-স্ব শিক্ষার্থীদের দেখাবার ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে।

সবাক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ, নির্বাচিত চিত্রগুলি সত্যই অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষনীয় কিনা তা দেখা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পর সমাজবিদ্যার কক্ষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের চিত্র সমালোচনার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা চিত্রে কি দেখল আর কি শিখল সে সম্পর্কে তারা স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করবে। এর ফলে অমনোযোগী শিক্ষার্থীরা চিত্র-মাধ্যমে যা শিখতে পারেনি, শিক্ষার্থী বন্ধুর বক্তব্য শুনে তা জানতে ও শিখতে পারবে। তৃতীয়তঃ, প্রদর্শিত চিত্র সম্পর্কে শিক্ষক স্বীয় বক্তব্য ও মতামত দ্বারা শিক্ষার্থীর ত্রুটি নিরসণের চেষ্টা করবেন। শিক্ষকের চিত্র সমালোচনা অধিকতর গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসব শেষে শিক্ষকের নির্দেশমত শিক্ষার্থীরা প্রদর্শিত চিত্র সম্পর্কে রচনা (Essay) লিখবে ও শিক্ষক ঐই রচনার যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। এই মূল্যায়াণ যোগ্যতা নির্ধারক নম্বরে (marks) প্রকাশ করতঃ সর্বাত্মক লিপিতে (Comulative Record) উল্লিখিত করা হবে।

(খ) **টেলিভিশন (Television):** সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ হিসেবে টেলিভিশন শিক্ষাক্ষেত্রের অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। দুঃখের বিষয়, এটি এত ব্যয়বহুল যে বিদ্যালয়ে টেলিভিশন স্থাপন আমাদের কাছে আজও স্বপ্নাতীত বিষয়। প্রগতিশীল দেশগুলিতে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলনে সেখানে শিক্ষাদান কর্ম যথেষ্ট ত্বরান্বিত ও সহজসাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষাকর্মের জন্য এই যন্ত্রের প্রচলন অত্যাবশ্যক ও সর্বজন কাম্য।

রেডিওতে আমরা শুধু বক্তার কথা শুনি, কিন্তু টেলিভিশনে কথার সঙ্গে বক্তার চেহারা ও কথা বলার সুস্পষ্ট ভঙ্গিমা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। শ্রবণের সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ অপূর্ব শিক্ষাসহায়ক—এতে সন্দেহ নেই। সুতরাং সমাজবিদ্যার শিক্ষাদানে এই যন্ত্রের বহুল-প্রচলন হলে শিক্ষা জগতে শুভ পরিবর্তন সূচিত হবে, এটা সুনিশ্চিত।

(৪) **কর্ম-সূচক উপকরণ (Aids through activity)ঃ** কর্ম ও অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এ শিক্ষা ইন্দ্রিয়, দেহ ও মনের নিজস্ব ব্যাপার। বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ পুঁথি সর্বস্ব শিক্ষার কুফল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্ শিক্ষাবিদরা পুঁথির সঙ্গে কর্ম ও অভিজ্ঞতার যোগসাধন করেছেন। এজন্যই প্রবর্তিত হয়েছে সহপাঠ্যসূচী (Co-curricular activities)। আমাদের শিক্ষাধারায় কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত অতিরিক্ত পাঠ্যসূচী (extra curricular activities) নামে অভিহিত বিষয়াদি বর্তমানে সহপাঠ্যসূচীরূপে অভিব্যক্ত। এই পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে প্রাণহীন, গতানুগতিক পুঁথি সর্বস্ব শিক্ষার কুফল আজ অপসারিত। নতুন কর্ম-সূচীতে শিক্ষায় সঞ্চারিত হয়েছে প্রবল প্রাণবেগ। এই প্রাণবেগকে ছন্দোময়, মুখর করে তুলবার দায়িত্ব শিক্ষকের। কর্মই হবে শিক্ষা সহায়ক—কর্মসূচক উপকরণ বা প্রদীপন। শিক্ষামূলক ভ্রমণ (excursion), কর্মক্ষেত্র প্রদক্ষিণ (fiied trips) এবং নিদর্শন সংগ্রহ (Collection of model, Specimen etc.) প্রভৃতিকে কর্মসূচক প্রদীপন হিসেবে গণ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচক প্রদীপন যথা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং কর্মক্ষেত্র প্রদক্ষিণ ও পরিদর্শন একই বিষয়ের নামান্তর মাত্র। উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য আনন্দদায়ক পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা। এজন্যে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন হয়, সুতরাং একে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষামুলক ভ্রমণের তাৎপর্য পূর্ণ অর্থ হল বহির্বিভাগীয় শিক্ষা (outdoor lesson)। এ শিক্ষা বিদ্যালয় কক্ষের পুঁথিগত শিক্ষার পরিপূরক। সমাজ-বিদ্যার শিক্ষা এই বহির্ভ্রমণ ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। আঞ্চলিক কারখানা, হাট-বাজার, বেকারী, রেডিও ষ্টেশন, ব্যাঙ্ক, মন্দির মসজিদ, গীর্জা, কোর্ট-কাছারী ইত্যাদি হল বাস্তব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীরা উক্ত স্থানগুলিতে যাবে,

প্রশ্ন করবে, তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে, তবেই সমাজবিদ্যার শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। বাস্তব বিষয়ের মাধ্যমে যদি সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করাই জ্ঞানার্জনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের সীমিত পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে সমাজের বাস্তব কর্মস্থলে, যেখানে তারা বাস্তব পরিবেশে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে শিক্ষক কর্তৃক পরিকল্পিত শিক্ষামূলক ভ্রমণে এই সুযোগ লাভ করা সহজ। শিক্ষার্থী স্বচক্ষে দেখবে দূর আকাশ থেকে বিমান কিভাবে ভূ-তলে অবতরণ করে, আবার ভূ-তল থেকে দূর আকাশে কিভাবে উড়ে যায়, বিশাল চুল্লীগুলি কিভাবে কঠিন লোহার রূপান্তর ঘটায়, অবহেলিত বালুকা কাচ হয়ে কিভাবে ঘরে ঘরে মানুষের সেবা করে, সুমধুর সঙ্গীত-নাটক, বক্তৃতা কিভাবে রেডিও ষ্টেশনে পরিবেশিত হয় ইত্যাদি। তবেই সমাজবিদ্যার জ্ঞান হবে সুস্পষ্ট, স্বাভাবক, জীবন্ত ও গতিশীল।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা (Utility of Excursion, field trips etc.)ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণের মূল উপযোগিতাগুলি নিম্নোক্তরূপ :

প্রথমতঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ সমাজবিদ্যার পুঁথিগত-বিষয় শিক্ষার পরিপূরক বা সম্পূরক। শ্রেণীকক্ষের পঠিত বিষয় যখন শিক্ষার্থী স্বচক্ষে দেখতে ও স্বকর্ণে শুনতে পায়, তখন বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বুনিয়াদ তাদের সুদৃঢ় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক (first-hand) অভিজ্ঞতা দান করে। ফলে বিষয়টি তার মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে। অথচ শুধু শোনা কথা বা বক্তৃতা বা পুঁথিগত বিদ্যা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অধিক। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা যদি শিক্ষার্থী স্বয়ং চোখে দেখে ও সেখানকার কর্মীদের কথা সঙ্গে সঙ্গে শোনে, তাহলে কারখানা এবং সংশ্লিষ্ট পল্লীর নতুন সমাজজীবন সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান মানসিক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেরূপ স্বচক্ষে দেখা গ্রামাঞ্চলের কৃষি ও কৃষকজীবন শিক্ষার্থী কখনও ভুলতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাস্তবতাবোধ বিকশিত হয়, ফলে সে বাস্তব সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করতে শেখে।

চতুর্থতঃ, অতীতের ঘটনাবলীর ক্ষেত্র পরিদর্শন করলে নির্জীব, বিমূর্ত বিষয় বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পঞ্চমতঃ, শ্রেণীকক্ষের একঘেয়েমির হাত থেকে শিক্ষার্থী মুক্তি পায় এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য পরিকল্পনা রচনা, পরিচালনা ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে শেখে।

ষষ্ঠতঃ, ভ্রমণান্তে শিক্ষকের সাহচার্যে রচিত বিবরণ এবং এগুলি সমাজবিদ্যার বাস্তব শিক্ষণীয় বিষয়রূপে পরবর্তী শিক্ষার্থীদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে। অধিকন্তু, ভ্রমণের সময় শিক্ষার্থীরা প্রচুর দর্শনীয় এবং শিক্ষণীয় নিদর্শন সংগ্রহ করে সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের দ্বারা বিদ্যালয়ের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা চিন্তার ভাববস্তু সংগ্রহ করে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পুষ্টি বিধান করতে সমর্থ হয়।

সপ্তমতঃ, পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে হৃদ্যতা, সক্রিয় সহযোগিতা ও সমবেদনার মনোভাব সৃষ্টি হয়, তাও শিক্ষার্থীর জীবনের অমূল্য সম্পদ।

নানা পর্যায়ের শিক্ষামূলক ভ্রমণ হতে পারে। যেমন, সপ্তাহ শেষে শনিবার বা রবিবার আঞ্চলিক কারখানা, হাটবাজার, পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, ডেয়ারী ফার্ম, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি পরিদর্শনের জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশ কালে দূর অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য ব্যবস্থা করা চলে। তৃতীয়তঃ, বাৎসরিক পরীক্ষা অন্তে যখন শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট অবকাশ পায়, তখন, শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়। তবে সুদূর ভ্রমণের জন্য বিদ্যালয় অবকাশ সময় বা বাৎসারিক পরীক্ষা শেষে গৃহীত কর্মসূচীর উপযোগিতা অধিক।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য সরকারী তরফ থেকে কিছু কিছু অর্থব্যয় করার রীতি গৃহীত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে রেলওয়ে কনসেশন ব্যবস্থা ভ্রমণের যথেষ্ট সুযোগ এনে দিয়েছে। তবুও দেখা যায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অসুবিধা বশতঃ শিক্ষার্থীরা সেই সুবিধা ভোগ করতে পারে না। আবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের সহযোগিতায় অগ্রণী হয়ে যদি সুপারকল্পিতভাবে ভ্রমণের ব্যবস্থা না করেন, সেক্ষেত্রেও প্রকৃত ভ্রমণের উপযোগিতা শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে না। কারণ সেখানে ভ্রমণান্তে শিক্ষার্থীর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সদুত্তর দিতে পারে না। তারা ফিরে আসে শুধু শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি নিয়ে। সুতরাং শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পনা (How to plan for excursion) : প্রথমতঃ, শিক্ষককে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কোন্ প্রকার শিক্ষালাভে সাহায্য করার জন্য তিনি তাদের ভ্রমণ বা অঞ্চল প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাবেন তা নির্দিষ্ট না থাকলে ভ্রমণ সার্থক হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কোথায় কোন্ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে তা নির্বাচন করা প্রয়োজন। ভ্রমণার্থে নির্ধারিত স্থান বা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি লওয়া একান্ত দরকার।

তৃতীয়তঃ, কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার পর কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভ্রমণের তারিখ, সময়, ছাত্র সংখ্যা, পরিচালক সংখ্যা, ক্ষেত্রগত কর্মসূচী নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, ভ্রমণে যাত্রাকরার পূর্বেই শিক্ষককে সেই নির্দিষ্ট স্থান পর্যটন করে বিশ্রামাগার, খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, প্রয়োজনীয় যানবাহন, নগদ টাকা-পয়সা, খাদ্য, পানীয় ও বিশ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহযোগে সুনির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করাই যুক্তি সঙ্গত।

ষষ্ঠতঃ, যাত্রার পূর্বে শিক্ষার্থীগণকে উপযুক্তরূপে তৈরী করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভ্রমণের জন্য প্রথম প্রয়োজন আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি। ভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় কি কি নির্দেশ পালন করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা ও দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। যে স্থান বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীরা পায় তার জন্য শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর সাহায্যে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যাতে নোট্বুক, অ্যালবাম, ক্যামেরা প্রভৃতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছায় সেরূপ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

সপ্তমতঃ, প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষকের নির্দেশমত শিক্ষার্থীরা প্রথমে সংগৃহীত, নক্সা, মডেল, নিদর্শন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় জমা দিবে। শিক্ষার্থীরা এর পরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিবরণী (report) লিখবে এবং প্রয়োজন বোধে তার মূল্যায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভ্রমণের সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেকেই অনেক অন্যায় ও ত্রুটিবহুল কর্মে লিপ্ত হতে পারে, শিক্ষক এই ত্রুটি দূর করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

এইভাবে পরিকল্পিত উপায়ে যদি শিক্ষামূলক ভ্রমণ, স্থান পরিদর্শন ও নক্সা, মডেল প্রভৃতি সংগ্রহ করা যায়, তাহলে সমাজবিদ্যার শিক্ষা সত্যই সজীব ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষাকে সার্থক রূপায়ণের জন্য শিক্ষকের দক্ষতা, বিদ্যাবুদ্ধি, পরিচালন ক্ষমতা ও নিপুণতা এক্ষেত্রে অপরিহার্য।

(৫) পরিবেশজনিত ও প্রেরণামূলক বিষয় (Aids through created environment) ঃ

(ক) সমাজবিদ্যার কক্ষ (Social Studies Room) : (i) পৃথক কক্ষের প্রয়োজনীয়তা (Need for seperate room) : শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষারক্ষেত্রে পৃথক কক্ষের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। এই পৃথক কক্ষ হল পরীক্ষাণাগার (Laboratory) অথবা প্রয়োগশালা, কোথাও বা কর্মশালা (workshop) নামে পরিচিত। এখানে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট থাকে। শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এই পৃথক কক্ষটির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। নবজাত বিষয় হলেও সমাজবিদ্যা শিক্ষার জন্যও এরূপ একটি পৃথক কক্ষের প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত অনুভূত হচ্ছে। এই প্রয়োজনীয়তার পশ্চাতে কতকগুলি সক্রিয় যুক্তি আছে।

প্রথমতঃ, সমাজবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল জ্ঞানলাভ এবং শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিবিধ গুণের বিকাশ সাধন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথম প্রয়োজন পরিবেশ সৃষ্টি। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা জাগে না। এই প্রেরণামূলক পরিবেশ গঠনের জন্যই সমাজ-বিদ্যার পৃথক কক্ষ অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতির ক্রিয়াশীল, মুখর, জীবন্ত ও সার্থক প্রয়োগের জন্য চাই শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী। ব্ল্যাক বোর্ড, গ্রাফবোর্ড, রেডিও, গ্রামোফোন, এপিডায়া-স্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, ম্যাপ, নক্সা, ছবি, চার্ট, গ্রাফ, সমাজ কল্যাণমূলক প্রচারপত্র (সরকার প্রদত্ত), শিক্ষার্থী কর্তৃক সংগৃহীত ও অঙ্কিত বিবিধ সামগ্রী, মডেল, সার্ভে-যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংরক্ষণ করার জন্যই পৃথক কক্ষের প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম সমাজবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থী প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, মডেল, মুদ্রা, তৈলচিত্র, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি

শিক্ষামূলক বহু সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। বিভিন্ন যুগের চিত্র, বৈদেশিক চিত্রাদি, ঐতিহাসিক ছবি, মডেল, নিদর্শন প্রভৃতি শিক্ষার্থীরা যেমন আর্ট গ্যালারী করে সুসজ্জিত করতে পারে, তেমনি সংগৃহীত সামগ্রীগুলিকে যাদুঘরের প্রদর্শনীর ন্যায় সজ্জিত করে শিক্ষা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে। এজন্য চাই পৃথক পৃথক কক্ষ। ভারতের সহর, নগর ও দূর পল্লীর সমুদয় বিদ্যালয়ে এরূপ পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে সম্ভব নয়, সুতরাং একখানা সুবৃহৎ কক্ষকে বিভিন্ন কর্ম ও পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

চতুর্থতঃ, আর্ট গ্যালারী, সংগ্রহশালার ন্যায় পাঠাগার (Reading Room), পত্র-পত্রিকার গ্যালারী, ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি সমাজবিদ্যা শিক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার সুবৃহৎ কক্ষের এক একটি অংশ এজন্য যথাযথভাবে নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, সবাক চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র, এপিডায়াস্কোপ ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। সামাজীকৃত পদ্ধতি প্রয়োগ, সিম্পোসিয়াম, বিতর্ক সভা, অবেক্ষণ-পাঠ পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা প্রভৃতির নিমিত্ত পৃথক কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সমাজবিদ্যার পৃথক ও সুবৃহৎ কক্ষেই উক্ত কর্মসূচী পরিচালনা করা যায়।

ষষ্ঠতঃ, পরিবেশ সৃষ্টির মূল উৎস হলেন শিক্ষক। উপযুক্ত ও সার্থক শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে তৈরী হতে হবে। পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পাঠের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। শিক্ষাদানের পূর্বেই শিক্ষোপকরণ সংগ্রহ ও সুসজ্জিত করতে হয়। কারণ এজন্য যদি তাঁকে কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয় তাহালে সীমিত সময় অকারণে নষ্ট হবে ও পরিকল্পিত পাঠ-পরিবেশ আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল (disciplined) হতে পারে না। এসব অসুবিধার জন্য পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট থাকা উচিত। সমাজবিদ্যার কক্ষের একাংশ শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার্থীদের ন্যায় সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কক্ষের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

(ii) **কক্ষ সজ্জা (Equipping a Social Studies Room) :** সামগ্রী সমাজবিদ্যার কক্ষ সজ্জার উপর পরিবেশের গুরুত্ব নির্ভর করে। সংগৃহীত

কক্ষের ভিতর বিক্ষিপ্তভাবে রাখলে পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। সুতরাং সমাজবিদ্যার কক্ষটিকে সুন্দর, পরিপাটি করে সাজান প্রয়োজন। কক্ষটি হবে সাধারণ শ্রেণীকক্ষ অপেক্ষা বৃহৎ আয়তনের। সেখানে শিক্ষার্থীরা যাতে দলগত ও ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহারিক কর্মসূচী ও পাঠ পরিচালনা করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কক্ষের দেওয়ালের তিন দিকে তিনখানি দেওয়াল ব্ল্যাকবোর্ড (wall blackboard) থাকবে। শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সুযোগ থাকাও বাঞ্ছনীয়। পৃথক পর্দা ব্যবহারের অসুবিধা থাকলে সাদা দেওয়ালের একাংশ যথেষ্ট মসৃণ হলে স্থায়ীভাবে ঐ অংশটুকু পর্দার (screen) পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। কক্ষের যেদিকে শিক্ষকের বসবার স্থান নির্দিষ্ট হবে, সেই অংশের দেওয়ালে কয়েকটি দেওয়াল আলমারী তৈরীর উপযুক্ত শেলফ (shelf) রাখা প্রয়োজন। এমনভাবে কক্ষটিকে সুসজ্জিত ও পরিপাটি করতে হবে যেন তা সত্যই আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

আসবাব পত্র ঃ সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের উপযোগী কক্ষটিকে এবার আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত করা প্রয়োজন ; যেন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সংরক্ষিত ও প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা না হয়।

চেয়ার টেবিল ঃ দু-জন শিক্ষার্থীর কর্মোপযোগী টেবিলের পাশাপাশি থাকবে দুখানি চেয়ার। শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযারী ব্যবহার্য চেয়ার ও টেবিলগুলি হালকা ও এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়ায় (movable) উপযোগী হয়।

আলমারী ঃ কয়েকটি আলমারী হবে স্থানান্তর যোগ্য (movable), যেন এগুলি সহজে এদিক ওদিকে সরিয়ে নেওয়া যায়। পাঠাগারের প্রয়োজন ও দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য এগুলি ব্যবহৃত হবে। যদি শিক্ষকের আসনের নিকটবর্তী দেওয়ালে তাক (shelves) থাকে, তবে সেগুলিকে আলমারীতে রূপান্তরিত করে তাতে মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আলমারীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য কয়েকটি কাঠের বা ষ্টীলের তাক (shelve) রাখাও যুক্তিসঙ্গত। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখবার জন্য এগুলির ব্যবহার সহজসাধ্য।

ম্যাপর্যাক ও ষ্ট্যাণ্ড ঃ ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য র্যাক বা তাক (rack) ব্যবহার করা যায় ; আবার মানচিত্র ধারক দণ্ডও (stand) ব্যবহার করা চলে। মূল্যবান মানচিত্রাদি সংরক্ষণের জন্য বৃহদায়তনের আলমারী (র্যাক বিশিষ্ট) ব্যবহার করা প্রয়োজন।

বুলেটিন বোর্ড (Bulletin Board) : পত্র-পত্রিকা পাঠ ও সংরক্ষণের জন্য কক্ষের পিছনের অংশ বরাবর বুলেটিন বোর্ড রাখতে হবে, যেন নানা প্রকারের পত্র-পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে রাখা যায়। দৈনিক সংবাদ-পত্র পাঠের জন্য নিউজ পেপার ষ্ট্যাণ্ড-ও অতি প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা অনেকেই এক সঙ্গে একই বিষয় পত্রিকা থেকে পাঠ করতে পারে।

কক্ষের কোন্ কোন্ অংশে ঐ সকল আসবাবপত্রগুলিকে রাখা হবে তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পাঠদান ও পাঠগ্রহণের সুবিধার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলি সুসজ্জিত করাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট ডেস্ক (Desk) ও চেয়ার যেন ঘূর্ণনশীল (movable) হয়; কারণ তাঁকে ঐ একইস্থানে বসে পরিচালক (administrator) ও শিক্ষক (instructor) উভয়ের কাজ করতে হবে। ডেস্কটি শিক্ষকের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত থাকবে। মানচিত্র-পুস্তিকা, অভিধান, মেমোরেণ্ডাম প্যাড, চোষ কাগজ, কলিং বেল-সুইচ, কলমদানী, ক্যালেণ্ডার, কাগজচাপা (Paper weight) প্রভৃতি জিনিসগুলি শিক্ষকের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে একান্ত অত্যাবশ্যক।

পূর্বোক্ত আসবাবপত্রগুলির কোন্‌টিতে কি সংরক্ষণ করা উচিত তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

সহায়ক ও সমপর্যায়ের পুস্তক-পুস্তিকা (Reference and Collateral Books) : সমাজবিদ্যার জন্য প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী—সমাজবিদ্যার কক্ষে স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। তাহলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রয়োজন মত এই কক্ষকেই পাঠাগার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। কয়েকটি আলমারী সহায়ক ও সমপর্যায়ভুক্ত পুস্তকাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। ভাল ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটক, ছবির বই এর প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে অধিক। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যময় দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন সমাজ জীবনের দৃষ্টান্ত জানতে ও অনুধাবন করতে পারবে। মাতৃ-ভাষায় লিখিত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌর ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, জীবনী, আত্মজীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, অভিযাত্রীদের ইতিহাস প্রভৃতি সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা সমাজবিদ্যার লাইব্রেরীর জন্য রাখা প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের দায়িত্বে এই লাইব্রেরী ও পাঠাগার (Library and Reading Room) পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের

পাঠোপযোগী উচ্চতর বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদিও এই লাইব্রেরীতে রাখা একান্ত দরকার।

ছোট আকারের চার্ট, মডেল, এ্যালবাম, সার্ভে-যন্ত্রপাতি, শ্রবন-দর্শন সহায়ক উপকরণ ও বিভিন্ন প্রকারের প্রজেক্টর প্রভৃতি এবং সংগ্রহশালার দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য পৃথক আলমারী ও দেওয়াল আলমারী ব্যবহার করা উচিত। কক্ষের একাংশে প্রদর্শনীর জন্য আর্ট গ্যালারী স্থাপন করা যায়। বছরে একবার বা দুবার মাত্র ব্যবহৃত হয় এমন সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য সমাজবিদ্যার কক্ষের পাশাপাশি একখানি সংরক্ষণ কক্ষ (Stock Room) থাকা প্রয়োজন। প্রদর্শনীর সময় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দ্রব্যাদি এই সংরক্ষণ কক্ষে জমা রাখা যায়।

সমাজবিদ্যার কক্ষ সজ্জার সময় মনে রাখতে হবে, কক্ষাভ্যন্তরে যেন আলো-বাতাস ও স্থানের অভাব না থাকে। পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আসবে প্রেরণা, আর এই প্রেরণা দেবে কর্মে উদ্দীপনা,—এই উদ্দীপনা শিক্ষাকর্মকে সজীব ও সার্থক করে তুলবে।

(খ) **সমাজীকৃত পাঠচর্চা (Socialised recitation) :** এ সম্বন্ধে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বলে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(গ) **অবেক্ষণ বিদ্যাভ্যাস (Supervised Study) : (i) অবেক্ষণ পাঠ বা বিদ্যাভ্যাস কি (What is Supervised Study) :** সমাজবিদ্যার কক্ষে বা পাঠাগারে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে ; এরূপ পাঠ-পরিচালনাকে অবেক্ষণ বা তদারকী বিদ্যাভ্যাস বলা হয়। আর্থার বাইনিং (*Arther C. Bining*) এবং ডেভিড বাইনিং (*David H. Bining*) বলেন, তদারকী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা আমরা বুঝি যে, শিক্ষার্থীরা তাদের টেবিল বা ডেস্কে শিক্ষাকার্যে রত থাকলে শিক্ষক উক্ত কাজের তদারক করবেন। এরূপ পাঠ পরিচালনায় শিক্ষক পূর্বেই শিক্ষার্থীদের কর্মসূচী তৈরী করে দেন। সেই অনুসারে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাভ্যাস করতে থাকে। কোন জটিল বা কঠিন সমস্যায় শিক্ষক তাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। ফলে, কর্মরত শিক্ষার্থীদের সাথে থেকে শিক্ষককে ঘুরে ঘুরে তদারক করতে হয় ; তাদের পাঠচর্চা বা নির্দিষ্ট কর্ম ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কি না লক্ষ্য রাখতে হয়। সঠিক পথে পাঠ

পরিচালনার জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হয়। ম্যাক্সওয়েল (*Maxwell*) এবং কিল্‌জার (*Kilzer*) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে অবেক্ষণ পাঠ-পরিচালনা হল শিক্ষার্থীর নীরব পাঠ আর বীক্ষণাগারে অনুশীলনাদির সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও ফলপ্রসূ নির্দেশ।[1]

এই অবেক্ষণ পাঠচর্চা বা তদারকী বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত প্রাথমিক প্রয়োজন হল—সমাজবিদ্যার কক্ষ বা প্রয়োগশালা (Laboratory)। এরূপ কক্ষে থাকবে শিক্ষার্থীদের বসবার চেয়ার ও কাজ করবার টেবিল। কক্ষের একাংশে থাকবে পাঠাগার, এই পাঠাগার থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাচর্চার সুযোগ পাবে। শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট বিষয় পাঠক্রম হিসেবে নির্দিষ্ট করতে অথবা একটি মূল বিষয়কে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে এক-একটি দলের উপর এক একটি অংশের সমাধানের ভার অর্পণ করতে পারেন। বিষয় বস্তুর সংখ্যা অনুসারে শিক্ষার্থীদের দলের সংখ্যা পূর্বনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন, কেননা পরে সকল দলের কার্যাবলীকে একত্রে পর্যালোচনা করবার জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। সমাজবিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ থাকলেই এরূপ পাঠ-পরিচালনা সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

(ii) **উপযোগিতা (Utility)**: তদারকী পাঠ পরিচালনা শিক্ষদানের এক অপূর্ব কৌশল বা রীতি (Device)। সমাজবিদ্যা পাঠদানের জন্য এই রীতি অতি চমৎকার ফলপ্রদ। এই রীতি প্রয়োগের ফলে নিম্নোক্ত সুফল আশা করা যায়:

(ক) প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীরা অতি পরিচিত, সর্বজন বিদিত গ্রন্থানুসায়ী পদ্ধতি, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতি পদ্ধতির একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

(খ) শিক্ষক এই রীতিতে বহুলাংশে প্রকল্প, সমস্যা, ইউনিট প্রভৃতি পদ্ধতির সামগ্রিক প্রয়োগকে সম্ভব করে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও কর্ম প্রবণতার সঙ্গে শিক্ষকের তদারকী যুক্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ পাঠচর্চার পথ সুগম হয়ে ওঠে।

(গ) এই রীতি বা কৌশলে (Device) শিক্ষককে শিক্ষার্থীর অতি সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। ফলে তিনি শুধু শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও বিশুদ্ধ

1. "Supervised study is [illegible] effective direction and oversight of the silent study and laboratory a[illegible]vities of pupils."

পাঠ-পরিচালনা করতে পারেন তা নয়, বরং তিনি শিক্ষার্থীর অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, মন-মেজাজ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং সেভাবে শিক্ষার্থীর বিদ্যাভ্যাসে নির্দেশ দিতে সক্ষম হন।

(ঘ) এই প্রণালীতে শিক্ষক ব্যক্তি বৈষম্যনীতি অনুসারে পাঠ-পরিচালনা করতে পারেন। ফলে স্বল্পমেধা, পিছিয়েপড়া (backward) শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের সহায়তায় উন্নতমেধা (talented) শিক্ষার্থীদের মত পাঠগ্রহণে ও ব্যক্তিগত গুণ বিকাশে সমর্থ হয়। শিক্ষকও পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে তার মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেন। নিরাশা, হতাশা ইত্যাদি অনেক ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে পাঠ পরিত্যাগ করতে বা কু-কর্মে লিপ্ত করতে প্ররোচিত করে। অথচ তদারকী পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক এই সব শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সমর্থ হন।

(ঙ) প্রয়োগশালায় বা সমাজবিদ্যার কক্ষে পাঠরত শিক্ষার্থীরা বাধা-বিঘ্ন বা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন হয়। শিক্ষক সে সাহায্য নিজেই করতে পারেন বা অগ্রসর ছাত্রকে (advanced student) তার বন্ধুর সাহায্যার্থে নির্দেশ দিতে পারেন। এভাবেই শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক উপায়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে পারস্পরিক সুবিধা অসুবিধার কথা অনুভব করতে পারে। সহানুভূতিমূলক গুণ-বিকাশে এই তদারকী প্রথা যথেষ্ট ফলপ্রসূ সন্দেহ নেই।

(চ) তদারকী পাঠচর্চায় শিক্ষার্থী পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা পাঠে অভ্যস্ত হয় এবং এর দ্বারা এমন দক্ষতা তারা অর্জন করে যে, বিষয়বস্তুর কোন্ অংশ কোথায় সঠিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, কোন্ পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা নির্বাচন করা তাদের কাছে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

(ছ) তদারকী পাঠাভ্যাস শিক্ষার্থীকে অধিক চিন্তাশীল, সমালোচক ও সুষ্ঠু নির্বাচনক্ষম করে তোলে। ফলে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় অভ্যাস, ক্ষমতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রভৃতি গুণার্জন করে নিজেদের শুধু শিক্ষা নহে, বাস্তব জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে তোলে। শিক্ষার্থীরা যে-কোন বিষয়ের মূল্যায়ণ, নির্বাচন ও প্রয়োগে দক্ষ হয়ে যথার্থ যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে শেখে।

(জ) তদারকী পাঠ-পরিচালনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। পরস্পর পরস্পরকে নিকট সান্নিধ্যে পেতে পারে; ফলে পারস্পরিক বোঝা-পড়ার সুস্পষ্টতায় সম্পর্ক যেমন মধুর হয়, তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রভাবে বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। আর শিক্ষা হয়ে ওঠে জীবন্ত ও সুন্দর। শিক্ষক তাঁর সাফল্যের প্রতিদানে পেয়ে থাকেন অনাবিল আনন্দ, সেবা ও ত্যাগের প্রেরণা। এগুলিই সুশিক্ষকের প্রকৃত প্রাপ্য।

(iii) **ত্রুটি সংশোধন (How to eliminate demerits of supervised study) ঃ** তদারকী পাঠ-চর্চার (Supervised Study) যথেষ্ট উপযোগিতা থাকলেও কয়েকটি ত্রুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, অনেকে বলেন, এই প্রণালী (device) স্বল্প মেধা ও অনগ্রসর ছাত্রের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হলেও তাদের উন্নতি লাভের পক্ষে এ পদ্ধতি খুব সহায়ক নয়। কিন্তু অগ্রসর ছাত্রদের জন্য পৃথক কর্মসূচী নির্ধারণ করলে এই ত্রুটি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে, এই কৌশল প্রয়োগ যথেষ্ট ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ। আমাদের দেশের অর্থ সঙ্কট শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। জনসাধারণ ও সরকারের যুগ্ম চেষ্টা ব্যতীত এ বাধা দূর হতে পারে না। এই বাধা প্রথা বা কৌশলের নিজস্ব ত্রুটি নয়। সমাজবিদ্যার জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা থাকলে ধীরে ধীরে তাকে সুসজ্জিত করা সম্ভব হবে। সরকার ও জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এই ব্যয় বাহুল্য আর ত্রুটি হিসেবে গণ্য হবে না। এই প্রণালী প্রয়োগে সময় যথেষ্ট লাগলেও উপযোগিতা যখন আছে তখন সাধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে তদারকী পাঠ-চর্চার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত।

ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব খানিকটা সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর থাকলেও শিক্ষকের যোগ্যতা এই ত্রুটি অনেকখানি দূর করতে পারে। এজন্য শিক্ষককে হতে হবে কৌশলী ও দক্ষ পরিচালক। সময় ও সুযোগ অনুসারে কৌশল প্রয়োগ করলে তিনি নিজে, ছাত্রসমাজ এবং দেশবাসী প্রকৃতই উপকৃত হবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা পুনর্গঠনের সব কিছু নির্ভর করছে সুশিক্ষকের উপর। সরকার ও জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় শিক্ষকই আনতে পারেন শিক্ষায় সজীবতা, শৃঙ্খলা ও সার্থকতা।

(ঘ) **রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ (Histrionic atmosphere):** নাটক অভিনয়, আবৃত্তি, দৃশ্যাভিনয়, নির্বাক অভিনয় ও রূপসৃষ্টি, অনুকরণ ও অভিনয়, ছায়াভিনয়, নকল রূপসৃষ্টি প্রভৃতি মঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। সর্বপ্রকার অভিনয়ের জন্য আমাদের দেশে উপযুক্ত পুস্তকাদির যথেষ্ট অভাব আছে। এই অভাব পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষককে। চিন্তাশীল, দক্ষ সুশিক্ষক সমাজবিদ্যার বিভিন্ন অংশকে শিক্ষার্থীদের দ্বারা অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করতে পারেন। অতীত ও অজ্ঞাত বিষয়কে মঞ্চ পরিবেশে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে সুস্পষ্ট, মনোরম ও জীবন্ত। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সঙ্কোচ, শৈথিল্য ভুলে নিজেদের প্রকাশ করতে শিখবে। সমাজবিদ্যার অতীত ও অজ্ঞাত বিমূর্ত বিষয়াদি সুস্পষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘকাল বিষয়বস্তু স্মরণ করে রাখতে সমর্থ হয়। তবে বিদ্যালয়ে পুনঃ পুনঃ রঙ্গমঞ্চ পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত নয়। বিদ্যালয়ের প্রচলিত কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে অভিনয়ের আয়োজন করাই বাঞ্ছনীয়। সমাজবিদ্যার কক্ষ রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান। প্রতিফলিত ছবির জন্য নির্দিষ্ট পর্দার সম্মুখ ভাগে মঞ্চ তৈরীর স্থান নির্ধারিত হলে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

(ঙ) **শিক্ষা প্রদর্শনী (Exhibition):** সমাজবিদ্যা-কক্ষে (Social Studies Room) শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হচ্ছে শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করা। সংগ্রহশালার স্থায়ী প্রদর্শনী ছাড়া বৎসরান্তে একবার বহু বিষয়ক শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাধারা যে সামগ্রিক ও অখণ্ড তার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে এই প্রদর্শনীতে। এটা যেন বৈচিত্র্যময় বিদ্যালয় জীবনের একক প্রকাশ। সারা বছর শিক্ষার্থীরা যে-সব প্রকল্প (Project) ও সমস্যার সমাধান করল বা সম্মুখীন হল তার সর্বাত্মক প্রকাশ হবে এই প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে শিক্ষকের সাহচার্যে শিক্ষার্থীদের স্বহস্তে তৈরী মডেল, চার্ট, নক্সা, নিদর্শনাদি, তাদের সংগৃহীত শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী, লিখিত বিবরণী, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রদর্শনীটি হবে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা, দক্ষতা, কৌশল, কর্মক্ষমতা, সংগঠনী শক্তির পরিচায়ক। অনগ্রসর, স্বল্প মেধা, দুর্বল প্রভৃতি সকল প্রকার শিক্ষার্থী এতে অংশ গ্রহণ করবে। সারা বছরের কাজকর্ম ছাড়াও প্রদর্শনী, সাজসজ্জা, দর্শকদের আদর-আপ্যায়ন

প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থী সমাজে উপযুক্ত নাগরিক হবার প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হবে।

(চ) সমাজ কর্মীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন (Social worker's visit to school)ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অঞ্চল প্রক্রিমা, শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী-সংগ্রহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করার প্রধান প্রতিবন্ধক হল বিদ্যালয়ের আর্থিক অসঙ্গতি। কিন্তু এ আর্থিক অসুবিধার কথা স্বীকার করেও স্বল্প ব্যয়ে আমরা বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। অর্থ ও সময়ের অভাবে যে-সব অঞ্চল পরিদর্শন করার সৌভাগ্য হয় না, সেখান থেকে কর্মীদের আমন্ত্রণ করে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, হরিণঘাটার ডেয়ারী ফার্ম থেকে কোন কর্মীকে নিমন্ত্রণ করলাম। তিনি ঐ ফার্মের পরিচালনা, উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে বিবৃতি দিলেন। পুস্তকে লিখিত বিবরণ অপেক্ষা এই বিবৃতি যথেষ্ট সুস্পষ্ট ও চিত্রময় হয়ে উঠবে, কারণ বক্তা স্বয়ং ফার্মের কর্মী, তাঁর শিক্ষা ও দক্ষতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে বক্তৃতার মাধ্যমে। এমনকি, ফার্মের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত নানা প্রকার চিত্র, নক্সা ও মডেলের সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারবেন। এমনিভাবে ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তা, কৃষি পরিচালক, বড় বড় কারখানার পরিচালক, শিল্পপতি, কুটিরশিল্প পরিচালক খনি অঞ্চলের কর্মী, গ্রামবাংলার কৃষি অঞ্চলের মুখপাত্র প্রভৃতিকে বিভিন্ন সময়ে আমন্ত্রণ করে বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার কক্ষে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা যায়।

তাছাড়া, বিশাল ও বিচিত্র এই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করে তাদের নিজ নিজ অঞ্চল, নগর ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করা যায়। ভারতে বহু বিদেশী ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা আসেন। তাঁদের বক্তৃতা আমরা শুনতে পারি। সমাজবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসব বক্তৃতা শ্রবণ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া এ ব্যবস্থা গ্রহণের নিম্নরূপ সুবিধাও আছে।

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পায়।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং আরো বেশী জানবার ও শিখবার জন্য তারা আগ্রহী হয়ে উঠে।

তৃতীয়তঃ, পুস্তকে লিখিত বিষয়ের সঙ্গে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সুস্পষ্ট বিবৃতি সমাজবিদ্যার শিক্ষাকে জীবন্ত করে তুলতে পারে।

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন সমাজকর্মী ও নেতার সংস্পর্শে এসে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা নিজেদের ধন্য মনে করে। এর দ্বারা তাদের মনের সঙ্কোচ ও শৈথিল্য বিদূরিত হয়। অনেকে গুণীজনের প্রভাবে স্ব-স্ব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার শিক্ষার্থীরা সঙ্কল্প গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। এ সঙ্গে সুশিক্ষকের পরিচালন কৌশলের সহায়তা পেলে শিক্ষার্থীরা সত্যই সার্থক শিক্ষার পথে অগ্রসর হতে পারে।

(ছ) গ্রন্থাগার (Library) : "লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে"। —রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে গ্রন্থাগারের সার্থকতা বিশ্লেষিত। সত্যই লাইব্রেরীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে অতীতের ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। বাহ্যতঃ স্তব্ধ হলেও এই সম্পদ প্রেরণাময়, জীবন্ত ও গতিশীল। এই গ্রন্থাগার আধুনিক শিক্ষার্থীকে ভাবীকালের জন্য দিচ্ছে প্রেরণা, ক্রিয়াশীল জীবন, হৃদয়ের মুখর স্পন্দন। পায়ার্স (*E. A. Pires*) এর ভাষায় বলা যায় [1], "গ্রন্থাগার হল কোন সার্থক বিদ্যায়তনের জ্ঞানদীপ্ত স্নায়ু কেন্দ্র, এর শিক্ষাভিত্তিক জীবন ধারার প্রাণশক্তি। এ শক্তি শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত করে, আর তাদের প্রাণে জাগিয়ে তোলে অকপট গ্রন্থপ্রীতি।" আজ একথা সর্ববাদীসম্মত যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যদি শিক্ষাদপ্তর ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভারতের ভাবীনাগরিককে মানুষ করে গড়ে তুলতে চান, যদি শিক্ষাপুনর্গঠনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপ দিতে চান, যদি তাঁরা চান যে আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশের উপযুক্ত সুনাগরিক হয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করুক, তাহলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার স্থাপন একান্ত অপরিহার্য।

সমাজবিদ্যা শিক্ষার কৌশল (Device) হিসেবে গ্রন্থাগারের উপকারিতা সবিস্তারে বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। সমাজবিদ্যা উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে সর্বাধুনিক

1. "The library is the intellectual nerve centre of a good school, the hub of its academic life, inspiring students to read and cultivating in them a sincere love of books."—E. A. Pires

পাঠ্য বিষয়। এই বিষয়টির এমন কোন পুস্তক নেই, যার মধ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সবিস্তারে লিপিবদ্ধ থাকতে পারে। সুতরাং প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যার্থে সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা বা সমপর্যায়ের মূল গ্রন্থাদির বিশেষ প্রয়োজন। একমাত্র পাঠাগারের সুবিধাই শিক্ষার্থীকে এই সুযোগ দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যা এমনই একটা বিশেষ বিষয় যার মাধ্যমে 'গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষার' (Edacation for democracy) বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। শিক্ষায় গণতন্ত্র (Democracy in education) যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে। এই গণতান্ত্রিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষকের পরোক্ষে অবস্থান, আর শিক্ষার্থীর স্বাধীন ও সক্রিয় প্রচেষ্টা। পাঠাগার সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তাই এস. কে. কোচ্‌ছার ((*S. K. Kochhar*)[1] বলেন, শিক্ষায় গণতন্ত্র আর গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা—এ দুয়ের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যম হল গ্রন্থাগার।

তৃতীয়তঃ, পাঠাগার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ গুণের বিকাশ সাধিত হয়। পুস্তক নির্বাচন, সমস্যার সমাধান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা, বিষয় বস্তু সমালোচনা, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি ক্ষমতা ও কৌশল শিক্ষার্থী সহজে অর্জন করতে পারে। আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস শিক্ষার্থীকে এমন স্তরে উন্নীত করে দেয় যে, সে স্বীয় ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করে বাস্তব যে-কোন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীকে এই অপূর্ব সুযোগ দিতে পারে।

*(ii) **গ্রন্থাগারের ব্যবহার : (How to utilize Library)** সাধারণ ভাবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির কাছে অপরিসীম। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীও তা থেকে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। তা সত্ত্বেও সমাজবিদ্যার প্রয়োজনে অর্থাৎ এই বিষয়টির পরিপূরক বা সম্পূরক হিসেবে

---

1. "Library is the agency for experimentation in this 'education for democracy' and 'democracy in education'."—The teaching of social studies by S. K. Kochhar, P. 81

* "The importance of cultivating the habits of general reading, of reducing the stress placed on text-books and making increasing use of the Library as a repository of reference book, standard book, and books of general interest." —Secondary Commission Report (1952-53)

পাঠাগারের উপযোগিতা অসীম। সুতরাং সমাজবিদ্যার শিক্ষককে অংশতঃ গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব নিতে হবে। যদি বিদ্যালয়ের সাধারণ গ্রন্থাগারে সমাজ-বিদ্যার প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংরক্ষিত থাকে, তবে শিক্ষককে পঠন- পাঠন ছাড়াও অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সময় মত নির্বাচিত পুস্তকাদি সরবরাহের জন্য গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ, পুস্তক নির্বাচন প্রভৃতি করতে হবে।

সমাজবিদ্যার জন্য পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট থাকলে সমাজবিদ্যার গ্রন্থাগার ঐ কক্ষের একাংশে স্থাপন করাই যুক্তিসংগত। কারণ একই কক্ষে শিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্য শিক্ষক সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকতে পারেন। তদারকী পাঠচর্চা (Suprvised study), সমজীকৃত শিক্ষণ (Socialised recitation), সমস্যা পদ্ধতি প্রয়োগ (Problem method), প্রদর্শনী-ব্যবস্থা প্রভৃতি শিক্ষাদানের যে-কোন কৌশল (Device) বা পদ্ধতি (method) প্রয়োগের সময় সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকার প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সমাজবিদ্যার কক্ষে পাঠাগার স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত।[1] এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই সময়ের অপচয় ঘটে না এবং শিক্ষাকর্ম পরিচালনা সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে।

(জ) **সংগ্রহশালা (Museum) :** গ্রীকদিগের সঙ্গীত ও কাব্যের অন্যতম দেবী Muse-এর মন্দিরের কথা কল্পনা করলে সাধনার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। মিউজিয়াম সত্যই মিউজ-এর মন্দির, শিক্ষা ও সাধনার পীঠস্থান। পৃথিবীর সভ্য রাষ্ট্রগুলি এই মিউজিয়ামের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে, এবং এজন্যই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছে মিউজিয়াম বা সংগ্রহ শালা। সংগ্রহশালা আবাল বৃদ্ধ বনিতার শিক্ষালয় হিসেবে পরিগণিত। দেশ, প্রদেশ, অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয় এই সংগ্রহশালায়। একে স্থায়ী প্রদর্শনী বলা চলে। "এই সংগ্রহশালা হল জ্ঞান ও ঐতিহ্যের নিদর্শন। জনগণের সেবায় সে উৎসর্গীকৃত। পণ্ডিতদের কাছে 'মিউজিয়াম' হল বিদ্যানুশীলন ও গবেষণার জন্য জ্ঞান-ঋদ্ধ কোষাগার, শিক্ষাবিদ আর শিক্ষকদের নিকট মূর্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদির ভাণ্ডার—যা শিক্ষাদান কর্মকে বাস্তব রূপায়ণে এগিয়ে দেয়। শিশুদের কাছে এটি বিস্ময় ও

1. "There are certain areas of desirable knowledge which are beyond the realm of direct experience. Library facilities, therefore, are essential the understanding of social studies." V. R. Teneja.

কৌতূহলউদ্দীপক আলোক রশ্মি, আর সাধারণ মানুষের কাছে আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও জ্ঞানের উৎস।"[1]

পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষায় উন্নত দেশ এই সংগ্রহশালাকে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বার্থে নিয়োগ করেছে। সাধারণ গ্রন্থাগাররূপে কানাডা সরকার সংগ্রহশালার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন জনশিক্ষা ও সেবায়।

ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে বিদ্যালয় পাঠক্রমের সঙ্গে সংগ্রহশালা শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ হিসেবে গৃহীত। সুইডেনের সংগ্রহশালার সঙ্গে পাঠক্রমের এমন যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে যে, দক্ষ মিউজিয়াম পরিচালক ও বক্তা শিক্ষার্থীদের রুটিন-মাফিক শিক্ষাসহায়তায় বাধ্য থাকেন। আজকাল পৃথিবীর বহুদেশ এই প্রথা অনুকরণ করতে চলেছে। সুখের বিষয় ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ প্রদর্শক ও সুদক্ষ বক্তা নিয়োগ করে পরিদর্শকদের বোঝাবার ও শিখবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সুদূর পল্লীর শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ থেকে আজও বঞ্চিত। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীরা যাতে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার-জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সরকারের সতত সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা (School Museum) : সমাজবিদ্যা শিক্ষার পরিপূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার কক্ষের একাংশে সংগ্রহশালার আয়োজন করা দুঃসাধ্য নহে। কক্ষে একাংশে আর্টগ্যালারী স্থাপন করে সেখানে সংগৃহীত সামগ্রী ধারাবাহিকভাবে সুসজ্জিত করা যায়। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও অঞ্চল পরিদর্শনের সময় নানাপ্রকার নক্সা, ছবি, মডেল প্রভৃতি নিদর্শন, শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করতে পারে; শিক্ষকের সাহচর্যে তারা স্বহস্তে বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ তৈরী ও অঙ্কন করতে পারে, আঞ্চলিক হাট-বাজার, মেলা উৎসব ও প্রদর্শনী থেকে বহু সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে; এগুলিকে কক্ষের সংগ্রহশালায় সুসজ্জিত করা মোটেই কঠিন সমস্যা নহে। বছরের পর

1. "For the scholar they represent repositories of the objects for study and research; for the educationist and the teacher they are a store-house of concrete and vivid adjuncts which lend colour and reality to all forms of teaching; for the child, the spark which can ignite, wonder and curiosity; for the ordinary citizen, they are a source of pleasure, delight and knowledge."

বছর শিক্ষার্থীরা এইভাবে স্ব-স্ব অবদান রেখে গেলে, বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা রাষ্ট্র বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সংগ্রহশালা অপেক্ষা কোন অংশে কম মূল্যবান হতে পারে না। এদিক দিয়ে বিদ্যালয় সংগ্রহশালার উপযোগিতা নিতান্ত কম নয়। এক্ষণে সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা আমরা নিম্নে বিবৃত করছি ঃ

প্রথমতঃ, নতুন বছরের নতুন শিক্ষার্থীদের নিকট এই সংগ্রহশালা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যে, তারা নতুন উদ্যম, উৎসাহ নিয়ে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠনে রত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সময় শিক্ষকও এই কক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করে পুঁথিগত বিদ্যা ও বক্তৃতাকে জীবন্ত, সুস্পষ্ট ও বাস্তবানুগ করে তুলতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদর্শনী উপলক্ষে এই সকল সংগৃহীত বিষয় হবে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় বস্তু।

চতুর্থতঃ, স্থায়ী প্রদর্শনী হিসেবে এই সংগ্রহশালা শিক্ষার্থীর নিকট হবে চির আনন্দদায়ক, গতিশীল পরিবেশ সৃষ্টিকারী শিক্ষোপকরণ।

(ঝ) আঞ্চলিক মেলা, উৎসব ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি (Local Fairs, Festivals and celeberation of National days etc.) ঃ সমাজীকরণের অন্যতম উপায় হল বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সমাজ-পরিবেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা। এই প্রণালী সমাজবিদ্যার শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। এই নীতি অনুসারে আঞ্চলিক মেলা ও উৎসবে যোগদান করা সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মেলা-উৎসবাদি শিক্ষায় শ্রবণ-দর্শন সহায়ক পরিবেশ হিসেবে গৃহীত। আমাদের দেশে গঙ্গাসাগর মেলা, শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, বিভিন্ন অঞ্চলের চড়ক মেলা, বীরভূমের জয়দেব মেলা প্রভৃতির ন্যায় আরও ছোট-বড় নানা প্রকার মেলা ও উৎসব বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীরা এইসব মেলায় যোগদান করে বহু বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, স্থানীয় উৎপাদন, ক্রয়বিক্রয়, উৎসবের আয়োজন ও অনুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখতে যেমন পায়, তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তারা বহু বিষয় জানবার সুযোগ লাভ করতে পারে। ফলে তাদের সমাজবিদ্যার জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়।

মেলা ও অনুরূপ উৎসবে যোগদান করলে সকলেই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে সত্য, কিন্তু মেলা ও উৎসব পরিদর্শনকে যদি শিক্ষামূলক করার প্রয়োজন হয় তাহলে পূর্ব পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও অঞ্চল পরিদর্শনের অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু দেখে ও শোনে, অনেক আনন্দ উপভোগ করে, কিন্তু তারা ফিরে আসে দেহে ও মনে ক্লান্তি নিয়ে।

মেলা ছাড়া আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছুটি উপভোগ করে। পৌষ পার্বণ, শ্রীপঞ্চমী, অন্নপূর্ণা পূজা, দোলযাত্রা উৎসব, চড়কপূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজার সঙ্গে আরও অনেক পূজা-পার্বন, ইদুজ্জোহা, সবে-বরাত, বড়দিন প্রভৃতি উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। ছুটির পূর্বেই শিক্ষার্থী মহলে এসব ধর্মীয় উৎসবগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান পালন করা প্রয়োজন। তা ছাড়া, বর্তমানে বেতার মারফৎ উৎসব দিনে উৎসবের কারণ ও বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়, এগুলি শিক্ষার্থী যদি শোনে ও এসব বিষয়ে লিখিত রচনা শিক্ষকের নিকট পেশ করে, তবে শিক্ষার্থীর নিকট উৎসব উদ্‌যাপন সার্থক হয়ে উঠবে।

এ ছাড়া আমরা জাতীয় কর্তব্য হিসেবে রাষ্ট্র ঘোষিত কতকগুলি উৎসব পালন করি ; যেমন—স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী, গান্ধীজয়ন্তী, নেতাজী-জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, নেহেরুজীর তিরোধান দিবস, শিক্ষক দিবস প্রভৃতি। এ ছাড়াও আমরা দেশের বিভিন্ন মনীষীর জন্ম দিবস, জন্ম শতবার্ষিকী প্রভৃতি পালন করি। এইসব উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি যাতে বিদ্যালয়ে যথার্থভাবে পালিত হয় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সমাজজীবনের সঙ্গে এই সকল উৎসব অনুষ্ঠানের সম্পর্ক নিবিড়। সুতরাং সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থী যদি উক্ত উৎসব-আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সমাজ-শিক্ষা ব্যাহত হবে। সমাজ-শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে উৎসবাদির উপযোগিতা অপরিসীম।

(ঞ) সমাজবিদ্যার ক্লাব (Social Studies Club) : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঠিত বিষয়গুলির মধ্যে সমাজবিদ্যা শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে একটি কথা বলা যায় যে, বিষয়টি শিক্ষার্থীকে সুসমঞ্জস সামাজিক মানুষ রূপে গড়ে তোলার সহায়ক। বিষয়টি একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অনুভূতি বিকাশে সাহায্য করে তেমনি তার কৌশল, দক্ষতা, সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের

উপযোগী উপায় নির্ধারণ করে। তত্ত্বগত অংশের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহারিক অংশ যুক্ত হওয়ায় বিষয়টির শিক্ষাগত মূল্য (Educative value) বৃদ্ধি পেয়েছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক্ষণে এই শিক্ষাগত মূল্যের সঠিক রূপায়ণের (Effective implementation) জন্য প্রয়োজন হল উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির প্রয়োগ। সমাজবিদ্যার ক্লাব এরূপ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সমাজবিদ্যার ক্লাব হল শিক্ষকের পরিচালনায় সমাজ-বিদ্যার শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরাই সক্রিয়ভাবে শিক্ষকের নির্দেশে পরিচালিত হয়। ফলে শিক্ষাকর্ম হয় সরস, সজীব ও প্রেরণাদায়ক।

সংগঠন ও কার্যাবলী (Organisation & Functions) : বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সমাজবিদ্যার ক্লাব সংগঠিত হতে পারে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক ক্লাব গঠন করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনও গড়ে তোলা হয়। শ্রেণী পাঠন ও ব্যবহারিক ক্রিয়াদির জন্য প্রতিটি শ্রেণীর ক্লাবই দায়িত্ব পালন করে। গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার উন্নয়ন, প্রদর্শনী পরিচালন, মডেল সংগ্রহ, ক্ষেত্র পরিদর্শন, দেওয়াল পত্রিকা পরিচালন প্রভৃতি সাধারণ বিষয়াদির জন্য ক্লাবের কেন্দ্রীয় সংগঠন দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে সর্বক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার শিক্ষকই প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় সমাজবিদ্যার ক্লাব পরিচালনায় তৎপর হন। ক্লাবের জন্য পৃথক কক্ষ বা আসবাব পত্রের প্রয়োজন হয় না। সমাজবিদ্যার কক্ষই (Social Studies Room) ক্লাবের প্রকৃত কর্ম কেন্দ্র।

শিক্ষক মহাশয় সমাজবিদ্যার ক্লাবের মাধ্যমে স্বীয় কর্মকে সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন করতে পারেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে তিনি ক্লাব পরিচালক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রকল্প পদ্ধতি, সমস্যা সূচক পদ্ধতি, একক নির্ধারক পদ্ধতি, সমাজীকৃত পাঠচর্চা, তদারকী পাঠ-পরিচালনা প্রভৃতিকে শৃঙ্খলা ও সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে পারেন। শ্রেণী বহির্ভূত ক্রিয়াদি, যেমন—প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, অভিনয়, বিচিত্রানুষ্ঠান ও খেলাধূলা পরিচালনা, গ্রাম বা অঞ্চল পরিদর্শন এবং বিবরণী লিখন প্রভৃতি শিক্ষাকর্ম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়া বিদ্যালয়ের আরও অনেক প্রয়োজনীয় কার্যাদি সমাজবিদ্যার ক্লাবই সুসম্পন্ন করতে পারে।

এছাড়া সমাজবিদ্যার পত্রিকা (Social Studies Magazine) প্রকাশ ও পরিচালনা এই ক্লাব বা সমিতির বিশেষ কর্তব্য। সমাজবিদ্যার পত্রিকা প্রকাশনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। হাতে লেখা ও ছাপান (Printed)—এ দু'প্রকার পত্রিকা হতে পারে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অঞ্চল পরিদর্শন, মেলা উৎসবে যোগদান করে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা যেন প্রকাশ করতে পারে। তাহলে আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকর্মও সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হবে। এইভাবে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব অঞ্চলের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করতে পারে। এর ফলে দেখা যাবে, শিক্ষকের সুষ্ঠু পরিচালনায় অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের লিখিত বিষয়গুলি জাতির অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীরা পৃথক দেওয়াল পত্রিকা (সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি) যাতে প্রকাশ করতে পারে, তার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই পত্রিকায় দৈনিক সংবাদ পত্রের বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলিকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করার নির্দেশ থাকলে সংবাদপত্র পাঠের দিকে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা জাগবে। পত্রিকা পাঠ ও প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ গুণ ও দক্ষতা যেমন বিকাশিত হবে, তেমনি সমাজবিদ্যার পরিপূরক বিষয় হিসেবে এই প্রকাশিত (ছাপা অথবা হাতে লেখা) পত্রিকাগুলি শিক্ষাসহায়ক হয়ে উঠবে। সুতরাং বিদ্যালয় পরিবেশে এই সমাজবিদ্যার ক্লাব পরিচালনা—শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পারে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপযোগিতা (Utility) : যোগ্য শিক্ষক কর্তৃক সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত সমাজবিদ্যার ক্লাবের উপযোগিতা নিম্নরূপ :

(ক) ক্লাব-সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় শিক্ষক স্বীয় দায়িত্ব পালনে কৃতকার্য হন।

(খ) ক্লাব পরিচালনার তাগিদে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অতি সন্নিকটে আসবার সুযোগ পান এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক তাঁর নির্দেশ (Direction) ও পরিচালনা (Guidance) দ্বারা তাদের সহায়তা করতে সক্ষম হন।

(গ) সমাজবিদ্যার ক্লাব শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ সৃষ্ট পরিবেশে শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত যে কোন পদ্ধতি, কৌশল, উপায় প্রভৃতির শুভ

ফলশ্রুতি শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে। ফলে শিক্ষার্থী একদিকে যেমন বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে তেমনি অন্যদিকে ব্যবহারিক দিক থেকে স্বীয় কৌশল, সামর্থ্য ও অভিরুচির বিকাশ সাধন করতে পারে।

(ঘ) ক্লাব পরিচালনার জন্য সমাজবিদ্যার শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয়। অন্যথায় পঠন-পাঠন ও ব্যবহারিক কার্যসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণ হতে পারে না। শিক্ষকদের সহযোগিতা, প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিচালন কার্যাদির ফলশ্রুতি শিক্ষার্থীদের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

(ঙ) সুসংগঠিত ক্লাবের দ্বারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা (discipline) বজায় থাকে। বিদ্যালয় পরিবেশে পরিচালিত ক্লাবের উপযোগিতা শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে শেখে। পরবর্তী বৃহত্তর সমাজজীবনে এই শৃঙ্খলাবোধের উপযোগিতা অপরিসীম। বিদ্যালয়ের আদর্শে দীক্ষিত শিক্ষার্থীরা যখন সামাজিক অন্যান্য ক্লাবের সংস্পর্শে আসবে তখন সেখানে বাঞ্ছিত সামাজিক কর্ম সম্পাদনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে।

(চ) ক্লাবের সংগঠন ও কর্ম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের ভাবী জীবন পথের পাথেয় হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষকের সতর্কতা (Teacher's Vigilance): সমাজবিদ্যার ক্লাবের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষকের কর্ম ও পরিচালন ক্ষমতার উপর। ক্লাবের সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপন করে তাঁকেই শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, দেশের যুব সমাজ, বিশেষ করে অল্প বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা 'ক্লাব' শব্দটির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষার্থীই কোন না কোন ক্লাবের সভ্য। সহর ও সহরতলী থেকে সুদূর পল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের ক্লাব। ক্লাব আজকাল সমাজ-জীবনের একটা অঙ্গরূপে পরিগণিত। পড়াশুনা, গান-বাজনা, খেলাধুলা, পূজা-পার্বণ, বিবিধ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্লাব দ্বারা পরিচালিত ও অনুষ্ঠিত হয়। সাংসারিক একঘেয়েমী ও নীরস জীবন যাত্রায় ক্লাবগুলি অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য আনয়ন করে। অনেকেই সাংগঠনিক কাজ-কর্মের মাধ্যমে নেতৃত্বের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারেন, আবার অনেকে পড়াশুনা, গান-বাজনা, খেলাধুলা ইত্যাদি এক বা

একাধিক বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেন। ক্লাব-সংগঠন ও তার কার্যাদির মাধ্যমে সমাজ যেমন উপকৃত হয় তেমনি এরা সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধনও করে। নিকটবর্তী বিভিন্ন ক্লাবের ঝগড়া-বিবাদ, সভ্যদের দুর্নীতি, অবাঞ্ছনীয় ক্রিয়াদির প্রশ্রয়, রাজনৈতিক কুটিলতা অনেক ক্লাবকে অসামাজিক ক্রিয়া কর্মের কেন্দ্রস্থল করে তুলেছে। অথচ শিক্ষিত জন সমাজে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় প্রভৃতি সকলেরই নিকট ক্লাবের সভ্যভুক্ত হতে, ক্লাবের বিবিধ বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে, আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। এ ধরণের আগ্রহ শিক্ষার্থীদেরকেও উদ্বেলিত করে তোলে। সুতরাং শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে, শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের আদর্শ যেন সমাজজীবনের ক্লাব ও অন্যান্য সংগঠনে প্রতিফলিত হয়। সমাজবিদ্যার ক্লাব যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে শিক্ষার্থীরা সেটাকেই জীবনপথের পাথেয় করে তুলবে। শিক্ষককেই লক্ষ্য রাখতে হবে সমাজবিদ্যার ক্লাব যেন হিংসা-দ্বেষ, বাদ-বিসম্বাদ, অবাঞ্ছিত ক্রিয়াদির কেন্দ্র না হয়ে বাঞ্ছনীয় গুণ ও বুদ্ধি সম্পন্ন সু-নাগরিক ও সু-সামাজিক মানুষ তৈরীর পীঠস্থান হয়ে ওঠে।

নবম অধ্যায়

সমাজবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক

(Social Studies Text Book)

১। ভূমিকা (Introduction) ঃ

পুঁথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন রুশো থেকে শুরু করে পেষ্টালৎসী, ফ্রোয়েবেল, জন ডিউই, মহাত্মা গান্ধী ও আরও অনেকে। এসব যুক্তির অনুকূলে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদির প্রভাবে অনেকেই পাঠ্যপুস্তককে সম্পূর্ণ বর্জন করলে চলে কিনা, তা পরীক্ষা করেছেন কিন্তু তার ফল আশাপ্রদ হয় নি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন উদ্যোগী, চিন্তাশীল 'শিক্ষা' বিভাগীয় ছাত্র (Students of Education) পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পর্যায়ক্রমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অপরিহার্য হাতিয়ার। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় সার্থক পাঠদান ও শিক্ষালাভের জন্য বহু পদ্ধতি, রীতি-নীতি প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এতে পাঠ্যপুস্তকে লিখিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সহজসাধ্য হয় মাত্র কিন্তু এরা পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত বিষয়রূপে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক বর্জনের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। বিশ্বের অন্যান্য শিক্ষাগ্রসর দেশের ন্যায় ভারতের শিক্ষাবিদ্‌রা তাই পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাকর্মে অপরিহার্য সহায়ক বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মতামতগুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ (C. A. B. E)-এর পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত পরামর্শদান সভার বিবরণীতে উল্লিখিত আছে যে, "ডেনমার্কের রাজকুমার ছাড়া হ্যামলেটকে যেমন চিন্তা করা যায় না, তেমনি পাঠ্যপুস্তক বিহীন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকেও চিন্তা করা দুরূহ।"[1]

1. "A modern educational system without text-book is as difficult to imagine as Hamlet without the Prince of Denmark." —C.A.B.E

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে কতকগুলি অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের উপর আমাদের শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, এ নিয়মের কড়াকড়ি যত শীঘ্র সম্ভব পরিবর্তনের দাবী রাখে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট (Prescribe) করা উচিত নয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীর মান অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক কমিটি যেন একাধিক উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করেন। বিদ্যালয় খুশীমত তাদের ভিতর থেকে প্রয়োজন অনুসারে পুস্তক বাছাই করে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করবে।[1]

(গ) পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগ ঠিক একই মতামত পোষণ করে। সেখানে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষকগণ সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকের উপর অধিক নির্ভরশীল তবে প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক অধিকতর মর্যাদায় সমাদৃত।

(ঘ) ভারতীয় শিক্ষাকমিশন (১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ) উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ এবং শিক্ষাদানের কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। কমিশনের মতে সার্থক পাঠ্যপুস্তক শিক্ষালাভের ও শিক্ষানের অপরিহার্য সহায়ক।[2]

ভারতীয় শিক্ষাধারায় পাঠ্যপুস্তকের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমাজবিদ্যা বিষয়টি নতুন, ফলে উন্নত ধরনের সমাজবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়নি। ভারতের কোন কোন রাজ্যে এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা চলছে। প্রচেষ্টার এই প্রাথমিক স্তরে অনেকে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতির পৃথক পৃথক মূলগ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন ও শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন করেন। আবার অনেকে উক্ত বিষয়গুলিকে পৃথক পৃথক অংশে একই পুস্তকে সংস্থাপিত করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন। বাস্তবে উক্ত বিষয়াদির সমাজভিত্তিক অংশগুলির অন্বিতরূপ হল সমাজবিদ্যা। আশার কথা, ভারতীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সংযোজনায় ও সমন্বয়ে অধিকতর উদ্যোগী ও অগ্রণী হয়েছেন।

---

2. Report of the Secondary Education Commission, 1952-53 (New Delhi—1965)—Chapter—VI.

1. Report of the Education Commission (1964—66) P. 229

২। পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য কেন? (Why is Text book indispensable):

আধুনিক শিক্ষাধারায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শিক্ষাকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না—ইহা সর্ববাদী সম্মত অভিমত। সুতরাং পাঠ্যতালিকাভুক্ত সমাজবিদ্যার জন্য উপযোগী পাঠ্যপুস্তক অত্যাবশ্যক। পাঠ্যপুস্তকের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি অবশ্য বিবেচ্য :

(ক) ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজবিদ্যা নতুন সংযোজন কিন্তু মূল পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টির পরিধিও ব্যাপক। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি ছাড়াও মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় থেকেও সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়। ফলে বিষয়টির উপর সুদক্ষ শিক্ষকের নিতান্ত অভাব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে মূল উপাদান নিয়ে গবেষণা করা আর শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপনা করা কোন মতে সম্ভব নয়। সুতরাং উদ্দেশ্যমুখী তৈরী পাঠ্যপুস্তকের উপর শিক্ষককে নির্ভর করতে হয়।

(খ) আমাদের দেশে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান-পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা-পদ্ধতি সমাদৃত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান। পাঠ্যপুস্তকের প্রাচুর্য থাকলেও শিক্ষক বক্তৃতার আশ্রয় না নিয়ে পারেন না। পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষককে বাধ্য হয়ে মূল উপাদান থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন করতে হয়। তখন বক্তৃতা হয়ে দাঁড়ায় উপস্থাপনার একমাত্র পদ্ধতি। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে কিছু কিছু মনে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল। কারণ, বক্তৃতা শোনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের অভাবে স্বগৃহে পাঠাভ্যাসের সুযোগ পায় না, সুতরাং বক্তৃতার বিষয় বস্তুর পরিপূরক হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

(গ) আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠাগারের অভাব সর্বজন বিদিত। ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীরা পাঠাগারে পড়াশুনা করবার উপযোগী মূলগ্রন্থ, বিভিন্ন বিষয়ের পত্র-পত্রিকাদি পায় না। এই অভাব পূরণ করতে পারে একমাত্র পাঠ্যপুস্তক। সমাজবিদ্যার একাধিক লেখকের লেখা পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করা বিদ্যালয়ের পক্ষেই সম্ভব। শিক্ষাবর্ষের সুরুতে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা পাঠ্যপুস্তকের নমুনা কপি বিদ্যালয়কে উপহার দেন। শিক্ষার্থীর ব্যবহারের জন্য এগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করা বিদ্যালয়ের মৌলিক দায়িত্ব।

(ঘ) পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সংযোজিত হয়, পুস্তক প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, বয়স ও সামর্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকে জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন যুক্তিসিদ্ধ বিষয়াদি লিখিত থাকে। ফলে পাঠ্যপুস্তকে ভিত্তি করে পাঠচর্চায় অগ্রসর হলে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ উভয়দিকে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সমাজবিদ্যার ব্যাপক বিষয়াদি এক একটা শীর্ষে (Heading), উপশীর্ষে (Sub-heading) এমন ভাবে লিখিত হয় যে শিক্ষার্থীরা সহজে প্রয়োজনীয় অংশাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। প্রতি অধ্যায়ের শেষে অথবা পুস্তকের সর্বশেষাংশে থাকে অনুশীলনী, নানা প্রকল্পের নমুনা ইত্যাদি। ফলে পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় অগ্রসর, অনগ্রসর ও সাধারণ প্রভৃতি সকলপ্রকার শিক্ষার্থী উপকৃত হয়।

(ঙ) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষামুখী। বার্ষিক শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্যতার জন্য শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নির্ধারিত পাঠ্যসূচী শেষ করার অনুকূলে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক শ্রেণী-শিক্ষার মান বজায় রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব বহন করে।

(চ) বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটির ফলে শিক্ষাকর্মে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষণে আমরা এই ত্রুটিগুলি আলোচনা করছি :

প্রথমতঃ, এক একটা শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে সকলকে প্রকল্প, সমস্যা, প্রশ্নোত্তর, তদারকী পাঠচর্চা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা বা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশদান ও তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার শিক্ষক শিক্ষাবর্ষের জন্য অনুমোদিত নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীটুকু শেষ করে শিক্ষার্থীদের সারা বৎসরের কর্মের মূল্যায়ন ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিতে উদ্বিগ্ন থাকেন।

তৃতীয়তঃ, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, আচার-ব্যবহার, অভিরুচি ইত্যাদিতে এত বেশি বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় যে, শ্রেণীকক্ষে পাঠপুস্তক ব্যতীত পাঠ পরিচালনা নিতান্ত অসম্ভব হয়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রাচুর্য ত দূরের কথা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার মত শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে শ্রেণী শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

শ্রেণী শিক্ষার পূর্বোক্ত ত্রুটিগুলি নিরসনের জন্যই পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নিতান্ত অপরিহার্য।

৩। সার্থক পাঠ্যপুস্তকের লক্ষণ (**Marks of a good text book**) :

সার্থক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন অথবা নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্বদা বিবেচ্য :

(ক) সমাজবিদ্যার সার্থক পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য লেখককে উদ্যোগী গবেষক, পর্যবেক্ষক ও অনুরাগী পাঠক হতে হবে। পুস্তকখানি যেন শুধু বিষয় কেন্দ্রিক না হয়ে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও অভিরুচি কেন্দ্রিক হয়। শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা দিকে লক্ষ্য রেখে অনুমোদিত পাঠ্যসূচী অনুসারে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সমন্বয় করাই হবে লেখকের প্রাথমিক কর্তব্য।

(খ) বাস্তবতার আবেদন পাঠ্যপুস্তকের সবিশেষ লক্ষণ। মনে রাখা উচিত, বিমূর্ত আলোচনা অপেক্ষা মূর্ত সামগ্রী বা বিষয়ের প্রতি বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মনোযোগ অধিক আকর্ষিত হয়। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকে বিষয় বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত নক্সা, ডায়গ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, ফটোচিত্র, মানচিত্রাদি সংযোজনার প্রয়োজন আছে। দৃষ্টি-সহায়ক সামগ্রী ভাষায় আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুধাবনে সাহায্য করে।

(গ) সমাজবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় না; বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান লাভই এই পুস্তকের বিশেষ উদ্দেশ্য। সুতরাং বিষয় উপস্থাপনার ভাষা হবে সরল, সহজ অথচ হৃদয়গ্রাহী। প্রতিটি জটিল ও বিশেষ বিষয়ের পরিভাষাগত (Technical) ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট সঙ্গতি (clear reference) থাকা বাঞ্ছনীয়। এ জন্য প্রতিটি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা শীর্ষে (heading), উপশীর্ষে (sub-heading) বিভিক্ত করে এমন ভাবে বিষয়-সন্নিবেশ করা দরকার যেন অগ্রসর, অনগ্রসর ও সাধারণ—সকল স্তরের শিক্ষার্থীই সহজে বিষয়টি অনুধাবণ করতে পারে।

(ঘ) সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে ভারসাম্য (balance) ও সঙ্গতি রক্ষা করে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সমন্বয় করা বিধেয়। সমন্বয় ও সংহতি সাধনের জন্য একক-পদ্ধতি (unit) বর্তমানে বিশেষভাবে সমাদৃত। এককের বিশেষ গুণ হল, বিশেষ শিরোনামার সার্থক আলোচনা ও প্রকাশের জন্য সমাজবিজ্ঞানের যে-কোন শাখা থেকে বিষয় সংগ্রহে কোন আপত্তি থাকে না। তবে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, বিষয়বস্তু যেন মানুষ ও তার সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'আমাদের খাদ্য', 'আমাদের যাতায়ত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা,' 'বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি', 'উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন' ইত্যাদি এক একটা একক। প্রতিটি এককের সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি মানব ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোন বিষয় থেকে বিবরণ সংগ্রহ করা যায়।

(ঙ) সমাজবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজ চিরপরিবর্তনশীল, জীবন্ত ও প্রগতিপন্থী। সুতরাং পুস্তকের বিষয়বস্তু অপরিবর্তনীয় না হয়ে নমনীয় (flexible) ও নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার অনুকূল হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(চ) বিষয়বস্তুর পূর্ণতা সার্থক পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম লক্ষণ। এক সময় ধারণা ছিল 'ছোট্ট শিশুর জন্য হবে ছোট্ট একখানি বই'। এ ধারনা সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শিক্ষার্থী সমাজবিদ্যার মাধ্যমে 'কি', 'কোথায়', ও 'কেন' এর উত্তর সম্পূর্ণরূপে জানতে চায়। শুধু বিষয়ের কাঠামো অথবা সারমর্ম দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে পারে না।

(ছ) পাঠ্যপুস্তক নিজে শেষ লক্ষ্য নয় (not an end in itself) ; ইহা লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় মাত্র। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর পাঠচর্চায় সাহায্য করে ও আরও জানবার জন্য ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে মাত্র। কিন্তু তাই বলে একে শিক্ষক অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবর্ত সামগ্রীরূপে গ্রহণ করার অর্থ নিতান্ত ভুল পথে পরিচালিত হওয়া। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন যেন ইহা শিক্ষকের শিক্ষাদান কজের ও শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের প্রকৃত সহায়ক হতে পারে।

(জ) উপযুক্ত, শিক্ষিত, যোগ্য ও নিপুণ লেখক কর্তৃক লিখিত পাঠ্যপুস্তক যদি যোগ্য প্রকাশকের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয় তবে শিক্ষাকর্মে সে পুস্তকের অবদান অমূল্য। এ সম্পর্কে লেখক, প্রকাশক উভয়েরই দায়িত্ব রয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের সার্থক পাঠ্যপুস্তক সৃষ্টির পথে অনেক বাধা রয়ে গেছে। এ সম্পর্কে শিক্ষাকমিশনের (১৯৬৪—৬৬ খ্রীঃ) নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য।[1]

(১) উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানী পণ্ডিতদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ইচ্ছা নিতান্ত কম। ফলে অনুপোযোগী ও তথাকথিত লেখকরাই পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

(২) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও অনুমোদনে চরম দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়।

(৩) প্রকাশকদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও উপযুক্ত লেখক নির্বাচনে নীতিজ্ঞানশূন্য কৌশল উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশের অন্তরায়।

(৪) উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রসঙ্গে লেখকরা গবেষণার কথা চিন্তা করেন না।

(৫) অধিক লাভের আশায় প্রকাশকরা পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক পুস্তক প্রকাশে অবহেলা করেন।

সার্থক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, মুদ্রনে ও প্রকাশনে লেখক, ছাপাখানা ও প্রকাশকের সমান দায়িত্ব আছে। এ বিষয়ে কাউকে অবহেলা করা যায় না। রাজ্য শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুস্তক অনুমোদন প্রসঙ্গে সার্থক পুস্তকের উল্লিখিত লক্ষণগুলি স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়। আবার অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষক কর্তৃক বিদ্যালয়ে পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে উক্ত লক্ষণগুলির প্রতি পুনরায় দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হবেন।[2]

---

1. Report of the Ed, Commission—(1964—66) P. 229.
2. গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দশম অধ্যায়

পাঠটীকা পরিকল্পনা

(Lesson Planning)

শিক্ষানীতি, শিক্ষামনোবিজ্ঞান, বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষা ও সমস্যার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে সাহায্যদানে অকৃতকার্য হন তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। শ্রেণীকক্ষে কৃতকার্যতার জন্য অথবা সার্থক পাঠদানের জন্য সুষ্ঠু পাঠপরিকল্পনা করাই শিক্ষকের অপরিহার্য কর্ম।[1] এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষক আত্মবিশ্বাস সহকারে পাঠদান করতে পারেন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীও আগ্রহ এবং মনোযোগ সহকারে শিক্ষণীয় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। পাঠটীকা পরিকল্পনার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় :

(১) সাপেক্ষ শর্তাদি (Conditioning factors)

(২) আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি (Formal but Preliminary Factors)

(৩) হারবার্টের সোপান (Herbert's Steps)

(১) **সাপেক্ষ শর্তাদি (Conditioning factors) :** উত্তমরূপে পাঠ প্রস্তুতি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শর্ত হল শিক্ষকের বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষকের দখল যথেষ্ট থাকা দরকার। শ্রেণীকক্ষে অকৃতকার্যতার বহুবিধ কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হল বিষয়ের উপর ব্যাপক দখলের অভাব। সাধারণতঃ শিক্ষকরা পাঠ্যপুস্তকখানি ছাড়া সহায়ক পুস্তকাদি পড়েন না অথবা পড়বার সময় পান না। সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে একথা অতি বাস্তব যে, বিষয়বস্তুর উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে

1. The best part of a student's training in the art of teaching consists not in listening to eloquent lectures, but in preparing lessons, and in giving them, under the guidance and over sight of a skilled tutor—Any Wise Person At any Time.

শ্রেণীকক্ষে কিছুতেই কৃতকার্য হওয়া যাবে না। সমাজবিদ্যা হল বহু বিষয়ের সংশ্লেষিত বিষয়। সেই বহু বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদির যে-কোন একটিতে দক্ষতা অর্জন করলেও সম্পূর্ণ সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু আয়ত্ব করা হয়েছে বলা চলে না। যিনি ইতিহাস নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাশ করেছেন তাকে অন্য বিষয় এবং আধুনিক সমুদয় ঘটনাবলীর উপর পড়াশুনা করতে হবে ও জ্ঞানার্জন করতে হবে। অন্যথায় এই মিশ্রিত ও সংশ্লেষিত বিষয়টির বহু অংশ অজানা থেকে যাবে। এক কথায় সমাজবিদ্যার শিক্ষককে এরূপ বহু বিষয়ে পাঠানুশীলন করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের কৃতকার্যতার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হল বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার। অথচ, এই সব সামগ্রীর অভাব থাকলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। ফলে বিষয়টির উপর শিক্ষার্থীর আসে বীতশ্রদ্ধা। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ঙ্কর। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে। যে ভাবেই হোক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহে যত্ন নেন এবং নিজেরাই যাতে যথেষ্ট সামগ্রী হাতে প্রস্তুত করে নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মডেল, চার্ট, ডায়াগ্রাম, ছবি প্রভৃতি কতকগুলি সামগ্রী আছে যেগুলিকে শিক্ষক নিজেই সহকর্মী শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতায় প্রস্তুত করতে পারেন। সমাজবিদ্যার শিক্ষক যদি বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য উদাহরণ ও বিষয়ের নমুনা দেখাতে না পারেন, যদি শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে না পারেন তবে তিনি শিক্ষকতায় ব্যর্থ—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা শিক্ষার্থীর বয়সের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বয়স্ক ব্যক্তি যে খাদ্য হজম করতে পারেন শিশু নিশ্চয়ই তা পারে না। শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুসারে নির্বাচিত বিষয়বস্তু শিক্ষাদান করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। জাতীয় লক্ষ্য হল মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি করণ—এই উভয়দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রেণীকক্ষে সমাজবিদ্যার পাঠদানকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য সাপেক্ষ শর্তাদির পরিপূর্ণ রূপদান প্রয়োজন।

(২) **আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি (Formal but preliminary factors) :** লেকচারার, সুপারভাইজর, পদ্ধতিশিক্ষক অথবা পরীক্ষকের অবগতির জন্য পাঠটীকা পরিকল্পনার পূর্বেই কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর পাঠে সাহায্যের জন্য এ সব বিষয়ের প্রয়োজন না থাকলেও লেকচারার এবং পরীক্ষকের সমালোচনা, বিচার ও মূল্যায়ন কর্মে বিশেষ সহায়তা করে। ফলে পাঠটীকা পরিকল্পনার প্রথমাংশেই এই বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তরূপে গৃহীত। নিম্নে এই শর্তের একটি নমুনা দেওয়া হল :

বিদ্যালয়—হামিলটন উঃ মাঃ স্কুল	বিষয়—সমাজবিদ্যা
শ্রেণী — নবম	পাঠক্রম (ক) আন্দামানবাসীদের খাদ্য সংগ্রহ
ছাত্র সংখ্যা — ৪০	(খ) " আনন্দ উৎসব
বয়সের গড়—১৪	(গ) " পোশাক ও হাতিয়ার
শিক্ষক—	
রোল নং	
তাং—	অদ্যকার পাঠ— খ ও গ অংশ

উদ্দেশ্য	সাধারণ :
	বিশেষ :
সহায়ক উপকণ	মানচিত্র, নক্সা, ছবি ইত্যাদি।

উক্ত বিষয়গুলির বৈশিষ্ট্য আত্মবিশ্লেষণমূলক। বিদ্যালয়, শ্রেণী, ছাত্রসংখ্যা ও তাদের গড় বয়সের দ্বারা শিক্ষক নিজেই পাঠ পরিকল্পনাকে সুন্দর করে তুলতে পারবেন। কোন্ শ্রেণী এবং কোন্ বয়সের শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে কি বিষয়ে কি উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা আছে কিনা তা বুঝে নেওয়া তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষকের পক্ষে যেমন সহজ, তেমনি পরিকল্পনাটি শিক্ষকের পাঠপরিচালনায় যথেষ্ট শৃঙ্খলা এনে দেয়।

'অদ্যকার পাঠের' উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হলে শিক্ষকমহাশয় শ্রেণীকক্ষে তদনুসারে অগ্রসর হতে পারেন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারেন। পাঠটীকা পরিকল্পনার সময় শিক্ষককে পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়। এর ফলে পাঠ-পরিচালনার সময় তিনি কিভাবে উদ্দেশ্যে পৌছবেন এবং তার জন্য কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন তাও তাকে ভাবতে হবে। ফলে চিন্তাধারা সুনির্দিষ্ট হয়ে পাঠদানে সাফল্য আনয়ন করবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং উদ্দেশ্যকে পাঠ-পরিকল্পনার কেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়। উদ্দেশ্যহীন পাঠটীকা লক্ষ্যহীন সমুদ্র যাত্রার মত অনির্দিষ্ট কর্ম পরিচালনা মাত্র। তাই পাঠটীকায় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্দেশ করা অপরিহার্য।

(৩) হারবার্টের সোপান : (Herbart's Steps) : মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত হারবার্ট কর্তৃক আবিষ্কৃত পাঠটীকার মনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা শিক্ষাকর্মে অপূর্ব অবদান। হারবার্ট এবং তাঁর শিষ্যগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রতিটি পাঠ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর মনের অভিরুচি ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরিবেশন করা চলে। এই পাঁচটি সোপান হল নিম্নরূপ :

(ক) আয়োজন—(Preparation)
(খ) উপস্থাপন—(Presentation)
(গ) অভিযোজন—(Application)
(ঘ) সংযোগ—(Association)
(ঙ) সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ—(Generalisation)

(ক) আয়োজন (Preparation) : আয়োজন স্তরটিকে সূচনা অথবা ভূমিকা স্বরূপ অনেকে গ্রহণ করেন কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে নতুন কিছু জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে থাকে না। তাদের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগাতে হয় ; আর এ দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষক এ দায়িত্ব দু'ভাবে পালন করতে পারেন। প্রথমতঃ, তিনি পূর্বপাঠের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ছাত্রদের সেদিনের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। এর ফলে পূর্বপাঠের পুনরালোচনা করা হয় এবং ধীরে ধীরে বর্তমান পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নের অবতারণা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর অজ্ঞাতে বর্তমান পাঠ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণীকক্ষের আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় অথবা পাঠঘোষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক স্বীয় অভিরুচি অনুসারে পূর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখেও প্রশ্ন করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান যায়। শিক্ষার্থীর জানা থেকে অজানা বিষয়ের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিক্ষক বর্তমান পাঠ ঘোষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। অনেকে বলেন, নতুন বিষয়ের (Topic) অবতারণার সময় পূর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি না রাখাই ভাল। শিক্ষার্থীরা নতুন কথা শুনতে চায়, নতুন বিষয় জানতে চায় এবং এতেই তাদের মন পাঠের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। পুরাতন বিষয়ের (Topic) মধ্য বা শেষাংশ আলোচনার সময়ও এমনি করে পূর্ব পাঠ-সঙ্গতি বজায় না রেখে নতুন বিষয় ও প্রশ্নের মাধ্যমে আয়োজন ক্রিয়া পরিচালনা করা যায়।

আয়োজন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল পাঠ-ঘোষণার (Announcing the lesson of the day) অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। যখন শ্রেণীকক্ষে সেই পরিবেশ গড়ে ওঠে তখনই শিক্ষকের পাঠ-ঘোষণা করা উচিত ; "আজ আমরা আন্দামানবাসীদের আনন্দ-উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করব"। শিক্ষকের এই ঘোষণার দ্বারা শিক্ষার্থীর মন স্পষ্টতঃ শিক্ষক কর্তৃক পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষ থেকে এই আয়োজন পর্বের প্রথম ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য শিক্ষককে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর উপর যথেষ্ট অধিকার সহ চিন্তাশীল, ও অনুসন্ধিৎসু হতে হবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সুরুতে শিক্ষক বিষয় বস্তুকে আকর্ষণীয় ও আগ্রহ সঞ্চারক করে তুলবেন। শিক্ষার্থীর মনের উপর ছাপ রেখে যাবার ফলে শিক্ষাকর্মের পরবর্তী ধাপগুলি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও শ্রেণীকক্ষের সীমিত সময়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষক তাঁর কর্ম অতি সহজে সমাধান করতে পারেন।

অনেক সময় শিক্ষণ শিক্ষার্থীরা (Teacher Trainees) প্রশ্ন করেন—কতটুকু সময় এই আয়োজন পর্বে ব্যয় করা যেতে পারে? এটা নির্ভর করে পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বে পাঠ আয়ত্বকরণের উপর। আয়োজনের গুরুত্বের উপর লক্ষ্য রেখে এইটুকু বলা চলে যে, শিক্ষক তাঁর শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মের সময় হাতে রেখে আয়োজনের জন্য সময় ব্যয় করতে পারেন।

(খ) উপস্থাপন (Presentation) : হারবার্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দিতে চান। এই অংশে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার কয়েকটি শীর্ষে বিভক্ত করে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতি শীর্ষের শেষাংশে ব্যাখ্যা, প্রশ্ন, উদাহরণ ও শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার উল্লেখ করা থাকে। এভাবে পাঠটীকা রচনায় ত্রুটি থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, এই উপস্থাপন অংশটিকে দুটি লম্ব শীর্ষে বিভক্ত করা উচিত। উক্ত লম্বের বাম অংশে বিষয় ও দক্ষিণ অংশে থাকবে পদ্ধতি। বিষয় অংশে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসারটি এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত যেন শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে বর্ণনা করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। এক একটা অংশের বর্ণনা দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজন মত উদাহরণ, শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার, বোর্ড ওয়ার্ক প্রভৃতি করা উচিত। দক্ষিণ অংশে এগুলির প্রয়োগ ইঙ্গিত লিখিত থাকে। শিক্ষক মহাশয় বিষয় বস্তুর এক একটা অংশ উপস্থাপন করবেন, আর শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। প্রশ্নগুলি লেখা থাকবে পদ্ধতি কলম অংশে। এইভাবে বিষয়বস্তুর অংশগুলি পদ্ধতি সহযোগে পর পর শেষ করা যুক্তিযুক্ত। শিক্ষকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও ধারণা, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য কার্যসূচী প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন পর্বের সময় নির্দেশ করাই বাঞ্ছনীয়।

(গ) অভিযোজন (Application) : পাঠটীকার এই অভিযোজন অংশেও শিক্ষকের দক্ষতা ও পরিচালন শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় কোন একটা বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অথবা কোন বিষয়ের সংজ্ঞা প্রকাশ করে তার উপর পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু হিউম্যানিটিস-এর কোন বিষয়ের পাঠ দান কালে শিক্ষার্থীর নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। প্রশ্ন ছাড়া প্রয়োজন বোধে মানচিত্র, ডায়গ্রাম প্রভৃতি প্রদর্শন (pointing), অঙ্কন, অথবা রচনা লেখার জন্য বলতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরাও ব্লাকবোর্ডে কাজ করা অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। শুধু সাহিত্য-মূলক বিষয়বস্তুর পঠন-পাঠনে শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে অভিযোজন ক্রিয়া সমাপ্ত করেন। তবে প্রশ্ন করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত, তার উত্তরটি যেন বিষয়বস্তুর অনেকখানি অংশ নিয়ে গঠিত হয়।

পাঠটীকার এই পর্ব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রেণীকক্ষে কি আলোচনা হল, কি কি বিষয় উপস্থাপন করা হল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সুস্পষ্ট ধারণা হল কি না তা জানবার উপায় স্বরূপ অভিযোজন ধাপের অবতারণা। অভিযোজন ক্রিয়ার জন্য অমনোযোগী শিক্ষার্থীও বাধ্য হয়ে শিক্ষকের বা ভালছেলেদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে ও মনেরাখার চেষ্টা করে। এই পর্বে শিক্ষার্থী যদি উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করতে পারে তবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের শ্রম সার্থক হয়েছে বলা যায়। পূর্বেই বলেছি, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল পাঠ-পরিচালনাই হল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সার্থক শিক্ষাদান প্রচেষ্টা।

(ঘ) **সংযোগ (Association) :** হারবার্ট কর্তৃক প্রদত্ত সংযোগ স্তরে থাকে তুলনামূলক আলোচনা। উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে পূর্বপাঠের সঙ্গতি রক্ষা অথবা শিক্ষার্থীদের পঠিত বা লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে নতুন কোন বিষয়ের তুলনা করাই এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। তুলনা বা সাদৃশ্য করণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকলে শিক্ষার্থীর ধারণা সংগঠিত হতে পারে না। সেকারণে খুব সাবধানে তুলনা করা উচিত। হারবার্ট যদিও পৃথকভাবে এই স্তরের অবতারণা করেছেন তবু শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা এর ব্যবহার করেন না; কারণ উপস্থাপন সোপানের অন্তর্ভুক্ত করে অনেকেই সংযোগ কার্য সমাধা করেন।

সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে এই সোপানের ব্যবহার অপরিহার্য। কারণ, মানুষের সাথে মানুষের, সমাজের সাথে সমাজের, শাসননীতি ও পৌরনীতির সঙ্গে অন্য দেশের শাসন ও পৌর নীতির তুলনা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মনের প্রসারতা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ব্যাহত হয়। তুলনার মাধ্যমে জানার পথে অনেক অজানা জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। এ বিষয়ে শিক্ষকের অতিরিক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পরিচালন কুশলতার অপরিহার্যতা সম্পর্কে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে।

(ঙ) **সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ (Generalisation) :** বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে এই স্তরের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সমাজবিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে এর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, এসব ক্ষেত্রে সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ সব সময় সত্য ও নিখুঁত হয় না। যুগের গতির সঙ্গে মানব ইতিহাস ও সমাজজীবনে আসে পরিবর্তন। ফলে মানবসমাজে কোন কার্য কারণ সম্পর্ক স্থায়ী সত্যে পরিণত হতে পারে না। পাঠদানের সময় যদি কখনও

কোন সূত্র নির্ধারণ করা হয় তা সাধারণতঃ দ্বিতীয় সোপানে অর্থাৎ উপস্থাপনার স্তরেই ফলপ্রসূ হতে পারে।

এই স্তরের কার্যকারিতা বিশেষ না থাকলেও সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের পাঠটীকা রচনার সময় 'বোর্ড ওয়ার্ক' (Board work) শীর্ষে একটা স্তর রচনা করা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে কোন্ কোন্ সময় ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষক কাজ করবেন তা এই সোপানে লেখা উচিত। এর ফলে শ্রেণীকক্ষে কিভাবে শিক্ষক কাজ করবেন সে সম্পর্কে তাঁকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হবে, ফলে তাঁর কাজ হয়ে উঠবে হৃদয়গ্রাহী। উপস্থাপিত বিষয়টির বিশেষ বিশেষ শীর্ষসহ একটি সংক্ষিপ্তসার শিক্ষক এই স্তরে লিখে রাখবেন ও শ্রেণীকক্ষে বোর্ডে সেটুকু লিখে দিতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা কর্মতৎপর হয়ে উঠবে এবং অধ্যয়ন, শ্রবণ, লিখন—এই তিনটি কর্মে তারা সমানভাবে সক্রিয় হবে। ফলে শিক্ষণীয় বিষয় স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

গৃহ কাজ (Home task) : পাঠটীকার শেষাংশে গৃহকাজের উল্লেখ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই অংশে সাধারণতঃ উত্তর তৈরীর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি অঙ্কনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। 'গৃহ কাজ' সোপানে এমন বিষয়ের নির্দেশ থাকা উচিত যেন উহা ছাত্রের নিকট বিরক্তিকর না হয়ে স্বাভাবিক আগ্রহ উদ্দীপক হয়। বর্তমান যুগে পাঠটীকায় গৃহকাজের গুরুত্ব অত্যধিক।

এই স্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে স্বগৃহে শিক্ষালাভ কর্মে ব্যাপৃত রাখা। অনেক শিক্ষক 'গৃহ কাজ' স্তরে প্রশ্নের পরিবর্তে শুধু পড়াশুনার নির্দেশ দেন; এ নির্দেশ মোটেই প্রতিপালিত হয় না। কারণ, সাধারণতঃ দেখা যায় অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব গৃহে পাঠানুশীলনে অবহেলা করে। কিন্তু গৃহের পাঠচর্চাই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মের পরিপূরক। গৃহ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকর্মে ব্যাপৃত রাখতে হলে পড়াশুনার নির্দেশ ও উপদেশের পরিবর্তে প্রশ্নের উত্তর-লিখন, মানচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি কর্মের নির্দেশই পাঠ পরিকল্পনার 'গৃহ কাজ' স্তরের বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ, প্রশ্নের উত্তর লিখন, মানচিত্রাদি অঙ্কন ও স্থান নির্দেশ করতে হলে প্রথমেই পুস্তকের নির্দিষ্ট অংশটুকু শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়ে পড়তে হয়। শুধু পড়াশুনার নির্দেশ শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই পালন করে না।

উদাহরণ ঃ পাঠটীকা বা পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। শিক্ষার প্রগতি ও প্রয়োজনে পাঠটীকা রচনা পদ্ধতিও গতিশীল। কোন নির্দিষ্ট মানের পাঠটীকা পরিকল্পনা আজও তৈরী হয় নি, আর তা হতেও পারে না। তবুও শিক্ষাকর্মের সকল দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ-পরিকল্পনার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল ঃ

সংক্ষিপ্ত পাঠটীকা নং ১

বিদ্যালয়ের নাম—দমদম এয়ার পোর্ট হাই স্কুল শ্রেণী—নবম উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা—৪০ গড় বয়স—১৪-১৫ শ্রেণী পাঠের সময়—৪০ মিনিট শিক্ষকের নাম—শ্রীসুভাষ ঘোষ তাং—৯।২।৬৮	বিষয়—সমাজবিদ্যা সাধারণ পাঠ—পৃথিবীর কোন একটি অঞ্চলের জনসাধারণের উপর পরিবেশের প্রভাব। বিশেষ পাঠ—মালয়ের অধিবাসীদের উপর পরিবেশের প্রভাব। অদ্যকার পাঠ—ঐ
উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ—মালয়ের জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা। ... ... পরোক্ষ—পৃথিবীর যে-কোন আঞ্চলিক মানব সমাজ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়—এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের সহায়তা করা।
উপকরণ	ভারতের একটি প্রাচীন মানচিত্র, এশিয়ার মানচিত্র, ভূগোলক, এশিয়ার রেখ-মানচিত্র, বিষয় সম্পর্কিত ছোট ছোট ছবি, একখানি রবার প্রভৃতি।

প্রস্তুতি	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মাধ্যমে অদ্যকার শ্রেণীপাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাদের রবারের টুকরো দেখিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে : প্রশ্ন : (১) এটি কি জিনিস ? (২) কি দিয়ে সাইকেল টিউব তৈরী হয় ? (৩) পৃথিবীর কোন অঞ্চলে রবার বেশি উৎপন্ন হয় ? (৪) ভারতের নিকটতম দু-একটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের নাম বল।
পাঠ-ঘোষণা	"আজ আমরা মালয়ের জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব"—এই বলে পাঠ ঘোষণা করা হবে।

	বিষয়	পদ্ধতি
উপস্থাপন	অদ্যকারপাঠ্য বিষয়টিকে নিম্নলিখিত শীর্ষে বিভক্ত করে শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে বর্ণনা করা হবে :	উপস্থাপিত বিষয়টিকে জীবন্ত ও সুস্পষ্ট করে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করব ও নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে :
	(ক) অবস্থান : ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই উপদ্বীপটির নাম মালয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে মালয়ের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ	(ক) মানচিত্রাদির সহযোগিতা। (খ) রেখ-মানচিত্রে এই যোগাযোগ অঙ্কন।

	বিষয়	পদ্ধতি
উ প স্থা	ছিল। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত বলে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ফলে এ দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়েছে অরণ্য সম্পদ। এই সব অরণ্যে বাস করে সেমাঙ, সকাই প্রভৃতি মালয়ের আদিম অধিবাসীরা।	(গ) ভূ-গোলকের সাহায্যে পৃথিবীর অন্যান্য নিরক্ষীয় অঞ্চল প্রদর্শন। (ঘ) চিত্র প্রদর্শন। প্রশ্ন: (১) মালয় কোথায় অবস্থিত? (২) কোন্ কোন্ দিক থেকে ভারতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল? (৩) মালয়ের আদিবাসীদের নাম বল। (৪) পৃথিবীর আরো দু-একটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের নাম কর।
প ন	(খ) জীবনযাত্রা (১) এরা সবদিক থেকে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অরণ্যের ফলমূল ও পশু-পক্ষী শিকার করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। ইয়ামেন গাছের মূল ও বিভিন্ন পক্ষী মাংস এদের প্রিয় খাদ্য। এরা বাঁশের তৈরী একপ্রকার তীর দ্বারা পশু পক্ষী শিকার করে। শিকারের সুবিধার জন্য তারের অগ্রভাগে বিষ মাখিয়ে নেয়। এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করে। বিশাল অরণ্যকে দলের সংখ্যা অনুসারে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে নেয় ও এক একটা অংশে এক একটা	(ক) তীর ধনুক ও শিকারের ছবি প্রদর্শন প্রশ্ন: (১) আদিবাসীরা কি ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে? (২) কি রূপ অস্ত্রের সাহায্যে তারা পশুপক্ষী শিকার করে? (৩) অরণ্যের মধ্যে তারা অঞ্চল ভাগ করে নেয় কেন?

	বিষয়	পদ্ধতি
উ	দল বসবাস ও শিকার করে। দলে দলে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য তারা এই ভাগ বাটোয়ারার ব্যবস্থা করে।	
প স্থা	(২) বনজাত ফলমূল, পশুপক্ষীর উপর নির্ভর করতে হয় বলে এরা এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। এক-স্থানের খাদ্য শেষ হয়ে গেলে অন্যত্র গিয়ে তারা ঘর বাঁধে। পশুচর্মের পোশাক পরিধানে এরা অভ্যস্ত। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর জন্যে অরণ্যের মৃত্তিকা থাকে স্যাঁৎসেতে; আবার বন্য জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও যথেষ্ট আছে। তাই তারা ঘরের মধ্যে মাচা তৈরী করে রাত্রি কাটায়। মাচার দুদিকে জেলে রাখে আগুন। এদের জীবনযাপন খানিকটা যাযাবরের মত। আজও এদের সংহত সমাজজীবন গড়ে উঠতে পারে নি।	প্রশ্ন : (১) এদের পোশাক পরিচ্ছদ কি ধরনের ? (২) আদিবাসীদের মধ্যে সমাজ-বোধ গড়ে ওঠেনি কেন ? (৩) এরা কিরূপ ঘর তৈরী করে বসবাস করে ?
প ন	(গ) আধুনিকতার স্পর্শ : এসব আদিবাসী ছাড়া মালয়ে আজ মুসলমান, চীনা, ইউরোপীয়রা বসতি বিস্তার করেছে। ইউরোপীয়দের উপ-নিবেশগুলি সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। এখানে গড়ে উঠেছে রবার চাষ ও অন্যান্য কৃষি। কৃষি ছাড়াও কল-কারখানা তৈরি হয়েছে। আদিবাসীরা অনেকেই কৃষি ও কারখানায় শ্রমিকের	প্রশ্ন : (১) মালয়ে কি কি জিনিষের চাষ হয় ? (২) আধুনিকতার সংস্পর্শে আদিম অধি-বাসীদের কি কি পরিবর্তন এসেছে ?

	বিষয়	পদ্ধতি
উপস্থাপন	কাজে লিপ্ত থাকে। স্ত্রীলোকরা সাহেব পরিবারে ঝি-এর কর্মে লিপ্ত। সভ্য জাতির মানুষ এদের ঘৃণার চোখে দেখে। অধুনিকতার স্পর্শে এই আদিমজাতির ভিতর এসেছে পরিবর্তন। ক্রমশঃ গড়ে উঠছে নতুন সমাজ। এ সমাজের সকল লোকই কর্ম চঞ্চল।	

অভিযোজন

ছাত্ররা পাঠ্য বিষয় কতখানি আয়ত্ত করেছে, তা জানবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়টির পুনরালোচনা করা হবে:

প্রশ্ন: (১) মালয় উপদ্বীপের অবস্থান ও জলবায়ু বর্ণনা কর।

(২) এখানকার অধিবাসীরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল কেন?

(৩) আদিবাসীদের জীবনযাত্রার বিবরণ দাও।

(৪) উপনিবেশের প্রভাবে এদের কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

গৃহকাজ

ছাত্রদের গৃহকাজ স্বরূপ নিম্নলিখিত কর্মের নির্দেশ দেওয়া হবে:

(ক) পৃথিবীর রেখ-মানচিত্রে ভারত ও মালয়ের অবস্থান নির্দেশ কর।

(খ) মালয়ের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে আন্দামানের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার একটি তুলনামূলক রচনা লিখ।

সংক্ষিপ্ত পাঠটীকা নং ২

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী— নবম ছাত্র সংখ্যা— তাদের গড় বয়স— সময়— শিক্ষক— তারিখ—	বিষয়—সমাজবিদ্যা সাধারণ পাঠ—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান। বিশেষ পাঠ—কলিকাতা কর্পোরেশন অদ্যকার পাঠ—ঐ

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা। পরোক্ষ : গ্রাম ও শহরের পৌরশাসন সম্পর্কে কল্পনা, চিন্তা ও যুক্তি বিকাশে সহায়তা করা।
উপকরণ	পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র, পশ্চিমবঙ্গের রেখ-মানচিত্র, কলিকাতা ও সহরতলীর মানচিত্র, কর্পোরেশনের সংগঠন সম্পর্কিত চার্ট ইত্যাদি।
প্রস্তুতি	নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করে পাঠ্যাভিমুখী করবার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্ন : (১) তোমাদের এই স্কুলটি কোন্ ইউনিয়নে অবস্থিত? (২) এ ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি কে? (৩) আমরা কোন্ রাজ্যে বসবাস করি? (৪) পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কি?
পাঠঘোষণা	"আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের ন্যায় কোলকাতায় আছে পৌর প্রতিষ্ঠান। তার নাম কলিকাতা কর্পোরেশন। আজ আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব।"—এই বলে পাঠ-ঘোষণা করা হবে।

	বিষয়	পদ্ধতি
উ প স্থা প ন	অদ্যকার পাঠ্য বিষয়টিকে নিম্নলিখিত শীর্ষে বিভক্ত করে শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে বর্ণনা করা হবে।	উপস্থাপিত বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণাদির সাহায্য গ্রহণ করব ও নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হবে।
	বিষয়বস্তু ঃ (ক) কলিকাতার অবস্থান, আয়তন ও লোক সংখ্যা।	ক) মানচিত্রের সহযোগিতা খ) চার্টের সহযোগিতা প্রশ্ন ঃ (১) পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় কলিকাতা অবস্থিত ? (২) কলিকাতার চতুঃসীমা বর্ণনা কর। (৩) বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির নাম বল। ক) চার্টের সহযোগিতা খ) কলিকাতার মানচিত্র সহ এলাকার নির্দর্শন।
	(খ) (১) কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন। (২) কর্পোরেশন কমিশনারের নিয়োগ ও দায়িত্ব। (৩) স্থায়ী কমিটির বিষয়। (৪) এলাকা কমিটি।	প্রশ্ন : (১) কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলারের সংখ্যা কত ? (২) কাদের দ্বারা অল্ডারম্যানরা নির্বাচিত হন ?

	বিষয়	পদ্ধতি
উ		(৩) কর্পোরেশনের সভ্য নির্বাচনের জন্য ভোটারদের কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত ?
		(৪) কমিশনার কে এবং তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব কি কি ?
প		(৫) স্থায়ী কমিটি ক'টি ?
স্থা	(গ) কর্পোরেশনের কাজ ও আয়-ব্যয়।	ক) চার্টের সহযোগিতায় ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের সঙ্গে কর্পোরেশনের কাজের তুলনা।
প		প্রশ্ন :
	(উপস্থা[illegible] অংশে বিষয় সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখাই যুক্তিযুক্ত)	(১) কর্পোরেশনের কাজ কি কি ?
ন		(২) কলিকাতা কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় কত ?
		(৩) এই আয়ের উৎস কি কি ?

অভিযোজন	অদ্যকার পাঠ শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত করতে পারল, তা জানবার জন্যে নিম্নলিখিত পুনরালোচনা মূলক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে : প্রশ্ন : (১) কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানটির সংগঠন বর্ণনা কর। (২) কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে কারা অংশ গ্রহণ করতে পারেন ? (৩) কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটীর সংখ্যা ও তাদের কাজকর্ম বর্ণনা কর। (৪) কর্পোরেশনের কার্যাবলী বর্ণনা কর।
বাড়ীর কাজ	শিক্ষার্থীদিগকে বাড়ী থেকে (১) পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র অঙ্কন ও (২) কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তার নাম শিখবার নির্দেশ দেওয়া হবে।

সংক্ষিপ্ত পাঠটীকা নং ৩

(অবেক্ষণ পাঠচর্চার প্রয়োজনে)

বিদ্যালয়—কমলা হাই স্কুল শ্রেণী—নবম উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা—৪০ জন গড় বয়স—১৪-১৫ বছর সময়—১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট শিক্ষক—শ্রীভবতোষ রায় তাং…………	বিষয়- সমাজবিদ্যা সাধারণ পাঠ—পশুচারণ ও কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা। বিশেষ পাঠ—উক্ত দু-প্রকার জীবনযাত্রার তুলনামূলক রচনা লিখন। অদ্যকার কর্ম—ঐ

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ : আলমোড়া ও পল্লীবাংলার জীবনযাত্রা পাঠ ও সে সম্পর্কে রচনা লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বীয় প্রচেষ্টায় তত্ত্বাবধান ও সহায়তা দান। পরোক্ষ : শিক্ষার্থীদের মনে আত্মনির্ভরশীলতার প্রেরণা সৃষ্টি।
উপকরণ	(ক) দুখানি করে পাঁচ জন লেখকের লেখা দশখানি সমাজবিদ্যার পুস্তক। (নমুনা কপি) (খ) দশখানি ভূচিত্রাবলী। (গ) সমাজবিদ্যার কক্ষের দেওয়ালে স্থাপিত (১) ভারতের মানচিত্র ; (২) বাংলাদেশের মানচিত্র (৩) পশুচারণ ও কৃষিভিত্তিক জীবন-ধারার নানা প্রকার চিত্র। (এগুলি যেন শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি গ্রাহ্য হয়)
পরিবেশ সৃষ্টি	নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও কথার মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করে অবেক্ষণ পাঠচর্চার অনুকূলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্ন : (১) বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য কি ? (২) তোমরা কি খেয়ে স্কুলে এসেছ ? বাঙ্গালী বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তপ্রায়। আমরা মাছ-ভাতের কথা ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছি। এর প্রধান কারণ বাংলায় অধিক লোকসংখ্যা ও তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্যোৎপাদন। বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান অঞ্চল, অথচ এখানেই খাদ্যের অভাব। প্রতি বছর শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এখানে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। অর্থনৈতিক দুর্গতির হাত থেকে বাঁচতে হলে উৎপাদন বাড়ান দরকার।

হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়ার অধিবাসীরা কৃষির জন্যে উপত্যকার সমতল ক্ষেত্রে নেমে আসে। সেখানে পশুর খাদ্য বরফ চাপা পড়লে, পশুপাল নিয়ে তারা তৃণের সন্ধানে পর্বতে ওঠা-নামা করে। তাদের মত আমাদেরও পতিত জমিতে কৃষি ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন। এখন দেখা যাক্,পল্লীবাংলা আর আলমোড়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা কিরূপ।

পাঠ ঘোষণা

এই বইগুলি থেকে তোমরা তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ভাগ করে বুঝে পড়বে এবং পল্লীবাংলা ও আলমোড়া-বাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তুলনামূলক রচনা লিখবে। মোট সময় দেড় ঘণ্টা।

ব্যবস্থাপনা

পদ্ধতি : তদারকী পাঠচর্চা (Supervised Study)

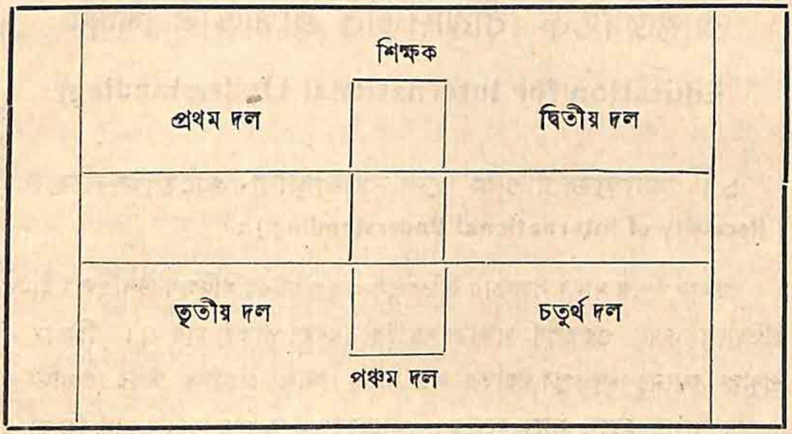
স্থান : সমাজবিদ্যার কক্ষ

দল : মোট চল্লিশ জনের প্রতি আট জন নিয়ে গঠিত পাঁচটি দল।

	নাম		সামগ্রী
প্রথম দল	(১) নিরঞ্জন মাইতি	(৫)	(ক) স্ব-স্ব পাঠ্যপুস্তক
	(২)	(৬)	(খ) প্রতি দলের জন্য প্রদত্ত
	(৩)	(৭)	দু'খানি সমাজবিদ্যার
	(৪)	(৮)	পুস্তক।
			(গ) দু'খানা ভূচিত্রাবলী।
দ্বিতীয় দল	(১)	(৫)	
	(২)	(৬)	ঐ
	(৩)	(৭)	
	(৪)	(৮)	
তৃতীয় দল	অন্য ৮ জন		
চতুর্থ দল	,,		ঐ
পঞ্চম দল	,,		

আসন ব্যবস্থা :

সমাজবিদ্যার কক্ষ



প্রতিটি দল এমনভাবে বসবে যেন তাদের যাতায়াতের পথ থাকে। প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীরা এই পথেই দেওয়াল মানচিত্র ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীর সাহায্য গ্রহণের জন্য যাতায়াত করবে। দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পাঠচর্চা ও রচনা লেখার কাজ শেষ করবে।

মূল্যায়নার্থে রচনা দাখিল : পাঠচর্চা সুরু থেকে ৯০ মিনিট পর (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎএর নির্দেশ অনুসারে সমাজবিদ্যার নিমিত্ত এরূপ পাঠচর্চা পরপর দু-পিরিয়ড অর্থাৎ প্রায় ৯০ মিনিট যাবৎ চলতে পারে) শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব রচিত বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

গৃহের কাজ : বাংলার কৃষি অঞ্চল ও আলমোড়া অঞ্চলকে ভারতের রেখা মানচিত্রে অঙ্কন ও নির্দেশ করার কথা বলা হবে।

একাদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনে শিক্ষা
(Education for International Understanding)

১। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of International Understanding) :

বর্তমান বিশ্বে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। মানব ইতিহাসে এমন গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা সঙ্কটের বিবরণ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির জন্য মানুষ আজ প্রকৃতির উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের মন আজও আদিম স্বার্থ, হিংসা ও দ্বেষে ভরপুর। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে মানুষের চিন্তা, আদর্শ, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি সর্বস্তরে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষমতা-বিস্তার প্রবণতার উপর বিজ্ঞানের অবদান মানবিক গুণাবলীর বিকাশের ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু জড়জগতে পরিবর্তন আনা যত সহজ, মানসিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা তত সহজ নয়। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত না হলে সভ্যতার ক্ষেত্রে সঙ্কট সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই আজ জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানে অধিক উন্নত জাতি চায় অন্যের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করতে। ফলে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পৃথিবীব্যাপী দুটি মহাসমর সংঘটিত হল। পৃথিবীর আধুনিক রাষ্ট্রগুলির পরস্পর দোষারোপ, ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war)

---

1. "Since wars began in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed." —UNESCO

2. "It is more than nineteen hundreds years since Christ said : Thou shall love thy neighbour as thyself. I wonder how many more years it will be before people begin to think that this was sound advice." —Bertrand Russel.

3. "If human civilization and humanity are to be saved, war must be made impossible." —Presten E James.

এবং বিধ্বংসী প্রলয় কাণ্ডের ইঙ্গিত দেয়। মানব সভ্যতাকে যদি সত্যই বাঁচাতে হয়, যদি মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়—তবে যুদ্ধ পরিহার করে তোলাই হবে মানবিক নীতি।

আজ অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতির ব্যাপারে বিশ্বের জাতিগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। যানবাহনের উন্নতির পূর্বে পৃথিবী ছিল সে যুগের মানুষের কাছে অনতিগম্য বিরাট আয়তনের। জগতের কোথায় তখন কি ঘটনা ঘটত কেউ তার সংবাদ রাখত না, আর রাখার উপায়ও ছিল না। সেদিন আজ অতীত। যাতায়াত ও আদান প্রদান ব্যবস্থার দ্রুতগতি পৃথিবীর দূর প্রান্তের গ্রামখানিকে আমাদের প্রতিবেশী করে দিয়েছে। সেই প্রতিবেশীর সঙ্গে গড়ে উঠেছে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব। এখন আর কেউ কাউকে পর করে দূরে রাখতে পারে না। ফলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এসম্পর্ক গড়ে তোলা আর তা বজায় রাখা আজ শান্তিকামী মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা। পরস্পর নির্ভরশীলতার দ্বারা পৃথিবীর প্রতিটি জাতি বুঝতে পারে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহায়তা কত প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর যে-কোন মানুষ এক জন অন্য জনের মত সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ, হাসি-কান্নার অধিকারী। তাই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার হবে মানবোচিত। শুধু এই ধারণাবিকাশের দ্বারা বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এরও চেয়ে বড়কথা বিশ্বের জাতিপুঞ্জ আজ রাজনীতি ও অর্থনীতি দ্বারা এমন ভাবে অন্বিত যে, এই বন্ধনকে অবহেলা করার অর্থ নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনা। আজ আমরা শুধু ভাবপ্রবণতা দ্বারা নয়, বাস্তব প্রয়োজন সম্পর্কে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর মানবসম্পর্কের জীবন্ত ছবি। এখানেই পরস্পর নির্ভরশীল মানব জাতির 'এক বিশ্বের' (One-world) ধারণা প্রতিভাত। কিন্তু আজও উগ্র জাতীয় চেতনা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যযুগীয় ধারণা বিশ্বের মানব সমাজে নিয়ে আসছে ভেদ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নয়নে প্রকৃতির উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করলেও স্বীয় মানসিক ক্ষেত্রের উপর সামঞ্জস্যপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান মানুষকে যে অজস্র শক্তির অধিকারী করেছে তার সংযত, মানবহিতকর প্রয়োগ সাধন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের অবদানে আজ দেশ ও কালের সীমা

সংক্ষিপ্ত, যোগাযোগ সহজ, ভাব বিনিময় দ্রুত, কিন্তু তবুও বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি পরানুভূতি, সহিষ্ণুতা আন্তর্জাতিক স্তরে অনুপস্থিত। বিজ্ঞান আন্তর্জাতিকতাবোধের জাগতিক বাহ্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করলেও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। এ আন্তর্জাতিকতা বোধ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক বা সামরিক জোটের দ্বারা যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তার নজীর উল্লেখ না করলেও চলে। আমাদের বিশ্বাস আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্ববোধের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক গুণাবলী শিক্ষার মাধ্যমেই মানবমনে সঞ্চারিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াব উপায়রূপে শিক্ষা (Education as a means of International understanding): শুধু রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জাতিবর্গের মধ্যে শান্তি আনতে পারে না। এগুলি হল বাহ্যিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র। বিশ্ব শান্তির মহান আদর্শ মানুষের মন ও অন্তরের পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল। লীগ অব নেশান্‌সের ব্যর্থতা, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রসংঘের (UNO) আংশিক সাফল্য প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক যোগাযোগ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় অক্ষম। শান্তি প্রচেষ্টার জন্য একমাত্র উপায় মানসিক প্রস্তুতি। প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি এই মানসিক বিকাশকে তরান্বিত করতে পারে মাত্র। তাই বিশ্বের নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ আজ স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষকরাই হলেন প্রকৃত নেতা আর স্কুলগুলি হল প্রকৃত প্রতিষ্ঠান যেখানে বিশ্বের ভাবী নাগরিক তৈরী হয়[1]। আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি, সম্মেলন প্রভৃতি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। কিন্তু পরিণত বয়স্কদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে পরিবর্তন নিয়ে আসা যত দুরূহ, শিশু-মনকে প্রয়োজনীয় রূপ দান করা তত দুরূহ নয়। বিদ্যালয়ে এই শিশু-মনে রূপদান করেন শিক্ষকরাই। এই শিশুই বিশ্বের ভাবী নাগরিক। বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও বিশ্বশান্তির অনুকূল শিক্ষার মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যৎ জীবনে হবেন ডাক্তার,

---

1. "Schools may, and generally do present the best elements in the surrounding culture; they should be and they generally are, above the average level of the Community in their regard for truth and honesty and fair dealing. They contrive to raise appreciably the standards and values of people."—The education and Training of Teachers.: UNSCO Pamphlet 1952. P. 22.

ইঞ্জিনীয়ার, রাজনীতিবিদ্, শিক্ষক, সমাজকর্মী ইত্যাদি। এই বিদ্যার্থীমণ্ডলীর মানসিক ক্ষেত্রে যদি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, সহাবস্থান, সহযোগিতা, উদারতা, বদান্যতা ও পরমতসহিষ্ণুতার বীজ বপন করা যায়, তাহলে বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে।

২। আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিকাশের লক্ষণ (Implications of International Understanding):

অন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সম্পর্কে জ্ঞান বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি প্রণিধানযোগ্য:

(ক) স্বদেশ ও সমাজের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(খ) বিশ্বের ভিন্নতর জনসমাজ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ।

(গ) বাহ্যিক পার্থক্যের অন্তরালে মানবিক অভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ।

(ঘ) আন্তর্জাতিক বিষয়ে জ্ঞানলাভের স্পৃহা অর্জন ও বিকাশ।

(ঙ) সঠিক গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশ্ব সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ।

(চ) বিশ্ব নাগরিক হিসেবে জনগণের অবদান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক অবগতি।

(ছ) বিশ্ব সমস্যা সমাধানের অনুকূলে স্বদেশ প্রেমকে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত করা।

(জ) বিশ্বজনের পরস্পর নির্ভরশীলতার কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ।

(ঝ) বিশ্বকে একক ধরে মানব সমাজের গতি-প্রকৃতি সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, শারীরিক-মানসিক প্রচেষ্টার পরিণতি বিষয়ে ধারণা লাভ।

(ঞ) মানবোচিত শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন।

(ট) যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির গৌরব, অসত্য থেকে সত্যেকে উচ্চাসন দেওয়ার মানসিক শক্তি অর্জন।

৩। শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education):

আজকের এই সভ্যতা-সঙ্কটে শিক্ষাই একমাত্র মুক্তির উপায়। আধুনিক পৃথিবীর সমস্যাবলী শিক্ষাবিদদের সামনে নিয়ে এসেছে গুরুদায়িত্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার

আহ্বান (challenge)। শিক্ষা যদি বিশ্বজনীন, বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক বোঝা-পড়ার অনুকূলে না হয়, তাহলে মানবসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির একটি হল যুযুৎসা প্রবৃত্তি (fighting instinct)। এই প্রবৃত্তিকে ধ্বংসাত্মক অথবা গঠন মূলক করে তোলা যায়। এর জন্য চাই শিক্ষাগত কোন প্রভাব। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সে কৌশল আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। যুগাবর্তে মানুষ প্রাচীন পশু প্রবৃত্তি হারিয়ে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে মানুষ সৈনিকজীবন অপেক্ষা নাগরিক জীবন পছন্দ করে অর্থাৎ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। মানুষের এই ঐতিহাসিক পথক্রমায় শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিক্ষা মানুষের মানসিক পরিবর্তন আনতে পারে নি। ফলে সভ্যতায় এসেছে সঙ্কট। তাই আবার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে মানুষের অন্তর ও বাইরের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে। যুযুৎসা প্রবৃত্তিকে প্রতিযোগিতার প্রলেপ দিয়ে সংগঠনমুখী করে তুলতে হবে।[1]

এই বিশ্বের ভাবী নাগরিক স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবনগঠনে নিয়োজিত। মানব জীবনে শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত একটি বছর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিকাশোন্মুখ দেহ-মন নমনীয় থাকার ফলে অভিপ্রেত আদর্শ ও বিশেষ বিশেষ মানসিকতা এ সময়ে তাদের মনে সঞ্চারিত করা সহজ। পৃথিবীকে যদি ঠিক মনুষ্য বসতির উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে ভাবী নাগরিককে ঠিক মানবিক ধর্ম বিকাশের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাহলে বিশ্বশান্তির স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে।

শিক্ষা মানুষকে হিংসা, দ্বেষ, বাদ-বিসম্বাদ, পরশ্রীকাতরতা সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। শিক্ষাই অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর মনে আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে আসতে পারে। আজকের দেওয়া শিক্ষার উপর বিশ্বের সুসভ্য

1. Education shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, social or religions groups and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace."

—Universal Decleration of Human Rights, Article 62

মানব সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে। ভবিষ্যৎ সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এই শিক্ষার ফলশ্রুতির মধ্যে নিহিত।[1]

স্কুল হল সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্বীয় জীবনের প্রথম অংশে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি লাভ করে। এই ছোট্ট বয়সে তারা যে শিক্ষা পায় তার প্রভাব সুদূর প্রসারী। ছোটবেলার এই বন্ধুত্ব, আদান-প্রদান, সাধারণ খেলা-ধূলা, পড়াশুনা, আনন্দ-আহ্লাদ ইত্যাদি যা তারা বিদ্যালয় জীবনে পায় তাই তাদের জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। সুতরাং আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনুধাবণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কলা-কৌশল, আচার-ব্যবহার ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময় এই বিদ্যালয়ের ক-টি বছর। এই বয়সে যদি তারা এই শিক্ষা পায় যে, অস্ত্র কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, আন্তর্জাতিক ভাববিকাশই শান্তির একমাত্র পথ, আধুনিক বিজ্ঞানকে সংগঠনমুখী করাই মানবিক ধর্ম—তাহলে মানুষ আবার শন্তিপূর্ণ আবহাওয়া ফিরে পাবে, ফিরে পাবে তার সাধের পৃথিবীকে—যেখানে গড়ে উঠবে মানবিক ধর্মে দীক্ষিত মানবজাতির ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আবাস।

৪। শিক্ষাকর্ম পরিচালনার নীতি (Principles for guiding Educational efforts):

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পেছনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য চাই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি, যাকে অনুসরণ করলে সতিাই সুফল লাভ কর সম্ভব।

প্রথমতঃ, শিক্ষা যেন জাতীয় বোধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বোধের বিকাশ সাধন করে। নিজেকে চিনতে পারলে পরকে জানা বা চিনে নেওয়া সহজ। তাই

---

1. "Our world is a mad world. The world has become so intolerably tense, so charged with hatred, so filled with misfortune and pain that man have lost the power of balanced judgement which is needed for emergence from the slough in which mankind is staggering. The source of all this does not lie in the external world, nor does it lie in the purely cognitive part of our nature, sincc we know more than man knew before. It lies in our passions, it lies in our emotional habits, it lies in the sentiments instilled in youth and in the phobias created in infancy. The cure for our problems is to make men sane, and to make them sane, they must be educated sanely."
--Russel.

শিক্ষাকর্ম এমনভাবে পরিচালিত হবে যেন শিক্ষার্থীরা স্বদেশ ও সভ্যতাকে জানতে পারে। এই জানার মধ্যে থাকবে মানসিক ক্ষেত্রের প্রসারতা, যার ফলে মানবমন আন্তর্জাতিক বিষয়কে অনুধাবন করতে শিখবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধন করতে পারে। স্বাধীন চিন্তার মধ্যে থাকে যুক্তি ও বিচার। শিক্ষার্থী যেন মিথ্যা গুজব ও কুসংস্কারকে যৌক্তিকতা দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে শেখে। বর্তমান যুগ প্রচারধর্মী। তাই যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে না শিখলে মিথ্যা, অপপ্রচারে প্রভাবান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষা যেন মানবজাতির ঐক্য ও পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মানসিক সংকীর্ণতা মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। শিক্ষাই এই বাধা দূর করতে পারে। যে নীতি ও আদর্শ একটা দেশের আভ্যন্তরীণ ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলে সেই একই নীতি ও আদর্শ অন্য দেশের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ ও মানবতাবোধ জাগাতে পারে। শিক্ষাই মানুষকে এই আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

চতুর্থতঃ, শিক্ষাকর্ম এমন হবে যেন তা শিক্ষার্থীর মনে সাহস সঞ্চার করতে পারে এবং সে যেন মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখে। এজন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার মাধমে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন থেকে পরভীতি দূরীভূত করা। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, সমাজে সমাজে বিশ্বাস ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার এই হল সহজতর পন্থা।

পঞ্চমতঃ, সমবেত দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ভিত্তি। শিক্ষার্থী যেন অনুধাবন করতে পারে যে এই এক পৃথিবীর তারা নাগরিক। বিশ্বের দূর প্রান্তেও থাকেন তাদের আত্মীয়, বন্ধু—তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ভাগীদার। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত হবে বিশ্বের প্রতিটি লোকের ও প্রত্যেকটি সমাজের জন্য। তারা প্রত্যেকেই বিশ্বের সমবায় সমিতির সভ্য। এই সমিতির উন্নতির জন্য তাদের অনেক দায়িত্ব রয়ে গেছে।

ষষ্ঠতঃ, একক বিশ্ববোধের অনুকূলে শিক্ষার্থীর গুণাবলী বিকাশের জন্য শিক্ষক হবেন উপযুক্ত ও সুদক্ষ পরিচালক। তাঁরই দক্ষতার উপর পৃথিবীর ভাবী নাগরিকের জীবন ও সমাজের সুখ-স্বচ্ছন্দ নির্ভর করে।

সপ্তমতঃ, আন্তর্জাতিক বোধশক্তি বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে যাতে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া যায় তার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কথা ও কাজের মিলন ব্যতীত কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত শিক্ষক যেন সুযোগের অভাবে শিক্ষার্থীকে উক্ত আন্তর্জাতিক বোধ-বিকাশে অকৃতকার্য না হন।

৫। বিশ্বজনীন জ্ঞান বিকাশের উপায় (Means of developing International Understanding) :

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য শিক্ষাই একমাত্র পন্থা এবং এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় জীবনেই সুরু করা প্রয়োজন—একথা সর্ববাদী সম্মত। এখন প্রশ্ন হল, বিদ্যালয় কিভাবে এই শিক্ষা পরিচালনা করবে? এর জন্যে কি নতুন কোন পাঠ্যবিষয় নির্ধারণের প্রয়োজন আছে? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট প্রচলিত পাঠক্রম (curriculum) অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর নিকট বোঝা স্বরূপ (burden)। সুতরাং নতুন বিষয় প্রবর্তনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রচলিত পাঠক্রম, কর্মসূচী, অতিরিক্ত সহ পাঠক্রম (extra-curricular activities) প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্বজনীন জ্ঞান বিকাশের উপায় উদ্ভাবন করা যায়। শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার, বিশেষ বিশেষ বিষয় ও পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপনা, শিক্ষার বিভিন্ন কর্ম ও তার অভিব্যক্তির মধ্যে নিহিত আছে বিশ্বজনীন জ্ঞান বিকাশের উপায়। সেই উপায়ের ধারক ও বাহক হবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ শিক্ষক।

(ক) সত্যবার্তা পরিবেশন : (Presentation of Facts) : বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর মন সহজে যে-কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সহজে চিত্তাকর্ষক বিষয় শিশু-মনে ছাপ রাখতে পারে। তাই, কোন ঘটনা পরিবেশনের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অসত্য ঘটনাকে ঠিক অসত্য এবং সত্যকে ঠিক সত্যরূপে তাদের কাছে পরিবেশন করা বাঞ্ছনীয়। বিষয় পরিবেশনের দুটি দিক আছে। প্রথমতঃ, শিক্ষক কর্তৃক বিষয় পরিবেশন; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী কর্তৃক বিষয় গ্রহণ। পরিবেশিত বিষয় গ্রহণের জন্য যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে গ্রহণ-ক্ষমতার বিকাশ সাধন প্রয়োজন। শিক্ষার্থী যেন স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা স্বাধীনভাবে বিচার করে নিতে পারে যে, কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি

অসত্য। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে শিক্ষক যেন অন্য দেশ ও সমাজের প্রতি কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বা বিদ্রূপসূচক উক্তি না করেন। শিক্ষার্থীর মনে অন্য দেশবাসী ও সমাজ সম্পর্কে হীনমন্যতার সৃষ্টি হয় এমন কোন বক্তব্য পরিবেশন না করাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় রাষ্ট্রনৈতিক পক্ষপাতিত্ব,, মিথ্যা সংবাদ প্রভৃতি শিশু-মনে অশ্রদ্ধা, সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীর ভাবী নাগরিকের মন এভাবে কলুষিত হলে আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিকাশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে।

(খ) **পাঠক্রমে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া (International Understanding through curriculum):** ভারতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে প্রচলিত পাঠক্রম (curriculum) আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য কতটুকু কার্যকরী দেখা প্রয়োজন। কারণ, এমনিতেই অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর নিকট প্রচলিত পাঠক্রম নিতান্ত ভারবোঝা স্বরূপ, এর উপর আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য নতুন কোন বিষয়ের প্রবর্তন সমীচীন নয়। তাহলে প্রচলিত পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা-কর্মকে এমন পথে পরিচালিত করতে হবে যেন ভাবী নাগরিকের মানসিক কাঠামো আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও বিশ্বশান্তির অনুকূলে প্রভাবিত হয়।

(১) **সমাজবিদ্যা:** পাঠ্যতালিকায় সমাজবিদ্যা বিশ্বজনীন জ্ঞান বিকাশের উপযোগী পাঠ্যবিষয়। বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষার্থী একদিকে যেমন স্বদেশ, সমাজ ও নিজেকে জানতে পারে তেমনি আবার বিদেশী সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। আমাদের দেশে প্রচলিত সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি ও পৌরনীতি প্রভৃতির বিষয়বস্তু অন্বিত করে রচিত। বর্তমানে বিষয়টির গতিধারা (trend) মানুষ ও তার সমাজজীবন সম্পর্কিত আরও বহু বিষয় সংযোজনার অনুকূলে। সুতরাং মানবতার প্রতি চেতনা ও শ্রদ্ধা জাগরণের পক্ষে এই বিষয়টি অতি প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার অনুকূল প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সামগ্রীর একত্র সন্নিবেশ আমরা সমাজবিদ্যার পুস্তকে দেখতে পাই।

এখন আমাদের দেখা দরকার সমাজবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর দ্বারা কিভাবে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক ভাবধারা ও জ্ঞানবিকাশে সাহায্য করা যায়। সমাজবিদ্যার যে-কোন বিষয় উপস্থাপনার সময় আঞ্চলিক বা বিভাগীয় সীমিত পরিবেশ অতিক্রম করে বিস্তৃততর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সামাজিক সম্পর্কের সূত্রকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু পরিবেশনের সময় অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, বিবাদ

প্রভৃতির কারণ অনুসন্ধানের সময় সঠিকভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় কারণ প্রভৃতি বর্ণনা করা অপরিহার্য। বর্তমান যুগে যুদ্ধ ও অশান্তিকে এড়াতে গেলে আমাদের কোন্ পথে পরিচালিত হতে হবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণাকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই সব যুদ্ধ ও বিবাদে স্বার্থান্বেষী যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেন এইটাই অনুভব করতে পারে যে, জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ অতীতের তুলনায় শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। এটা মানুষেরই অবদান, এই অবদানে শিক্ষার্থীকে অংশীদার হতে হবে।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইতিহাস রাজা, শাসক ও একনায়কের পরিচালনায় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, আর আক্রমণ, প্রতিহিংসা, উচ্ছেদ আর ধ্বংসের ঘটনা দিয়ে রচিত হত ; সেই ইতিহাস আজ আর রাজাদের কাহিনী এবং স্বৈরী শাসকদের বংশধারা, সাল, তারিখ আর কুকর্মের বিবরণে রচিত হতে পারে না। মানুষের ইতিহাস সমাজ ও মানুষের সমস্যাকে বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না। প্রকৃত ইতিহাসে আছে সামগ্রিক মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাহিনী। এসব মিলিয়েই হবে মানুষের খাঁটি ইতিহাস।

সঠিক ইতিহাস পাঠে জাতিতে জাতিতে হিংসা-প্রতিহিংসার ভাব জাগতে পারে না। মানবজাতির সমৃদ্ধি ও প্রগতিতে প্রতিটি জাতির অবদান কম বেশি থাকলেও, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সকলের ইচ্ছাই সমান। জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া ও মানবিক সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করে তোলাই ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা হওয়া বিধেয়। আর এই পথেই সম্ভব হবে আমাদের ভাবী সমৃদ্ধি।

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, সমাজবিদ্যার মাধ্যমে পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক প্রভৃতি কর্মের আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে বিশ্বপ্রীতি জাগান যায়। শিক্ষক যদি নিজেকে বিশ্ব চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেন তবে সমাজবিদ্যার যা কিছু তিনি পরিবেশন করবেন সবই শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করবে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের মাধ্যমে পরিবেশিত জ্ঞান যে-কোন শিক্ষার্থীকে সহজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

সমাজবিদ্যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিষয় ছাড়া অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদি পরিবেশনে জাতিপুঞ্জের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর

স্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করা যায়। কিভাবে মানুষ এই পৃথিবীতে বসতি, বাণিজ্য, রাজ্যবিস্তার করল তা মানচিত্রের দ্বারা দেখান যায়। সমাজে সমাজে খাদ্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের প্রাণশক্তি লাভের প্রচেষ্টা যে সমান, বস্ত্র ও পোষাকের ভিন্নতা সত্ত্বেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা যে এক, সভ্যতার ভিন্নতা থাকলেও শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা যে অভিন্ন—সেই জ্ঞান লাভের পথে শিক্ষাকর্মকে পরিচালিত করা যায়। ভৌগোলিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় উত্তর হিমালয়ের বায়ুর অস্তিত্ব না থাকলে শীতকাল উপলব্ধি করা যেত না ; ভারত মহাসাগরের বায়ু না হলে বৃষ্টিপাত হত না, আবার দেখা যায়, ভূমধ্যসাগর শুধু একটা জাতিকে নয়, একাধিক মহাদেশের একাধিক জাতিকে প্রভাবিত করে। কোন অঞ্চলের কোন সমাজ বা কোন জাতি আজ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যে-কোন দিক থেকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাঁচতে পারে না। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুই কেবল শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট ভাবে এই ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

সংখ্যালঘু শ্রেণী বা জাতি, আদিম বা মধ্যযুগীয় কৃষ্টি সম্পন্ন জাতি—সকলকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে একই মানবিক আসনে। আমার দেশ শ্রেয়, অন্যদেশ অসভ্য, অন্য জাতি নীচ এরূপ উক্তি ঠিক শিক্ষিত জনের কথা নয়। আমাদের বাংলা দেশে প্রচলিত সমাজবিদ্যার অনেক পুস্তকে 'নিম্নশ্রেণী, নীচ জাতি' ইত্যাদি কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কথাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে যে কিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। একই শ্রেণীতে বাংলার বিভিন্ন সমাজের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। পুস্তকে সমাজের যে শ্রেণা নীচ বলে বর্ণিত হচ্ছে, হয়ত সেই শ্রেণীর এক বা একাধিক শিক্ষার্থী সেই বিদ্যালয় কক্ষে বসে আছে। এরূপ বিষয় পাঠে স্বভাবতই এই শিক্ষার্থীদের মনে হীনমন্যতা (Inferiority complex) জেগে ওঠে। এই হীনমন্যতা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির অন্তরায়। এগুলি যেমন একটা দেশের জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পরিপন্থী তেমনি, "My country, right or wrong, 'The Chinese are cruel and secretive,' The Germans are militaristic"—ইত্যাদি উক্তি আন্তর্জাতিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। সমাজবিদ্যা শিক্ষার সময় উক্ত প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

সমাজবিদ্যার বিষয়ভুক্ত জাতিপুঞ্জ (UNO) এবং তার অঙ্গ ইউনেস্কো প্রভৃতি পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যাপক আকারে আন্তর্জাতিকভাবে ভাবিত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা পদ্ধতি মূলক পত্র-পত্রিকা রচিত ও প্রচারিত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌রা সেগুলি সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের পাঠের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্টি-সভ্যতার অনুকূল পরিবেশ গঠনের জন্য নিজেরাও চেষ্টা করতে পারেন। শুধু সমাজবিদ্যা নয় যে-কোন বিষয় শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম আর সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণ সকলেরই।

পাঠ্য তালিকার মধ্যে সমাজবিদ্যা যদিও আন্তর্জাতিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত বিষয় তবু কেবলমাত্র একখানা পুস্তক এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে অক্ষম। তাই পাঠ্যসূচীর (curriculum) অন্যান্য বিষয়াদিকেও পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূল করে তুলতে হবে। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের সময় মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সভ্যতা ও প্রগতির পরিণতিতে অবদান প্রভৃতিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। প্রতিটি পাঠ্যবিষয় মানুষ ও তার পরিবেশকে একেবারে পরিত্যাগ করে রচিত হয় না। প্রতিটি দেশের কবিতা তার জীবনধারা ও কৃষ্টি-সভ্যতার স্মৃতি বহন করে, দেশের বিজ্ঞানও মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, সঙ্গীতে ফুটে ওঠে মনের অভিব্যক্তি, অঙ্কশাস্ত্রে প্রকাশিত হয় হিসেব ও সংখ্যাতত্ব। তাই পাঠ্যতালিকাই সমবেত ভাবে আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিকাশে সাহায্য করতে পারে।

(২) **বিদ্যালয় পরিবেশ**ঃ পাঠ্যতালিকা ছাড়া বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেও এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়। প্রচলিত ব্যবস্থায় শ্রেণীকক্ষে সার্বজনীন শিক্ষাদান সর্বত্রই পরিচালিত। মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রক্ষার কথা থাকলেও সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনে শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত। একই শ্রেণীতে বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি হরিজন সম্প্রদায়ের কোন শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীদের কাছে হেয়, হীন, নীচ ও অবজ্ঞেয় বলে বিবেচিত হয় তবে এর ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষা স্বপ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। দৈনন্দিন শিক্ষাকর্মে শিশুরা যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের সঙ্গে আন্তরিক যোগসূত্র রচনা করা যদি সম্ভব না হয়, যদি গণতান্ত্রিক

জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না পারে, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সমবায় জীবন-যাপন ও দায়িত্ববোধ শিশু-মনে জেগে না ওঠে, তাহলে আন্তর্জাতিক শিক্ষালাভ হতে পারে না। বিদ্যালয় পরিবেশে এর অনুকূল আবহাওয়া প্রবাহিত করা প্রয়োজন। শিক্ষকগণ তাদের উদার মনোভাব ও কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন[1]। বিদ্যালয় পরিবেশে, সভা, সমিতি বা কোন অনুষ্ঠানে বৈদেশিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রীতি গড়ে উঠতে পারে। বিশ্বশিশুদিবস, শিক্ষক দিবস, রাষ্ট্রসংঘ দিবস, ইউনেস্কো দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিবিদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতির আগমনে এইরূপ আন্তর্জাতিক মিলন ও যোগাযোগ সফল করে তোলা যায়। স্বদেশে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এরূপ জাতীয় মিলন অনুষ্ঠান পালন করে শিক্ষার্থীদের মানসিকক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া যায়। দেশীয় বৈচিত্র্যে ঐক্য প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার মনোবৃত্তি গঠনের ভিত্তি তৈরী হয়।

বর্তমান শতাব্দীতে সরাসরি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আছে। আন্তর্জাতিক শিবির, আন্তর্জাতিক পাঠচক্র, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়, ভ্রাম্যমান পাঠচক্র, শিক্ষাপ্রদর্শনী, পেন ফ্রেণ্ডশিপ, ছায়াচিত্র, বৈদেশিক নাটক অভিনয়, উপহার বিনিময়, আন্তর্জাতিক কলা ও চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময় সহজে সম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত দেশের সকল শিক্ষার্থীই এ সকল অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ ছাড়া বিস্তৃত ভূখণ্ড পড়ে আছে ভারতভূমিতে। এসব সহরের সরকারী শিক্ষাশিবিরে প্রতিপালিত মুষ্টিমেয় সন্তানরাই কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার শিক্ষা গ্রহণ করলে বিশ্বশান্তি ও মানবিক শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হবে না। সহরের ছাত্রদের লব্ধ জ্ঞান আস্তে আস্তে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে ইতিহাসের শিক্ষা স্মরণ করা উচিত। বিগত শতাব্দীতে ইংরেজ-অনূদিত ক্রমনিম্ন পরিস্রুত মতবাদ (Downward filtration theory) নিষ্ফল হয়েছিল। সুতরাং আমাদের প্রচেষ্টা হবে দেশব্যাপী সমশিক্ষার সুযোগ দান। জনগণ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতা পেলে শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পালনে নিশ্চয়ই সফলকাম হবেন।

---

1. V. R. Taneja : Teaching of Social Studies P. 189.

দ্বাদশ অধ্যায়

সমাজবিদ্যার শিক্ষক

(The teacher of the Social Studies)

১। সমাজবিদ্যা শিক্ষকের গুরুত্ব (Importance of the teacher of the Social studies):

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির ন্যায় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে নবজাগরণ। আজ ভারতের সর্বস্তরের শিক্ষায় সুরু হয়েছে পুনর্গঠনের পালা। নতুন বিষয়বস্তু সহ সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যরূপে গৃহীত। নতুন বিষয়টির জন্য যেমন নবনব পদ্ধতির প্রয়োজন তেমনি পদ্ধতিটি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন নতুন শিক্ষক। এ ক্ষেত্রে সমাজবিদ্যা শিক্ষকের দায়িত্ব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজবিদ্যা এমনিই একটা বিষয় যার লক্ষ্যে পৌছবার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই একত্রে বিষয়বস্তুর বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিমগ্ন হতে হয়। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক আর বন্ধু (guide, philosopher and friend)। সমাজবিদ্যা পুঁথিগত বিদ্যায় সীমিত নয়। শিক্ষার্থীর চতুস্পার্শের বিস্তৃত সমাজ ও পরিবেশ সমাজবিদ্যার গবেষণাগার। এখানেই পুঁথিবেষ্টিত তত্ত্বের (theory) পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ পরিচালিত হয়। সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের পদ্ধতি শুধু বক্তৃতা, আলোচনা ও গ্রন্থানুসারে পরিচালিত হয় না। এখানে কর্মকাণ্ড, সমস্যা, সমষ্টিগত, দলগত প্রণালী, সমাজীকরণ পদ্ধতি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় অভিযান, ভ্রমণ, ফিল্ড ট্রিপ, ফিল্ড ওয়ার্ক, শিক্ষাসহায়ক কার্যাবলী ইত্যাদি। এই সব পদ্ধতি প্রয়োগ ও পরিচালন দক্ষতা নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ, তাকে সামাজিক, সুনাগরিক, বিশ্বপ্রেমিক করে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। কাজে-কাজেই শিক্ষককে হতে হবে সর্বজ্ঞ, সর্বদক্ষ ও শিক্ষার্থীদের সহযোগী। তাঁকে ভারতের বৈচিত্র্যের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ঐক্য। কেবল ইতিহাস, ভূগোল বা অর্থ নীতিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করলে চলবে না, মানবজীবন ও সমাজকে কেন্দ্র করে সমুদয় প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে মাল মশলা সংগ্রহ ও তার সংশ্লেষণের বিশাল

দায়িত্ব শিক্ষকের। তাঁকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে মানবিক সম্পর্কে (Human relationship), বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সামাজিক পরিবেশ, যেখানে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিকাশ হবে স্বতঃস্ফূর্ত।

২। শিক্ষকতায় প্রবণতা (The motive for teaching profession):

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁর গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে সমাজবিদ্যার শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে, তিনি এই দায়িত্বভার বহন করবেন কি না। যে-কোন পেশা অবলম্বনের সময় মানুষ সাধারণতঃ দুটো দিক থেকে অনুপ্রাণিত হয়,—একটি অর্থনৈতিক প্রেরণা, অন্যটি ভাবপ্রবণতার দিক। প্রথমটির মাধ্যমে তিনি চান অর্থ ও সম্পদ—যার দ্বারা সাংসারিক জীবনে একদিকে যেমন সুখ ও সমৃদ্ধিলাভ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি উহার সদ্ব্যবহার দ্বারা জীবনে সম্মান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়। দ্বিতীয়টি দ্বারা তিনি চান সেবা ও আত্মনিয়োগ। যারা দ্বিতীয়টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তারা পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির দিকে অধিক মনোযোগী নন, ফলে উৎসর্গ জীবন যাপনে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অর্থলাভের আশা দুরাশা মাত্র। শিক্ষক জীবন উৎসর্গীকৃত—কর্মে সফলতাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বড় কথা। ব্যবহারিক জগতে এই বিমূর্ত ভাবপ্রবণতা পোষণ করেন অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি। তাই শিক্ষকতায় যারা আসেন তাদের অধিকাংশই এটাকে ভবিষ্যৎ জীবনে আর্থিক লাভ জনক অন্য কোন উন্নততর কর্মসংস্থানের একটা ধাপ বলে মনে করেন। সুযোগ পেলেই পেশান্তরে চলে যান। অবশ্য অনেকের ভাগ্যে সে সুযোগ আসে না। ফলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতায় জীবন অতিবাহিত করেন। আবার একদল শিক্ষক থাকেন যারা উৎসর্গীকৃত জীবন ও অর্থলাভ—কোনটিই পছন্দ করেন না। তারা শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করেন স্বল্পশ্রমজনিত সুযোগ, অবকাশ ও আরাম উপভোগের জন্য। শেষ পর্যন্ত তাদের এ আশা পূর্ণ না হলে কর্মত্যাগ করেন অথবা ব্যর্থ জীবনের বাকি দিন-গুলি নিরাশায় কাটিয়ে দেন। এশ্রেণীর কাছ থেকে সমাজ কিছুই আশা করতে পারে না। কেননা অর্থলিপ্সু ও আরামপ্রিয় ব্যক্তির দ্বারা শিক্ষাকর্ম পরিচালিত হতে পারে না। শিক্ষকতার জন্য চাই আত্মোৎসর্গী প্রেরণা।

ব্যবহারিক জগতে আত্মোৎসর্গী প্রেরণা যতই থাকুক না কেন, শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা অতি প্রয়োজনীয় ও একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকতা কর্মের গুরুত্ব অনুভব ক'রে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষকের অর্থ নৈতিকউন্নতির চেষ্টা করতে হবে। জাতির সামগ্রিক প্রচেষ্টায় শিক্ষকের আত্মোৎসর্গী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে হবে ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের ক্ষেত্রেও এ প্রতিবেদন প্রযোজ্য। অ-শিক্ষক হয়ত জানেন না যে, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কাজের পর শিক্ষককে যথেষ্ট পড়াশুনা, শিক্ষার্থীদের লিখিত বিষয়গুলির মান নির্ণয় (evaluation), পরের দিনের কর্মসূচী বিষয়ে প্রস্তুতি, বিদ্যালয় কর্ম তালিকা বহির্ভূত কাজকর্ম, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে বার্তা সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মে লিপ্ত থাকতে হয়। একাজের জন্য তাঁর একমাত্র পুরস্কার শিক্ষার্থীর সাফল্য ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ। যিনি ফল স্বরূপ এই আনন্দের লোভে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। সমাজ এরূপ যোগ্য শিক্ষকের প্রাচুর্য কামনা করে।

৩। শিক্ষকের অত্যাবশ্যক গুণাবলী (Essential qualifications of a teacher) :

জাতির মেরুদণ্ড যে শিক্ষক, যাকে ভবিষ্যৎ সমাজের স্রষ্টা হিসেবে গৌরবান্বিত করা হয়, তিনি যে সর্বগুণের আধার হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষাকর্মে সাফল্যের জন্য তাঁর মধ্যে বাঞ্ছিত বহুগুণের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি গুণ অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি, যথা,—(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা (Academic qualification), (খ) বৃত্তিগত যোগ্যতা (Professional qualification) এবং (গ) ব্যক্তিত্ব (personality).

(ক) **শিক্ষাগত যোগ্যতা (Academic qualification) :** যথাযথ, কার্যকরী ও সার্থক কর্ম সম্পাদনের জন্য সমাজবিদ্যার শিক্ষকের প্রথমতঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক ও সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের দেশে অধিকাংশ শিক্ষকই একটি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের পক্ষে ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্ততঃ দুটি বা তিনটিতেই বিশেষ পরিদর্শিতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে শিক্ষক যদি উপযুক্তরূপে

তৈরী না হন তাহলে তাঁর পক্ষে শিক্ষার্থীকে সঠিক উপায়ে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষককে প্রচলিত আধুনিক সমাজ, রাষ্ট্র ও চলতি প্রসঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হতে হবে, অন্যথায় শিক্ষাকর্মে অকৃতকার্যতার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

শিক্ষাকে অভিজ্ঞতামুখী ও জীবনকেন্দ্রিক করার দিকে বর্তমান শিক্ষাকর্মের প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থী আজ আর শ্রেণীকক্ষের নীরব শ্রোতা নয়। শিক্ষার্থী এখন পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। তাই অনেকে মনে করেন, শিক্ষক যদি শুধু পরিচালন কর্মে দক্ষ হন তাহলেই যথেষ্ট; শিক্ষর্থীকে শিক্ষায় সাহায্য করার জন্য কতকগুলি পুস্তকের নামের সঙ্গে পরিচয়, আর কার্যসূচী প্রণয়নের দক্ষতা থাকলেই শিক্ষকতা কর্মের উপযুক্ততা অর্জন করা যায়। "we are teaching pupils, not subject matter."—এই মতের বশবর্তী অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষকের বিষয়বস্তুর উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। পাণ্ডিত্য থাকলে বরং শিক্ষক তা প্রকাশ করবার জন্য উদগ্রীব হবেন। ফলে শিক্ষার্থী হবে অকর্মন্য নীরব শ্রোতা। এবং পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যার দিকেই তার প্রবণতা সৃষ্টি হবে অধিক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মূলক। অজ্ঞ অথবা সব জান্তার পক্ষে শিক্ষকতা করা অসম্ভব। জানাবার ইচ্ছা বা শেখাবার ইচ্ছাই জানাতে ও শেখাতে পারে। জ্ঞানের গভীরতার মাধ্যমে শিক্ষক হতে পারেন শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক ও বন্ধু। পশু চারণে পরিচালককে তৃণের সন্ধান রাখতে হয়। সেইরূপ শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুর খবরাখবর না রেখে শিক্ষক হওয়া শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, অসম্ভবও বটে। সুতরাং সমাজবিদ্যার শিক্ষকের প্রথম প্রয়োজন বিষয়গত পাণ্ডিত্য অর্জন।

(খ) বৃত্তিগত বা পেশাগত যোগ্যতা (Professional qualification): বিষয় সম্পর্কে অসাধারণ পণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষককে শিক্ষকতায় অকৃতকার্য হতে দেখা যায়। মূলতঃ পণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও শিক্ষণ পদ্ধতিতে অপটুতাই এই বিকলতার অন্যতম কারণ। অনেকে বলেন, কবিদের মত প্রকৃত শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন, তাকে তৈরী করা যায় না। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। চেষ্টার দ্বারা নানাবিধ কৌশল ও দক্ষতা লাভ করা যায়। শিক্ষকোচিত গুণ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান আছে এমন শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য। অথচ দেশ ব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের

সংখ্যা বৃদ্ধি করাও নিতান্ত প্রয়োজন। তাহলে আজন্ম দক্ষ (born teacher শিক্ষকের অপেক্ষায় থাকা আর সম্ভব নয়; শিক্ষককে তৈরী করে নিতেই হবে। তাই শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা অর্জন অপরিহার্য।

সমাজবিদ্যা জটিল ও বহুবিষয়ের সংশ্লেষিত রূপ। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উপযোগিতা দ্বারা দেশের ভাবী নাগরিককে গড়ে তুলতে হলে চিরাচরিত পদ্ধতির সীমা অতিক্রম করে নতুন পথ আবিষ্কার ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার শিক্ষা পদ্ধতি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। নতুন প্রণালীতে বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করতে হবে সামাজিক পরিবেশ আর সমাজে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার আবহাওয়া। শুধু তত্ত্বগত জ্ঞানের পাণ্ডিত্য নিয়ে এই গুরুভার বহন করা সম্ভব নহে। তাই বিভিন্ন পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

(গ) **ব্যক্তিত্ব (Personality) :** সার্থক শিক্ষাকর্মের জন্য শিক্ষকের পক্ষে তৃতীয় অপরিহার্য বিষয় হল তার ব্যক্তিত্ব। বহু মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সহযোগে গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিত্ব আর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। ব্যক্তিত্বের মূলে থাকে সহজাত গুণাবলি। এই সহজাত প্রবণতা বা গুণাবলীকে একজন চেষ্টা করে কতটুকু পরিবর্তন করতে পারে তা বিতর্ক মূলক প্রশ্ন; কিন্তু দেখা গেছে শিক্ষার সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির রূপ বিবর্তিত হয়। ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। এই ব্যক্তিত্বের উপাদান গুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুযোগ এখানে নেই। শুধু ব্যক্তিত্বের যে বিশেষ বিশেষ অংশ শিক্ষকের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন সেটুকুই আমাদের এখন বিবেচ্য। এই প্রয়োজনীয় অংশটুকুকে আমরা মোট তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি— (১) আংগিক চেহারা (Physical aspects), (২) নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive virtues) এবং (৩) কার্যনির্বাহী ক্ষমতা (Executive abilities)।

(১) **আংগিক চেহারা :** অনেকে আংগিক চেহারার দিকটাকে অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু শারীরিক গঠন মানুষের মনের উপর প্রথম প্রভাব (impression) সৃষ্টি করে। এজন্য কথায় বলে, আগে দৃশ্যধারী, পরে গুণ বিচারী। দৃশ্যধারী শুধু দেহের গঠন ভঙ্গীমার জন্য হয় না; এর জন্য প্রয়োজন হয় পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আদব-কায়দা, সুন্দর স্বাস্থ্য, ভাবপ্রকাশের

আভিজাত্য ও ভঙ্গিমা, ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিমা ও বিশুদ্ধতা—সব কিছু মিলিয়ে এই আংগিক চেহারা (physical aspect) বিষয়টি বোঝায়। দেহগত গঠন ভঙ্গিমার পথে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সচেতন হলে শিক্ষার্থী বা অন্যের মন আকর্ষণ করার উপযোগী চেহারা সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষকের প্রাথমিক সম্পদ হল আংগিক চেহারা বা সৌষ্ঠব।

(২) **নিষ্ক্রিয় গুণাবলী :** শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় প্রয়োজন হল নিষ্ক্রিয় গুণাবলী। এই গুণের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসরাজ্যে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এবং প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন যে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরেও, এমনকি আজীবন শিক্ষার্থী এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহ, প্রীতি, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, আন্তরিকতা, কৌশল ও দক্ষতা, ধৈর্য ও আত্মসংযম, উৎসাহ ও আশাবাদিতা ইত্যাদি এই নিষ্ক্রিয় গুণের অঙ্গ। শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব সৃষ্টি করার পক্ষে উক্ত গুণগুলিই যথেষ্ট। শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থী যদি প্রভাবিত না হয়, যদি শিক্ষার্থী গুরুকে শ্রদ্ধা, ভক্তি করতে প্রণোদিত না হয়, তাহলে বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর মন আকর্ষিত হতে পারে না। সমাজ বিদ্যার শিক্ষককে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার্থী হিসেবেই মিশে যেতে হবে। সুতরাং এসব গুণের অভাব থাকলে সমাজবিদ্যার শিক্ষক্ হওয়া অসম্ভব।

(৩) **কার্যনির্বাহী ক্ষমতা :** শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের তৃতীয় উপাদান তাঁর কার্যনির্বাহী ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলেই শিক্ষকের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয়। শিক্ষক হবেন প্রথম পর্যায়ের নেতা। অক্ষম ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে পারেন না। কাজেই তাঁকে অশেষ আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে। এই বিশ্বাসের ফলেই আসবে আত্মনির্ভরতা। ফলে অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত নিজেই কর্ম পরিচালনার উপযোগী উদ্যমের অধিকা[রী] হবেন। প্রকৃত যিনি নেতা তাঁর সামঞ্জস্য বিধানের অসীম ক্ষমতা থাকে। [ত]িনি যে-কোন অবস্থায় যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। অনেকে [প]রিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণে অক্ষম হন। [ব]াস্তব রূপায়ণের ক্ষমতা অর্জনের জন্য নেতাকে পরিশ্রমী ও সুষ্ঠু পরিচালক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রথম স্তরের নেতা হিসেবে শিক্ষককে এ সকল গুণের অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় শিক্ষাকর্ম পরিচালনা তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে।

৪। যোগ্যতার উন্নয়ন (Development of efficiency) ঃ

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নয়ন একান্ত কাম্য। পূর্বোক্ত আলোচনায় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর পরিচয় আলোচিত হয়েছে। শিক্ষক স্বীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীর উন্নতির জন্য নিজেই সচেতন ও সচেষ্ট হতে পারেন। স্বীয় চেষ্টাই এই উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে প্রচেষ্টার ক্ষেত্র-পরিধি ও সময় অতি সীমিত। সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ও কর্মমুখী করা প্রয়োজন। সমাজ-বিদ্যার শিক্ষককে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা ও শিক্ষককে বাস্তব কর্মমুখী করা যথেষ্ট সমস্যাবহুল। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এর বাস্তব রূপায়ণের অপেক্ষা না রেখে, শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হয়ে স্বীয় যোগ্যতার উন্নয়নে প্রবৃত্ত হতে হবে। যোগ্যতা পরিমাপক ও নির্ধারকের একখানি সূচী নিম্নে প্রদত্ত হল। এই সূচীটিকে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকরা শিক্ষকদের যোগ্যতার উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারেন ; আবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে সহকর্মীদের এই সূচী অনুসারে স্বীয় যোগ্যতা বিচারের জন্য অনুরোধ ও নিয়োগ করতে পারেন।

সমাজবিদ্যা শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারক সূচী (Rating Sheet for Social Studies Teachers) ঃ

বিষয় Items	অতি উত্তম Ex-cellent	উত্তম good	গড় Ave-rage	স্বল্পতা Poor
(ক) বিদ্যা (Scholarship) ঃ				
(১) বিষয়গত বিদ্যার গভীরতা (Sound know-ledge of Subject taught)।				
(২) সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি (Background of liberal education)।				
(৩) সাম্প্রতিক সমস্যার সঙ্গে পরিচয় (Acquain-tance with problems of present daylife)।				

বিষয় Items	অতি উত্তম Excellent	উত্তম Good	গড় Average	স্বল্পতা Poor
(৪) পত্র-পত্রিকা পাঠক (Reader of News paper & Magazines)।				
(৫) পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠক (Reader of books on Subject taught)।				
(খ) **পেশাগত পটভূমি (Professional background) :**				
(১) পেশাগত প্রবণতা (Professional attitude)।				
(২) পেশাগত শিক্ষণের গভীরতা (Sound Professional training)।				
(৩) শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকা পাঠক (Reader of Educational Magazines)।				
(৪) শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠক (Reader of Professional books)।				
(৫) যোগ্যতা উন্নয়নের প্রয়াস (Desire for imporvement)।				
(গ) **ব্যক্তিত্ব (Personality) :**				
(১) শারীরিক বৈশিষ্ট্য (Physical aspects)।				
(২) ব্যক্তির চেহারা (Personal appearance)।				
(৩) জীবনের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেতা (Recognition of the amenities of life)।				
(৪) কণ্ঠস্বর (Quality of voice)।				
(৫) ভাষা (Language)।				
(৬) স্বাস্থ্য (Health)।				

বিষয় Items	অতি উত্তম Ex-cellent	উত্তম Good	গড় Ave-rage	স্বল্পতা Poor
(ঘ) **নিষ্ক্রিয় গুণাবলী (Passive Virtues) :**				
(১) বন্ধুত্ব (Friendlyness)।				
(২) সহানুভূতি ও বোধ (Sympathy and Uuderstanding)।				
(৩) আন্তরিকতা (Sincerity)।				
(৪) কৌশল (Tact)।				
(৫) সততা (Fairness)।				
(৬) আত্ম-সংযম ((Self control)।				
(৭) আশাবাদিতা (Optimism)।				
(৮) উদ্যম (Enthusiasm)।				
(৯) ধৈর্য (Patience)।				
(ঙ) **কার্যনির্বাহী ক্ষমতা (Executive abilities) :**				
(১) আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা (Self Confidence and self reliance)।				
(২) উদ্যমশীলতা (Initiative)।				
(৩) গ্রহণ ক্ষমতা ও সম্পদ-সম্ভাবনা (Adaptability and resourcefulness)।				
(৪) সাংগঠনিক ক্ষমতা (Organizing ability)।				
(৫) পরিচালন ক্ষমতা (Directive ability)।				
(৬) শ্রম (Industry)।				
(চ) **শ্রেণীকক্ষে পাঠ পরিচালন পদ্ধতি (Classroom Procedure) :**				
(১) পাঠটীকার সঠিক লক্ষ্য (Clear-cut aims for lesson)।				

বিষয় Items	অতি উত্তম Excellent	উত্তম Good	গড় Average	স্বল্পতা Poor
(২) পাঠ্যসূচী ও পাঠটীকার লক্ষ্যের সম্পর্ক (Aims of lesson in relation with aims of topic of course)।				
(৩) সুষ্ঠু বিষয়বস্তু পাঠ্যরূপে নির্বাচন (Materials of subject well selected for teaching)।				
(৪) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু বিন্যাসের সুষ্ঠুতা (Materials of subject well organised for teaching)।				
(৫) শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (Pupils well motivated for study)।				
(৬) সযত্নে পরিকল্পিত কর্মারোপ (Carefully planned assignment)।				
(৭) লক্ষ্যের অনুকূলে গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতি (Variety of methods used to accomplish aims.)।				
(৮) প্রশ্ন সংক্রান্ত নৈপুণ্য (Skillful questioning)।				
(৯) শ্রেণী পরিচালন যোগ্যতা (Ability to hold the class)।				
(১০) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির পরিমাণ (Recognition of individual differences.)।				
(১১) কর্মসূচী পালনে যোগ্যতা (Efficiency in routine work.)।				
(১২) শ্রেণীতে লক্ষ্য সম্পাদনের যোগ্যতা (Ability to accomplish aims in class.)।				
(১৩) বিষয় পরিবেশন যোগ্যতা (Ability in clear presentation of subject.)।				

৫। **শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য (Teacher's unavoidable duties) ঃ**

সকল স্তরের শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য হলেও বিশেষভাবে সমাজবিদ্যার শিক্ষককে তিনটি বিশেষ কর্তব্যের কথা স্মরণ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, দ্বিতীয়তঃ, সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক আর তৃতীয়তঃ, সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক।

শিক্ষার্থীর মঙ্গল চিন্তাই শিক্ষকের স্বাভাবিক ধর্ম। সমাজবিদ্যার শিক্ষকেও শিক্ষার্থীর মঙ্গল চিন্তা করতে হয়। সেই সঙ্গে তাঁকে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক। সমাজবিদ্যার শিক্ষা শ্রেণী কক্ষে শেষ হয়ে যায় না, এ শিক্ষায় নির্দিষ্ট কোন সময় থাকে না। বিদ্যালয়ের ছুটির পর অথবা ছুটির ঠিক পূর্বেই সমাজবিদ্যা শিক্ষার কর্মসূচী থাকতে পারে। অবকাশের দিনে শিক্ষার্থীদেরকে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হয়। সময়ে অসময়েও শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কর্মে পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে না তুলতে পারলে শিক্ষার্থীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালনা করা যায় না। শ্রেণী কক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে এই সম্পর্কের যতটুকু প্রয়োজন, কক্ষের বাইরে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এই সম্পর্ক আরও অনেক বেশী প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার শিক্ষককে হতে হবে বহুবিধ কর্মে দক্ষ। তাঁকে যেমন ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গত ক্লাব, বিতর্ক সভা, খেলাধূলা প্রভৃতি পরিচালনা করতে হয়, তেমনি শ্রেণী কক্ষে শৃঙ্খলার সঙ্গে পাঠ পরিচালনা করতে হয়। সর্বত্রই শৃঙ্খলামূলক সমস্যার সম্মুখীন হওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং শিক্ষণ, আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষককে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন মধুর সম্পর্ক যার প্রভাবে উদ্ধত, দুষ্ট শিক্ষার্থীরাও বিনয়ী ও একান্ত অনুবর্তী না হয়ে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার শিক্ষককে ঠিক একই প্রকারে সহকর্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। শুধু শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয় পরিবেশ গড়ে ওঠে না, এখানে অন্যান্য শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজবিদ্যা বহু বিষয়ের সংশ্লেষিত রূপ। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর সহকর্মীদের পাণ্ডিত্য আছে। সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হবে সমাজবিদ্যার শিক্ষককে। কোন ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসার জন্য ইতিহাসের শিক্ষকের সাহায্য অনস্বীকার্য; তেমনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষকের সক্রিয়

সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক ও পাঠ্যবহির্ভূত বিষয় শিক্ষা লাভের সময় সমাজবিদ্যার শিক্ষক একাকী কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে পারবেন—এমন ভরসা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিদ্যালয় পরিবেশে কোন শিক্ষক বা তার কাজ-কর্মকে অবহেলা করা যায় না। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের বাস্তব সাফল্যের জন্য তাঁকে বন্ধুদের উপর নির্ভর করতে হবে; তাই শিক্ষকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সমাজবিদ্যার শিক্ষকেই অগ্রণী হওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে। বিদ্যালয় হল সমাজের প্রতিনিধি। সমাজের অধিবাসীদের প্রয়োজনে তারাই গড়ে তুলেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাদের শিশুদের শিক্ষালাভই এর প্রধান উদ্দেশ্য। অভিভাবকদের নিকট শিক্ষকরা বাধিত, ফলে তাঁরা সমগ্র সমাজের নিকট দায়ী বলা চলে। যে-কোন বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক জনগণ শিক্ষকদের কার্যাবলীর বিবরণ নিতে পারেন। তারা খবর নিতে পারেন শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব কর্মে কতটুকু অগ্রসর হল। বিদ্যালয়ে অভিভাবক দিবস প্রতিপালিত হয়। এখানে অভিভাবকরা স্ব-স্ব সন্তানদের সুবিধা-অসুবিধা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করে শিক্ষকদের সহিত যুক্ত প্রচেষ্টায় ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। সমাজবিদ্যার শিক্ষককে সামাজিক স্তরে বেশী মেলামেশা করতে হয়। সমাজ-বিদ্যার কর্মসূচীর ব্যবহারিক অংশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা অনেক সময় আঞ্চলিক বিশেষ বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। ধরা যাক্ আঞ্চলিক খাদ্যোৎপাদনের বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তখন শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে শিক্ষক কর্ম পরিচালনা করবেন। সামাজিক পরিবেশের পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকও শ্রেণীকক্ষের সীমা অতিক্রম করে সামাজিক পরিবেশে নেমে আসবেন। বিদ্যালয়ে যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক পরিবেশ, তেমনি সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠবে বিদ্যালয় পরিবেশ। তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষককের সামাজিক পরিবেশ ও জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন। শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য নয়, সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষককে অগ্রণী হতে হয়। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠানে শিক্ষকের অংশ গ্রহণ বিধেয়। শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করবে তাদের শিক্ষক সমাজের

একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তিনি সামাজিক কর্মে জড়িত, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এই দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করবে। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা লাভের অধিকারী হবেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অঙ্গুলি হেলনে অবাধ্য শিক্ষার্থী বাধ্য ও বিনয়ী হয়ে শুধু বিদ্যালয়ে নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানেও শৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রণী হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক, সে ধরণের সৌহার্দপূর্ণ মধুর সম্পর্ক শিক্ষকও আঞ্চলিক জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া-একান্ত কাম্য।

পরিশেষে বলা যায়, অপরিহার্য কর্তব্য পালনের জন্য শিক্ষককে স্বীয় মানসিক অবস্থা সংযত করতে হবে। যে সব শিক্ষক নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি অত্যধিক মনোযোগী এবং অহম্ ভাবে গর্বিত, তিনি শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও জনগণের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপনে কোন ক্ষেত্রেই কৃতকার্য হতে পারেন না। স্বীয় আত্মম্ভরিতা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁকে উৎসর্গীকৃত জীবনের দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। এজন্য শিক্ষককে অমায়িক, মিশুক ও পরমতসহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। সমাজ এরূপ আদর্শ শিক্ষকের প্রাচুর্য কামনা করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মূল্যায়ন ও পরীক্ষা

(Evaluation and Examination)

১। ভূমিকা (Introduction) :

স্বরূপ ও প্রকৃতি যেমনই হোক্ পরীক্ষা ব্যবস্থা সুদূর অতীতেও প্রচলিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবের মধ্যে সমগোত্রীয়দের যোগ্যতা পরীক্ষা মাধ্যমেও গৃহীত হত। এক্ষেত্রে তাদের শিকার-সন্ধানী যোগ্যতাই ছিল বড় কথা। আবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অস্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের যোগ্যতা বিচার করা হত। এক্ষেত্রে শারীরিক শক্তি ও অস্ত্রবিদ্যার নিপুণতাই ছিল জীবিত যোদ্ধার যোগ্যতার মাপকাঠি। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে অস্ত্র পরীক্ষার প্রচলন ছিল। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, দ্রোণাচার্যের পরিচালনায় কুরু ও পাণ্ডবদের অস্ত্র পরীক্ষা প্রভৃতি যোগ্যতা নিরূপণের দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন সাহিত্যে আমার মৌখিক (oral) পরীক্ষা-গ্রহণ প্রথা জানতে পারা যায়। এই প্রথার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ওল্ড টেষ্টামেণ্টে। Gileadites জর্ডান নদী অতিক্রমে ইচ্ছুক শত্রু Ephraimites-দের নিধনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষার শর্তটি ছিল—শত্রুদের বলা হয়েছিল Shibboleth শব্দটি উচ্চারণ করতে। যাদের উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হয়ে Sibboleth-এর ন্যায় ভুল উচ্চারণ হল তারা শত্রুরূপে গণ্য হল, কারণ শত্রুপক্ষ উপজাতিরা শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারত না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার Ephraimites-কে হত্যা করা হয়।

লিখিত পরীক্ষা (written test) পদ্ধতি অতি আধুনিক বলে মনে হয়, কিন্তু সূত্র সন্ধানে জানা যায়, প্রাচীনকালে কোন কোন দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ২২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চীনে শাসন বিভাগীয় কর্মচারী নির্বাচনে এই লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হত[1]। আর এটাই ছিল তাদের জাতীয় রীতি। ১৮৪৫

1. The Chinese, their education, Philosophy and Letters. : By W. A. P. Martin, New York. Harper and Brothers, 1881 P. 45-49.

খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বোষ্টন বন্দরে প্রথম লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হয়।[1] ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কেমব্রিজে আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[2] ইংরেজ শিক্ষক রেভাঃ জর্জ ফিসার কৃতকার্যতা পরিমাপক বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেন। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective type test) গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ধন্য হলেন উইলিয়াম কল (William *Mc. Call.*)।[3]

প্রাচীন ভারতের প্রচলিত লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রের (source) নিতান্ত অভাব থাকার জন্য কোন সঠিক বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত হত। মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আধুনিক কালে গৃহীত লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাংশে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে এদেশে প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণের রীতি ও পদ্ধতি আজ বহুলাংশে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত। তবুও এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নহে। মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনে শিক্ষাকর্মে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও ক্রমোন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

২। শিক্ষায় পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন (Not Examination, but Evaluation in Education) ঃ

শিক্ষা একটি গতিশীল জীবন্ত ধারা। তার সজীব ধারায় প্রভাবিত হয় ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-প্রকৃতি, হাব-ভাব, আচার-আচরণ, কর্মপ্রচেষ্টা আর তার ফলশ্রুতি। সুতরাং বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করা অসম্ভব। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে শুধু এটুকু বললে যথেষ্ট যে, এ পদ্ধতি শিশুকে সামগ্রিকভাবে বিচার ও

1. Then and Now in Education (1845—1923) : World Book Co. Yonkers, New York : 1923 Chap. I. P. 27.

2. Modern Method in Written Examination : A. R. Lang Houghtod Miffin Co. Boston, 1930. P. 2.

3. A New kind of School Examination : William Mc Call Journal of Educational Research 1 ; 1920. P. 33-46.

যাচাই করে না। শিশুর বোধশক্তি, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, সামর্থ্য ও কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই পরীক্ষায় প্রকাশিত হয় না। পরীক্ষা শব্দটি ব্যবহৃত হয় সংকীর্ণ অর্থে—এই সংকীর্ণতার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির নিতান্ত অভাব। তাই আধুনিক শিক্ষায় পরীক্ষা শব্দের (Examination) পরিবর্তে মূল্যায়ন (Evaluation) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। লিণ্ডকুইষ্ট (*E. F. Lindquist*) বলেন যে পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণার সংকীর্ণতা থেকে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সার্বিক বিকাশ যাচাই করার জন্য পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়ন শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত। শিক্ষা শব্দের ন্যায় মূল্যায়নও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে মূল্যায়ন দ্রব্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত তুলাদণ্ড নয়—সিদ্ধান্তে পৌছানর উপায় মাত্র। মূল্যায়ন শুধু পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞানের যাচাই ও বিচার করে না, বরং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক গুণ, ক্ষমতা, সামর্থ্য, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণ প্রভৃতি সামগ্রিক যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করে।

৩। মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা (Utility of Evaluation) ঃ

শিক্ষা এমনই একটি বিষয় যে, শিশুর জীবনে নিয়ে আসে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনশীল পথে দিনে শিশু দিনে বর্ধিত হয়। আমাদের শিক্ষাধারা শিশুর জীবনে কতটুকু পরিবর্তন আনলো, কতটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর কতটুকু পরিবর্তন আনতে হবে, তার জন্যে কি পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন—এসব শিক্ষককে জানতে হয়। তা জানবার একমাত্র উপায় হল মূল্যায়ন। কৃতকর্মের মূল্যায়ন ভাবী কর্মসূচীর ভিত্তি স্বরূপ। মেনজেল (*E. W. Menzel*) সুন্দরভাবে কথাটি ব্যক্ত করেছেন। [illegible]তার অথবা রাজমিস্ত্রী নিভুল ও সুন্দর করে কাজ করবার জন্য বার ব[illegible] পরিমাপক যন্ত্রাদি ব্যবহার করেন। সেইরূপ শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকর্মের প্রগতি বিচারের জন্য লক্ষ্য করতে হয় তারা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত কিনা, শিক্ষার্থীর দক্ষতা কতটুকু বিকাশ লাভ করল, প্রয়োজনীয় জ্ঞান তারা লাভ করেছে কিনা এবং লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারছে কিনা।

শুধু শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষক নিজেও মূল্যায়নের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হন। শিক্ষর্থীর শিক্ষার মূল্যায়ন হল শিক্ষকের কর্মের মূল্যায়ন। স্বকর্মের মূল্য বিচার সর্বত্র প্রচলিত। উৎপাদনের প্রাচুর্যের দ্বারা কৃষকের শ্রমের বিচার হয়। আইন ব্যবসায়ীর যুক্তির মূল্যায়ন করেন জুরী। রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরের কর্ম যাচাই করেন গৃহকর্তা। পূর্ব নির্ধারিত ওষুধের প্রয়োগ ফলাফল না জেনে চিকিৎসক তাঁর রোগীর জন্যে পুনরায় ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন না। তেমনি শিক্ষকের কর্মের যাচাই হয় শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের মাধ্যমে। এই মূল্যায়ন মারফৎ তিনি জানতে পারেন কোন্ পদ্ধতি হবে তাঁর শিক্ষাদানের উপায়, প্রচলিত ও গৃহীত ধারায় শিক্ষার্থী কতটুকু লাভবান হল। শিক্ষা কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে এই মূল্যায়ন ও ফলশ্রুতি দ্বারা। শিক্ষার মূল্যায়ন শিক্ষককে ভাল মন্দ বিচারে সাহায্য করে। ফলে শিক্ষক বিষয়বস্তু পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সুন্দর পাঠ পরিচালনার উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন এবং শিক্ষাকর্ম আরও সজীব ও সার্থক করে তুলতে পরেন।

শিক্ষকের মত শিক্ষার্থীও উপকৃত হয় এই মূল্যায়ন প্রথায়। একটু বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে পারে নিজের শিক্ষা কতটুকু হ'ল, তার কৃতকার্যতা অথবা অকৃতকার্যতার মূলে কি আছে, ত্রুটি সংশোধনের উপায় কি ইত্যাদি। মূল্যায়ন এমনি করে শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্লেষণে সক্ষম করে তোলে। মূল্যায়নের প্রভাবে তারা কৃতকার্যতার উপায় উদ্ভাবন করে নতুন পথে, নতুন উদ্যমে স্ব-স্ব কর্মে অগ্রসর হতে পারে।

সমাজবিদ্যার মূল্যায়ন শুধু শিক্ষার্থীর অধীত বিষয় সম্পর্কিত লব্ধজ্ঞানের পরীক্ষা করে না, এর দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণ, দক্ষতা, কৌশল, আচার আচরণ, রুচিবোধ প্রভৃতিও পরিমাপ করা সম্ভব হয়। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গত জ্ঞান আসল কথা নয়, সে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক রূপে গড়ে ওঠার জন্যে কতটুকু যোগ্যতা লাভ করল তার পরিমাণই হল সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা ; আর তার পরিমাপ করা হল মূল্যায়ন। শিক্ষার্থী শিক্ষামূলক ভ্রমণে, অঞ্চল পরিদর্শনে, সমাজবিদ্যার কক্ষে এবং যাবতীয় শিক্ষা ও সমাজ পরিবেশে যা কিছু করল, জানল, শিখল এবং এর ফলে তার শারীরিক মানসিক যা কিছু উন্নতি হল সব কিছুর মূল্যায়ন প্রয়োজন। তাই পরীক্ষার সংকীর্ণতা ছেড়ে ব্যাপক মূল্যায়নের পথই একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ। এর ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

উভয়ই উপকৃত এবং কৃতকার্য হবেন। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার যেন কোন সম্পর্ক নেই। পরীক্ষা শিক্ষার্থীর নিকট বিভীষিকা স্বরূপ, পরীক্ষার কথায় শিক্ষার্থীর উদ্বেগ সৃষ্টি উপস্থিত হয়, উৎকণ্ঠায় ওঠে নাভিশ্বাস। পরীক্ষা-পদ্ধতির সংকীর্ণতা, এ জন্য দায়ী। মূল্যায়ন শব্দটি ঠিক শিক্ষা শব্দের ন্যায় ব্যাপক। শিক্ষার্থী স্ব-স্ব সামর্থ্য অনুসারে মূল্যায়নের মাধ্যমে যদি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছতে পারে তাহলে এই মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর মনে বিভীষিকা সৃষ্টি না করে শিক্ষা লাভে জাগাবে উৎসাহ এবং মূল্যায়ন হবে প্রকৃত শিক্ষালাভের সোপান।

৪। সমাজবিদ্যার মূল্যায়ন পদ্ধতি (**Social Studies Evaluation Programme**) ঃ

পাঠ্যবিষয় হিসেবে সমাজবিদ্যার দুটি মূল লক্ষ্য স্থিরীকৃত। প্রথমটি হল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন ও তার তাৎপর্য অনুধাবনে সাহায্য করা আর দ্বিতীয়টি হল ভাবী সুনাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করা। এই দুটি লক্ষ্যকে এককরূপে গণ্য করলে বলা যায়, প্রথমটির মাধ্যমে দ্বিতীয়টিতে পৌছে যাওয়াই সমাজবিদ্যা পাঠের অপরিহার্য উদ্দেশ্য। তাহলে সমাজবিদ্যা এমনই একটা বিষয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন ও প্রয়োজনীয় গুণ ও কৌশলাদির বিকাশ সাধন সম্ভব। সুতরাং তার যোগ্যতা পরিমাপের জন্যে কোন এক সংকীর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। তার জন্যে চাই প্রশস্ত, ব্যাপক ও পদ্ধতিবহুল মূল্যায়ন।

বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি মূল্যায়নের জন্যে নিম্নলিখিত পরীক্ষা মূলক উপায় অবলম্বনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য ঃ

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (oral tests)।

(খ) লিখিত পরীক্ষা (written tests)।

(গ) আরোপিত কর্মসূচীর মাধ্যমে পরীক্ষা (assignment tests)।

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (Oral Tests) ঃ মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ প্রথা অতি প্রাচীন। কোন বিশেষ বিষয়ে লব্ধ জ্ঞানের সুস্পষ্টতা বিচারার্থে ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিচার করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্যে সকল

শিক্ষার্থী সমান ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সঙ্কোচ ও শৈথিল্য অনেক সময় শিক্ষার্থীর ভাব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে সঠিক মূল্যায়ন এই পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়।

সমাজজীবনে মনের ভাব প্রকাশ করা একটা অপরিহার্য গুণ। অনেকে ভাল লিখতে পারেন, অথচ বলতে পারেন না। ফলে জীবনে অনেক সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হন। সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে ভাব প্রকাশে সাহায্য করা শিক্ষাকর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং উল্লিখিত শিক্ষাদানপদ্ধতিগুলির সঙ্গে মাঝে মাঝে 'সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নাবলী পদ্ধতি' (Interview and Questionaire methods) প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে।

সুতরাং সারা বছরে একবার বা দুবার পরীক্ষা গ্রহণ না করে মাঝে মাঝে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কর্মসূচী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এর দ্বারা দুটি কাজ এক সঙ্গে হতে পারে—প্রথমতঃ, সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Interview and questionaire method) প্রয়োগ ;[1] দ্বিতীয়তঃ, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ। পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করে তার বিবরণ (Record) রাখা উচিত। বাৎসরিক বা ষান্মাষিক মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত না হলেও উক্ত বিবরণ শিক্ষার্থীর উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ (Promotion) ও যোগ্যতা নির্ধারণে ব্যবহৃত হতে পারে।

(খ) **লিখিত পরীক্ষা (Written tests) ঃ** সাধারণতঃ তিন প্রকার লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত ; যথা,

(১) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (objective tests)।

(২) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর মূলক পরীক্ষা (Short question and Answer type tests)।

(৩) রচনামূলক পরীক্ষা (Essay type tests)।

(১) **নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ঃ** নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপর নাম বিষয়াত্মক (objective) পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রচলন হয়েছে অতি আধুনিক কালে। এখন এই পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশ্নের সংগঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। তাই একে নতুন ধরনের পরীক্ষাও (New-type tests) বলা হয়।

1. পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সুবিধাঃ এই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, এ পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ (objective) বা নৈর্ব্যক্তিক। পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রভাব এখানে আধক। পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না অর্থাৎ ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (subjectivity) থেকে এ পদ্ধতি মুক্ত। সুতরাং এই পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার মূল্যায়ন যথাসম্ভব বিশুদ্ধ হয়। সেজন্যে এই পদ্ধতিকে আমরা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতে পারি। এই পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট থাকে। ফলে শিক্ষার্থীর উত্তরের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

নির্দিষ্ট উত্তরের সঙ্গে শিক্ষার্থী প্রদত্ত উত্তর এক হলে নম্বর যথাযথ ভাবে বসান যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থী নোটবই, সাজেস্সান (Suggestion) ইত্যাদি পড়ে পরীক্ষা পাশ করতে পারে না। কারণ এতে প্রশ্ন থাকে বহু এবং সমগ্র পাঠ্যপুস্তকটির উপর ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করা হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ও ব্যাপক ভাবে জ্ঞান লাভ না করে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, প্রশ্নের উত্তর এক বা দু'কথায় অথবা শুধু চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া যায়। ফলে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় এবং এতে পরীক্ষার্থীর পরিশ্রম কম হয়। তেমনি পরীক্ষকও অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক খাতায় (Answar scripts) নম্বর (Scoring) দিয়ে শ্রম বাঁচাতে পারেন।

চতুর্থতঃ, প্রশ্নকর্তা ছাড়াও যে কোন পরীক্ষক শিক্ষার্থীর খাতা পরীক্ষা করতে পারেন ;—কারণ অনেক উত্তর প্রশ্নের সঙ্গেই দেওয়া থাকে।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অসুবিধাঃ প্রথমতঃ, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যয় বহুল ; কারণ ব্যাপক বিষয়ের উপর বহু সংখ্যক প্রশ্ন তৈরী করতে হয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ব্যতীত প্রশ্নপত্র রচনা করা দুরূহ ; সমাজবিদ্যার বিষয় বস্তু ছাড়া বিবিধগুণ বিকাশের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং সবদিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নপত্র রচনা করা অনেক শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। বাংলার গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে কৌশলী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ভাব, ভাষার নিপুণতা ও রচনা কৌশলের উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। শুধু বিষয়গত জ্ঞান পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা ও গুণবিকাশের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এই অভীক্ষায় দোষের পরিপ্রেক্ষিতে স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*) বলেন : The examiner cannot tell where knowledge stops and guessing begins. পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি যাচাই করার সুযোগ এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় নেই বললেও চলে। অনেক প্রশ্নের উত্তর সঠিক না জেনেও শিক্ষার্থীরা খানিকটা ধারণার বশবর্তী হয়ে লিখে থাকে। সুতরাং পরীক্ষার্থীর মৌলিকতার পরিমাপ করা এই অভীজ্ঞায় সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, এক-কথা-দু-কথায় উত্তর লেখা সম্ভব, তাই পরীক্ষার্থীরা পারস্পরিক সাহায্য লাভের সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। অসৎ উপায়ে মাত্র কয়েকটি সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে পারলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারে—তাই এই পদ্ধতিতে অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় প্রশ্ন ও তার নিদর্শন : নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার দোষ গুণ বিচারে উল্লেখ করা হয়েছে যে এ অভীক্ষা সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ এবং এর দ্বারা শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত লব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্পষ্ট ধারণা (concepts), বোধশক্তি (understanding), আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্ভব হয় না। অথচ সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, বোধ, আচার-আচরণ, কৌশল, দক্ষতা প্রভৃতির পরীক্ষা অপরিহার্য। তাই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষা-বিদের সহযোগিতায় এ সকল প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে Objective tests in Social Studies" (1959)—রচনা করেছেন এবং শিক্ষকদের সুবিধার্থে বিদ্যালয়ে সরবরাহ করেছেন। এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে **সমাজবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যের* পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করা বাঞ্ছনীয়।**

---

*1. To develop in the students the capacity for reflective thinking on the basis of knowledge acquired.

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মুখী বিষয়াত্মক অভীক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন পরিবেশন করছি :

(১)। উদ্দেশ্য সহ সম্পূর্ণ করণ (Completion) অভীক্ষার প্রশ্ন :

A. উদ্দেশ্য : সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কার্য-কারণ, গতি-প্রকৃতি এবং এদের সমাধান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও ধারণার উন্নয়ন।

নির্দেশ : নিম্নের বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) দু' ব্যক্তি অথবা দলে ঝগড়াঝাটি হলে তা মীমাংসার জন্য তারা — অথবা — সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

(খ) গ্রামবাসীদের বিবাদ মীমাংসার জন্য — এর সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

(গ) আজকাল জাতিতে জাতিতে ঝগড়া হলে তার মীমাংসার জন্য — এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

(সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, কোর্ট অব জাষ্টিস্, মধ্যস্থ ব্যক্তি)

---

2. To develop in them the understanding of the fundamental processes of social living.

3. To develop in them the understanding of the various social, political, economic, administrative and cultural institutions against their historical and geographical back grounds.

4. To develop in them the ability to examine critically the major concepts, ideas, principles, and values, cherished and commonly applied by the various social groups.

5. To develop the capacity to gather relevant data bearing on a problem or situation, and on the basis of these data to arrive at logical, reasoned—out conclusions.

6. To enable students to analyse and critically examine various social, economic, and civic issues and problems.

7. To develop knowledge and understanding of current affairs and problems in the light of the past.

8. To develop proper appreciation of national glories and failures.

9. To develop an attitude of world-mindedness.

B. উদ্দেশ্য : ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন বিচার।

নির্দেশ : উপযুক্ত শব্দ দ্বারা নীচের শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) আন্দামানের বাসিন্দাদের কুড়ে ঘরকে বলা হয় — এবং গ্রামকে বলা হয় —।

(খ) আলমোড়ায় জীবিকা সংগ্রহের অন্যতম উপায় —।

(গ) আলমোড়া ও তরাই-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে — বলা হয়।

(ঘ) — এর শাসনকালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করা হয়।

(২) উদ্দেশ্য সহ সত্য-মিথ্যা নির্ধারক প্রশ্ন :

(A). উদ্দেশ্য : প্রমাণ ভিত্তিতে অন্য সম্প্রদায়, বিশেষতঃ আদিম সম্প্রদায়ের প্রতি শিক্ষার্থীর সঠিক মনোভাব গঠন :

নির্দেশ : নিম্নের বিবৃতিগুলির মধ্যে যেটি তোমার কাছে ঠিক বলে মনে হয় তার পার্শ্বে √ চিহ্ন বসাও :

(ক) আন্দামানের অধিবাসীরা প্রায়ই বাসস্থান পরিবর্তন করে, কারণ তারা (১) সৌন্দর্য ভালবাসে ;

(২) খাদ্য সংগ্রহ করে ;

(৩) প্রকৃতির দাস।

(খ) আন্দামানবাসীরা সেইখানে বসতিবিস্তার করে, যেখানে তারা পায়—

(১) প্রচুর মাছ ;

(২) ভাল পানীয় জল ;

(৩) প্রচুর স্বর্ণ ;

(৪) অসংখ্য বৃক্ষ।

(গ) আন্দামানবাসীদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ়, কারণ তারা—

(১) একই মতে বিশ্বাসী ;

(২) একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস করে ;

(৩) শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে চায়।

(B). উদ্দেশ্য : সত্য-মিথ্যা বিচারের দক্ষতা বৃদ্ধি :

নির্দেশ : নিম্নের বিবৃতিগুলির মধ্যে তোমার কাছে যেটি সত্য বলে মনে হয় তার পার্শ্বে √ চিহ্ন বসাও :

(ক) মাদ্রাজে শীতকালে এবং বোম্বাইতে গ্রীষ্মকালে বেশী বৃষ্টিপাত হয়।

(খ) ভারতের রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

(গ) ফা-হিয়েন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীকদূত হিসেবে আগমন করেন।

(ঘ) সম্রাট ঔরংঙ্গজেব অন্যান্য মুঘল সম্রাটদিগের ন্যায় রাজদরবারে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেন।

(৩) উদ্দেশ্যসহ সঠিক উত্তর নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর (Multiple choice tests with objectives) ঃ

(A) উদ্দেশ্য ঃ সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চিন্তা ভাবনা বিচার।

নির্দেশ ঃ নিম্নে কতকগুলি উক্তি এবং তাদের সম্ভাব্য উত্তর, মতামত, ব্যাখ্যা বা কারণ দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও অথবা সম্ভাব্য মতামত, ব্যাখ্যার, বা কারণের পার্শ্বে √ চিহ্ন বসাও ঃ

উক্তি ঃ পশ্চিমবঙ্গবাসীরা সাধারণতঃ তূলাজাত পোষাক ব্যবহার করেন ; কারণ—

সম্ভাব্য কারণ ঃ

(ক) তূলাজাত পোশাক সস্তা ;

(খ) এগুলি সহজে পরিষ্কার করা যায় ;

(গ) আঞ্চলিক জলবায়ুর পক্ষে এ পোশাক উপযোগী ; √

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে অনেক কাপড়ের কল আছে ;

(ঙ) বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষেরা এই পোশাক পরতেন ;

(চ) পোশাক হিসেবে তূলাজাত পোশাক সর্বোৎকৃষ্ট ;

(ছ) এগুলি তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

(B) উদ্দেশ্য ঃ আধুনিক সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের দক্ষতা বিচার।

উক্তি ঃ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা বাংলার বাইরে যেতে চান না, কারণ—

সম্ভাব্য কারণ ঃ

(ক) তারা স্ব-স্ব সংস্কৃতি হারাতে চায় না ;

(খ) রাজনৈতিক প্রভাব হারাতে ভয় পায় ;

(গ) তারা আত্মীয়স্বজন ছেড়ে দূরে যেতে চায় না ;

(ঘ) রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বাধা দেয় ;

(ঙ) বাংলার মাটিকে তারা ভালবাসে ;

(চ) তারা ভয় পায় যে, তাদের সন্তানরা বাংলাভাষা ভুলে যাবে ;

(ছ) তারা অপরিচিত পরিবেশকে ভয় পায়।

(C) উদ্দেশ্য : ঐতিহাসিক মত বিচারে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জন :

উক্তি : আকবর দিন-ই-ইলাহী নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন।

সম্ভাব্য কারণ :

(ক) তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর অনুগামীরা একতাবদ্ধ হোক ;

(খ) তিনি আবুল ফজল কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন ;

(গ) মৌলানাদের মতানৈক্যে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন ;

(ঘ) প্রচলিত কোন ধর্ম তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি ;

(ঙ) ধর্মের বন্ধনে এই বৈচিত্র্যময় ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে ;

(চ) তিনি চেয়েছিলেন যে নতুন ধর্মের বন্ধনে নব ভারত গড়ে উঠবে।

উক্তি : মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সম্ভাব্য কারণ :

(ক) কাবুল কান্দাহার থেকে মুঘলদের পরাজয় ;

(খ) মারাঠা ও শিখ শক্তির অভ্যুত্থান ;

(গ) ঔরংজেবের রাজনীতি ;

(ঘ) উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত-নীতির অভাব ;

(ঙ) ইংরেজদের আগমন।

(D) উদ্দেশ্য : বহুর মধ্যে সঠিক উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয়ক জ্ঞান বিচার।

(ক) হর্ষের রাজত্বকালে আগত চীনা পরিব্রাজক ছিলেন মেগাস্থিনিস, হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন, ইবন্ বতুতা।

(খ) উত্তর প্রদেশের রাজধানী হল লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ।

(গ) চায়ের উৎপাদন বেশী—বিহারে, উত্তর প্রদেশে, মধ্যভারতে, উত্তরবঙ্গে, আসামে, উড়িষ্যায়।

(৪) মিলনকরণ অভীক্ষা (Matching Tests) :

উদ্দেশ্য : ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, পৌর কর্তব্য, ভৌগোলিক উপাদান, সময়ানুক্রমিক ধারা, সরকারের সংগঠন, কর্মধারা প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান বিচার।

নির্দেশ : নিম্নে দু' সারিতে পুস্তকাদির নাম, ব্যাখ্যা, সাল-তারিখ, ঐতিহাসিক কার্যাদি দেওয়া আছে। দু' সারির সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদিকে যথাযথ-ভাবে সাজাও। মাঝখানে যে বন্ধনী আছে তার মধ্যে বাম সারির সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের নম্বরটি বসাও। প্রয়োজন হলে একই বন্ধনীতে একাধিক নম্বর অথবা একই নম্বর একাধিক বন্ধনীতে বসান যাবে

প্রথম সারি		দ্বিতীয় সারি
১। উডের শিক্ষা ডিসপ্যাচ্	( )	১৮৫৭ সাল
২। বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন	( )	ঘন
৩। নেহরু রিপোর্ট	( )	জনগণের শাসন
৪। গণতন্ত্র	( )	১৮৮৫ সাল
৫। নেতাজী	( )	১৮৫৪ সাল
৬। একনায়কত্ব	( )	১৯৪৭ সাল
৭। ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী	( )	আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সংগঠন
৮। পশ্চিমবঙ্গের বসতি	( )	একজনের শাসন
৯। সিপাহী বিদ্রোহ	( )	১৯২৮ সাল
১০। ভারত বিভাগ	( )	জওহরলাল নেহরু
১১। আমীর খসরু	( )	আকবর নামা
১২। মীনহাজউদ্দীন	( )	তারিখই-ফিরুজসাহী
১৩। জিয়াউদ্দীন বারণী	( )	তারিখই আলাই
১৪। আবুল ফজল	( )	তাবকাত-ই-নাসিরী
১৫। মেগাস্থিনিস	( )	রাজ তরঙ্গিনী
১৬। কৌটিল্য	( )	হর্ষ চরিত
১৭। কল্হন	( )	ইণ্ডিকা
১৮। বাণভট্ট	( )	অর্থশাস্ত্র

(৫) সজ্জিতকরণ অভীক্ষা (Arrangement type tests) :

উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের কালক্রমিক জ্ঞান বিচার।

নির্দেশ : নিম্নলিখিত নাম ও ঘটনাগুলিকে কালানুক্রমে সাজাও :

(ক) আর্যদের ভারত আগমন

(খ) বুদ্ধের জন্ম

(গ) চীনা পরিব্রাজকদের ভারত আগমন

(ঘ) বাংলায় জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

(ঙ) ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমন

(চ) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

(ছ) হুণদের অভিযান

(জ) কনিষ্ক

(ঝ) বাবরের মৃত্যু

(ঞ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

(ট) খানুয়ার যুদ্ধ

(ঠ) ভারতে প্রথম মুসলিম অভিযান।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলিকে (ক) রাজাদের নাম, (খ) পরিব্রাজকদের নাম, (গ) ঘটনার নাম, (ঘ) ভারত অভিযান, (ঙ) আন্দোলন, (চ) ধর্ম প্রচারকদের নাম প্রভৃতি পৃথক পৃথক দলে (group) ভাগ করে ও সাজিয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করা চলে।

(৬) সংজ্ঞা নির্ণেয়ক অভীক্ষা (Definition type Tests) :

এই শ্রেণীর প্রশ্নে কতকগুলি বিষয়ের সোজাসুজি সংজ্ঞা নিরূপণ করতে বলা হয়। যেমন,

প্রশ্ন : গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ভোট, নির্বাচক মণ্ডলী, কুসংস্কার ইত্যাদির সংজ্ঞা নির্ধারণ কর।

তবে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় নিম্নলিখিত উপায়ে প্রশ্ন করাই যুক্তিযুক্ত। যেমন,

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্য থেকে 'গণতন্ত্রের' প্রকৃত সংজ্ঞাটি বাছাই কর :

(ক) গণতন্ত্রের অর্থ রাষ্ট্রপতির শাসন,

(খ) গণতন্ত্র হল একনায়কতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি,

(গ) জনগণের স্বার্থে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাই গণতন্ত্র ;

(ঘ) জনগণের প্রতিনিধি কর্তৃত পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাই গণতন্ত্র ;

(ঙ) জন অথবা গণ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাসন বলা হয়।

(চ) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের কল্যাণার্থে জনগণের শাসনই গণতন্ত্র।

(৭) যোগসূত্র নির্ণেয়ক অভীক্ষা (Relationship tests) :

দু'প্রকার প্রশ্নের মাধ্যমে যোগসূত্র নির্ণয় করতে বলা যায়। যেমন,

প্রথম প্রকার প্রশ্ন : ১। ধান্য ও জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

২। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সঙ্গে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৩। বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও বৈদিকধর্মের অবনতির মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে?

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন : নিম্নের ঘটনাগুলির স্থান ও কাল নির্ণয় কর :

ঘটনা	স্থান	কাল
১। ব্রিটিশের প্রথম কারখানা	....	....
২। শিবাজীর জন্ম	....	....
৩। সম্রাট আকবরের সিংহাসন লাভ	....	....
৪। আলেকজাণ্ডারের সহিত পুরুর যুদ্ধ	....	....
৫। বাবরের সহিত ইব্রাহিমলোদীর যুদ্ধ	....	....

(৮) শ্রেণী বিন্যাস অভীক্ষা (Classification tests) :

এই পরীক্ষায় একশ্রেণীর ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়কে বাছাই করে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

(ক) মেদিনীপুর জেলায় যে সব জিনিস উৎপন্ন হয় না—

চা, পান, সুপারি, ধান, আলু, আখ, গম, কার্পাস, কমলালেবু, আপেল।

(খ) কলকাতায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ ভবনগুলি—

পার্লামেণ্ট ভবন, হাইকোর্ট, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সুপ্রীম কোর্ট, তাজমহল, লালকেল্লা, কোনারকের মন্দির, কালীঘাটের মন্দির, ফোর্ট উইলিয়াম।

(গ) পাঞ্জাব যে সব সামগ্রী রপ্তানী করে না—

গম, তুলা- ইক্ষু, চাউল, পশমী দ্রব্য, চা

(ঘ) রাজ্যসরকারের কর্তব্য কর্মাদি—

জেলাশাসক নিয়োগ, রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা, মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা; সংবাদ পত্র ও যানবাহন; আন্তঃরাজ্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণ।

(৯) পার্থক্য নির্ণেয়ক অভীক্ষা (Distinction type tests) ঃ

এই অভীক্ষার প্রশ্নপত্রে সরল, সহজ ও সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করতে বলা হয়।

উদাহরণ ঃ

পার্থক্য নির্দেশ কর ঃ

(ক) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম।

(খ) অর্থকরী পণ্য ও ভোগ্য পণ্য।

(গ) উৎপাদক শ্রম ও অনুৎপাদক শ্রম।

(ঘ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর।

(ঙ) গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র।

(১০) স্মৃতিমন্থন অথবা প্রশ্নোত্তর (Recall or questions Answers type) ঃ

এই প্রশ্নের উত্তর লিখবার সময় সঠিক উত্তরটি কি হবে স্মরণ করতে হয়। আর উত্তরগুলি হবে সহজ, সরল ও অল্পকথায়।

উদাহরণ :

(ক) বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(খ) গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

(গ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?

(ঘ) ভূ-দান আন্দোলনের প্রবর্তক কে ?

(ঙ) প্রাচীন ভারতের 'সুবর্ণ যুগ' বলতে আমরা কোন্ যুগকে বুঝি ?

(১১) মানচিত্র অভীক্ষা (**Map tests**) ঃ

সমাজবিদ্যা পঠন পাঠনে মানচিত্র অপরিহার্য সহায়ক। তেমনি শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে মানচিত্র অভীক্ষাও বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা মানচিত্র অঙ্কন করান যায়, আবার রেখ-মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয় নির্দেশ (point out) করার জন্যও বলা যেতে পারে। সমাজ ও সামাজিক মানুষের বিভিন্ন বিষয় জানতে হলে ভৌগোলিক জ্ঞান অপরিহার্য। সুতরাং এই পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের মূল্যায়ন কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

(১২) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর মূলক অভীক্ষা (**Short question and answer type tests**) ঃ

এই পরীক্ষার প্রশ্নগুলি সরল, সহজ ও ছোট ছোট হয় এবং উত্তরগুলিও হয় অল্প কথায় অথচ যথাযথ। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক অভীক্ষা পর্যায়ে পড়ে; যেমন, সংজ্ঞা নির্ণেয়ক অভীক্ষা, যোগসূত্র নির্ণেয়ক অভীক্ষা, পার্থক্য নির্ণেয়ক অভীক্ষা। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত উত্তর সূচক বহু রকমের প্রশ্নপত্র রচনা করা সম্ভব। এগুলি রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে অংশত জড়িত। রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর সুদীর্ঘ হয়, কিন্তু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর হয় খুব সংক্ষিপ্ত।

(১৩) রচনামূলক অভীক্ষা (**Essay type tests**) :

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই মূলতঃ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গৃহীত হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর অভিরুচি, বুদ্ধি, আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিচার এই পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা

সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অভিরুচি, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের দক্ষতা যাচাই করা এরূপ অভীক্ষায় সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। এর জন্য চাই রচনা ধর্মী পরীক্ষা ব্যবস্থা। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সঙ্গে যদি রচনা ধর্মী অভীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তবে লিখিত পরীক্ষার (Written test) উপযোগিতা লাভ করা সম্ভব। শুধু রচনামূলক পরীক্ষায় (Essay type tests) নির্ভর যোগ্যতা (reliability), প্রয়োগশীলতা (administrability), পরিমিততা (economy), এবং নির্দিষ্ট মানের (norm) অভাব থাকলেও কতকগুলি সুবিধা এ পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান। প্রথমতঃ, এই পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর অধীত পাঠ্যসূচী সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে স্বীয় দৃষ্টি ভঙ্গীর আলোকে ভাব প্রকাশের মাধ্যমে রচনা কৌশলের পরিচয় দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ব্যাখ্যা, যুক্তি বিচার, বিশ্লেষণের যথেষ্ট সুযোগ থাকে এই পরীক্ষায়। ফলে, সুশিক্ষার্থী এই অভীক্ষার মাধ্যমে সুফল লাভ করে।

সুতরাং সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সঙ্গে রচনামূলক পরীক্ষা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। এর দ্বারা লিখিত পরীক্ষার পূর্ণ উপযোগিতা লাভ করা যায়।

(১৪) আরোপিত কর্মসূচীর মাধ্যমে পরীক্ষা (Assignment tests):

যে কোন একটি বা দুটি পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়; তাই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রকার গৃহকর্মের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এই নির্দেশগুলিতে এমন প্রশ্নের জবাব চাইতে হয় যাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রেরণা জাগরিত হয় এবং ঐ প্রশ্নের উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সহায়ক পুস্তক, পত্র-পত্রিকাদি পাঠ করতে হয়। এই ভাবে বহু চেষ্টার ফলে শিক্ষার্থী নির্ধারিত প্রশ্নের যে জবাব তৈরি করবে, শিক্ষক তা বিচার করে নম্বর (scoring) বসাবেন। এই নম্বর দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতি সম্পর্কে রেখাচিত্র (Graph) সংরক্ষণ করতে পারেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এরূপ নির্ধারিত কর্মসূচীর মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

প্রশ্নের জবাব ছাড়া মানচিত্র, গ্রাফ, চার্ট, নক্সা প্রভৃতি তৈরীর জন্য শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া যায়। স্বহস্তে অঙ্কনের ফলে শিক্ষার্থী বিষয়টিকে যেমন সবিস্তারে জানবার সুযোগ পায়, তেমনি শিক্ষা হয়ে উঠে কর্মমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী। শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজ কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন হলে এই নম্বর এবং রেখাচিত্র হবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরীক্ষার উপযোগী মাপকাঠি।

প্রয়োজনীয় আচার-আচরণ ও সামাজিক গুণাবলীর পরিমাপ ঃ সমাজবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় আচার-আচরণ ও সামাজিক গুণের যথার্থ বিকাশ সাধন। মানসিক প্রসারতা, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, আত্ম সংযম, আত্ম নির্ভরতা, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রভৃতি হল সামাজিক গুণ। মৌখিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও নির্ধারিত কর্মসূচীর মাধ্যমে পরীক্ষা দ্বারা এসব গুণের সামগ্রিক পরিমাপ করা যায় না। এর জন্য চাই বাস্তব কর্মক্ষেত্র বা পরিবেশ যেখানে উক্ত গুণবিকাশের নিমিত্ত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষা কর্ম পরিচালিত হতে পারে। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বীয় কর্মের মাধ্যমে তার গুণাবলী প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার কক্ষে এই গুণ বিচার করা কখনও সম্ভব নয়। তাই পরীক্ষার্থীর বা শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজকর্ম, আচার-আচরণের রেকর্ড রাখা প্রয়োজন। শিক্ষা কখনও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সমগ্র জীবনই হল শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভের কাল। পরীক্ষাগৃহে শিক্ষার্থীর মুখের কথা (oral test) ও লিখিত (written test) বিষয়ের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। দেহে-মনে-বুদ্ধিতে শিক্ষার্থী যদি গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ হিসেবে গড়ে ওঠে, তবেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষার্থীর এই পরিচয় পাওয়া যাবে গৃহ পরিবেশে, সমাজে, শিক্ষামূলক ভ্রমণে, স্থান পরিদর্শনে, অবেক্ষণ পাঠচর্চায়, হাট-বাজার-মেলা ও উৎসবে, খেলার মাঠে, ক্লাবে ও সমাজবিদ্যার কক্ষে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষককে এই পরিচয় পত্র সংরক্ষণ করা উচিত। এই পরিচয় পত্রটিকে বলা হয় সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (**Cumulative Record Card**)।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

(ক) পারিবারিক পরিচয়,

(খ) পাঠোন্নতির পরিচয়

(গ) শিল্প প্রবণতার পরিচয়

(ঘ) সামাজিকতা-পরিচয়

(ঙ) স্বাস্থ্য-পরিচয়

(চ) ব্যক্তিত্ব-পরিচয়

(ছ) বিশেষ প্রবণতা-পরিচয়

(জ) সাধারণ মন্তব্য।

সমাজবিদ্যার শিক্ষক এই বিবরণ রাখবার অধিকারী। কারণ তাঁকেই অধিক সময় শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাটাতে হবে। শ্রেণীকক্ষে, সমাজকক্ষে, কর্মক্ষেত্রে তিনিই শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করবেন। সমাজবিদ্যার শিক্ষক কর্তৃক সংরক্ষিত বিবরণ (Record) শিক্ষার্থীর পূর্ণ পরিচয় প্রদান করতে পারবে। বিদ্যালয়ে গৃহীত অভীক্ষার বিবরণ (Progress Report) ও সর্বাত্মক লিপিকে (Cumulative Record Card) পাশাপাশি রেখে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার বিচার করলে সেই বিচার হবে যথাসম্ভব নিখুঁত ও যুক্তিপূর্ণ। উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করার সময় এভাবে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা বিচার বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

পরিশিষ্ট

সমাজবিদ্যা ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ

(Social Studies and Current Affairs)

১। সমসাময়িক প্রসঙ্গ বলতে কি বুঝি? (What are Current affairs) :

সামাজিক পটভূমিকায় ব্যক্তি ও সমস্যা সম্পর্কিত ঘটনাবলী সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তু ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি; পৌরনীতি ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের যে-কোন শাখা থেকে প্রয়োজন অনুসারে গৃহীত। বিষয়বস্তুর সংগঠন ও আলোচনার সময় সমসাময়িক ঘটনার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানব ও তার সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্তমান সমস্যা থেকে সুরু করে তার অতীত রূপ কেমন ছিল অথবা ভবিষ্যৎ রূপ কেমন হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হয়। সুতরাং সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় বর্তমান কাল হল এর কেন্দ্রবিন্দু। অতীত ও বর্তমান বিভিন্ন কার্যকারণ সম্পর্কে জড়িত। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি অতীত সমাজেরই পরিণাম ও ফলশ্রুতি; তেমনি বর্তমান সামাজিক সমস্যার সমাধান ও বহুবিধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে ভবিষ্যৎ। এর জন্য প্রয়োজন হল বর্তমান-কে বিশেষ ভাবে যাচাই করা এবং বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এটাই হল ভবিষ্যৎ নাগরিকের অপরিহার্য কর্তব্য। বর্তমান শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক করে গড়ে তোলার বিশেষ সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হল সমাজবিদ্যা। সুতরাং সমাজবিদ্যার পরিপূরক বিষয়বস্তু হিসেবে চলতি বা সমসাময়িক প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমসাময়িক প্রসঙ্গ সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর নিকট অতি আকর্ষণীয় বিষয়। সকলেই জানতে চায় বর্তমানে কি ঘটনা ঘটছে। শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা চতুর্পার্শ্বস্থ ঘটনা জানতে, শুনতে ও দেখতে চায়। বয়স্করা কি কথা বলেন, কি ঘটনা প্রতিবেশীর গৃহে ঘটলো ইত্যাদি শুনতে ও জানতে তারা আগ্রহী। বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিশুই আঞ্চলিক পরিবেশ

ছেড়ে দূরবর্তীস্থানে সংঘটিত ঘটনাবলী জানবার জন্য আগ্রহী হয়। সংবাদ পত্র পাঠের মাধ্যমে বা বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট থেকে সংবাদ শুনতে তারা ভালবাসে। চলতি প্রসঙ্গের প্রতি শিক্ষার্থীর এই আকর্ষণকে আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক কর্মে সহজে প্রয়োগ করতে পারি।

সমসাময়িক খবরাখবর সরবরাহের মাধ্যম হল সংবাদপত্র। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দৈনিক সংবাদবাহী পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি নানা প্রকারের সংবাদ পরিবেশন করে। এসব সংবাদ বর্তমান সময়েরই ঘটনা এবং বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকে বলেই চলতি প্রসঙ্গ পাঠকের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সব চেয়ে বেশী সৃষ্টি করে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতীত অপেক্ষা বর্তমান ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করাও অতি সহজ। সাধারণ নির্বাচনের খবর, মন্ত্রিসভার পরিবর্তন, নতুন মন্ত্রিসভা গঠন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, ত্রি-ভাষা সমস্যা, খাদ্যসমস্যা, দৈনন্দিক বিপর্যয়ের বিবরণ, সামাজিক অঘটন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ ভূমিকম্প, প্রবল ঘূর্ণিব্যাত্যা, বন্যা, মহামারী, শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা, ধর্মঘট ইত্যাদি সংবাদপত্রের দৈনন্দিন খবর। এক কথায় সংবাদ পত্র দৈনিক ইতিহাস। এর মধ্যে অনেক গুজব ও চমকপ্রদ সংবাদ যেমন থাকে, তেমনি আবার তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও পরিবেশিত হয়। সমাজবিদ্যার শিক্ষক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নির্বাচন করে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করতে পারেন।

২। কি ভাবে সমসাময়িক প্রসঙ্গকে কাজে লাগান যায় ? (How to utilise the current affairs in teaching social studies) :

প্রথমতঃ, সমাজবিদ্যা পাঠের সময় সমসাময়িক বা চলতি প্রসঙ্গগুলি উপস্থাপিত বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ প্রদানের সময় চলতি ঘটনার উল্লেখ করা হয় মাত্র কিন্তু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার পরিপূরক বিষয় হিসেবে চলতি প্রসঙ্গকে কাজে লাগান যায়। সমাজবিদ্যার পাঠ্যবিষয়টুকু আলোচনার সময় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক বিষয়টিকেও সবিস্তারে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ

থাকে। যেমন, ভাষা সমস্যা পরিবেশনের সময় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ত্রিভাষাসূত্রটি বিশ্লেষণ করা উচিত।

তৃতীয়তঃ, পাঠ পরিকল্পনায় 'আয়োজন' পাঠে চলতি প্রসঙ্গকে কাজে লাগান যায়। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সাময়িক খবর সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে সমাজবিদ্যার অভিপ্রেত আলোচ্য পাঠ্যবিষয়ে পৌছান যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে সেদিনকার নির্ধারিত পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দমদমের বিমান দুর্ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা; বস্ত্র উৎপাদন ও বণ্টন সম্পকিত সংবাদ প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ; বৈদেশিক ঋণ বা বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা অতীতের শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বহু বিষয় সমাজবিদ্যার শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে অবতারণা বা আলোচনা করতে পারেন।

চতুর্থতঃ, পদ্ধতি হিসেবেও চল্‌তি প্রসঙ্গকে কাজে লাগান যায়। সমস্যা, প্রকল্প, আরোপিত কর্ম, তত্ত্বাবধান, মূল পাঠচর্চা প্রভৃতি পদ্ধতির প্রয়োগ হিসেবে সমসাময়িক বা চল্‌তি প্রসঙ্গকে সামনে রেখে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি যে-কোন সমস্যার চলতি সংবাদ এরূপ পদ্ধতি প্রয়োগে বিশেষ সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপঃ বাংলার খাদ্য আন্দোলনের সংবাদ উল্লেখ করে শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণীকক্ষে খাদ্য সমস্যা ও তার প্রতিকারের প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তখন আগ্রহী হয়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে, সমস্যার খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক রচনা লিখন ইত্যাদি কর্মে অগ্রসর হতে পারে।

চল্‌তি প্রসঙ্গকে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের সার্থক সহায়ক রূপে প্রয়োগ করা শিক্ষকের কৌশল, সামর্থ্য, পরিচালন ক্ষমতা এবং সংবাদ নির্বাচনে উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে।

৩। সমসাময়িক প্রসঙ্গ নির্বাচনের নীতি (Principles of selection of current affairs) ঃ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে সমসাময়িক বার্তা পরিবেশনের সময় পরপৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রেখে চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচন করা উচিত।

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীদের শ্রেণী, বয়স, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি করার ক্ষমতা বিচার করে সেই অনুসারে চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, অপ্রয়োজনীয় ও প্রচার মূলক গুজবগুলিকে ত্যাগ করে প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করা উচিত।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা মিটাতে পারে এমন সংবাদ নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থতঃ, বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষক কিভাবে ও কি উদ্দেশ্যে সেগুলিকে শ্রেণী কক্ষে পরিবেশন করবেন সেদিকে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। সমাজবিদ্যার পরিপূরক হিসেবে নির্বাচিত চল্‌তি প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রাখাও বাঞ্ছনীয়।

চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচনের সময় এসব নীতিগুলি অনুসৃত হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৪। সমসাময়িক প্রসঙ্গের উপযোগিতা (Use of current affairs) :

প্রথমতঃ, সংবাদপত্র হল শিক্ষার অপরিহার্য মাধ্যম। চলতি প্রসঙ্গ আলোচনা দ্বারা শিক্ষার্থীরা সংবাদপত্র পাঠে মনোযোগী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, চল্‌তি প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা এগুলিকে বিচার ও যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে এবং পরস্পর বিরোধী মতবাদ ও সামঞ্জস্যহীন সংবাদগুলিকে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করে। ফলে প্রচারমূলক মিথ্যা প্রসঙ্গ দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় না।

তৃতীয়তঃ, চল্‌তি প্রসঙ্গ পাঠে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। তারা ক্রমশঃ সহনশীল, সহানুভূতিশীল হতে সমর্থ হয়।

চতুর্থতঃ, সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর পরিপূরক হিসেবে যখন সমসাময়িক বা চল্‌তি প্রসঙ্গ শ্রেণীকক্ষে আলোচিত হয় তখন শিক্ষার্থী সরাসরি বর্তমান সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং তার সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ভাবী নাগরিকের নিকট সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে গঠিত দৃষ্টিভঙ্গী জাতির অপরিহার্য সম্পদ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

৫। শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teacher) ঃ

চল্‌তি প্রসঙ্গ থেকে শিক্ষালাভের উপযোগিতা ও সার্থকতা শিক্ষকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। তাই শিক্ষককেও সমাজ ও রাষ্ট্রের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে খুবই সজাগ থাকতে হবে। চল্‌তি সংবাদ আলোচনা উপলক্ষে শিক্ষককেও মতামত ব্যক্ত করতে হয়। কাজেই শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, তাঁর বক্তব্য যেন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়। এজন্য সমাজবিদ্যার শিক্ষককে নিয়মিত পড়াশুনা করতে হবে। একাধিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকাদি পাঠ করে তাঁকে তাঁর অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশী সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে শিক্ষককে সম্পূর্ণ পরিচিত হতে হবে। যোগ্য, অভিজ্ঞ ও কৌশলী শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত এবং পরিবেশিত হলে চল্‌তি প্রসঙ্গ আলোচনার ফলে শিক্ষার্থীরা সত্যই উপকৃত হবে ; আর ভবিষ্যৎ নাগরিকের এই শিক্ষা হবে জাতীয় সম্পদ।

প্রয়োগশালা পদ্ধতি

(Laboratory Method)

১। প্রয়োগশালা পদ্ধতি কি ? (What is Laboratory Method) ঃ

জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে গৃহীত। এই শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তাই ব্যক্তির প্রয়োজন, সামর্থ্য, আচার-আচরণ ও অভিরুচি অনুসারে শিক্ষাদানের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপায় স্বরূপ প্রয়োগশালা পদ্ধতি বিশেষভাবে সমাদৃত। সমাজবিদ্যা শিক্ষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ খুব কষ্টসাধ্য নয়। কারণ সমাজবিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষই প্রয়োগশালা পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য নির্ধারিত থাকে। অতএব সমাজবিদ্যার শিক্ষাদান প্রসঙ্গে প্রয়োগশালা পদ্ধতির আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রয়োগশালা পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান। তবে বিভিন্ন রূপের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুসারে শিক্ষালাভে সুযোগ সৃষ্টি করা। এই পদ্ধতির একটা বিশেষ রূপ হল ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton Plan)। মিস হেলেন পার্কহার্ষ্ট (*Miss Helen Parkhurst*) এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ডাল্টন সহরে এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা করেন।

এই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয় হল শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীগণকে এক বা একাধিক মাসের কাজ (assignment) নির্দিষ্ট করে দেন এবং শিক্ষার্থীগণকে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছেষ্টায় তা শিক্ষা করতে বলা হয়। এর জন্য সমগ্র বিদ্যালয়টিকে প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত করা হয়। প্রয়োগশালার প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীকক্ষে বিষয় শিক্ষার উপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা, শিক্ষা সহায়ক উপকরণাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। পাঠ পরিচালনার জন্য কোন সময়-তালিকা (Time table) থাকে না। শিক্ষার্থী নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে

যতক্ষণ ইচ্ছা এই শ্রেণীকক্ষে (প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত) পড়াশুনা বা কাজকর্ম করতে পারে। শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম ও পাঠোন্নতি (progress) অনুসারে শিক্ষক রেখাচিত্র (graph) প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে পৃথকভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক থাকেন কক্ষান্তরে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক নির্দেশ বা পরামর্শ দিতে পারেন। তবে তাকে শিক্ষার্থীর সাহায্যার্থে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়।

২। ডাল্টন পরিকল্পনার ত্রুটি বিচ্যুতি (Merits and demerits of Daltan Plan) ঃ

ত্রুটি (Merits) ঃ (ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী স্বকীয় গতিতে স্বচেষ্টায় স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

(খ) প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত শ্রেণীকক্ষগুলি বিষয় শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ও শিক্ষার্থীকে কর্মে আগ্রহী করে তোলে।

(গ) শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকের সাহায্য পেতে পারে।

(ঘ) শিক্ষার্থীরা দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পায়।

(ঙ) পাঠোন্নতির রেখাচিত্র (graph) লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহী হয়।

বিচ্যুতি (Demerits) ঃ সুবিধা অনেকগুলি থাকলেও ডাল্টন পরিকল্পনার শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। সমাজবিদ্যা শিক্ষার একটা মৌল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ রূপে গড়ে তোলা। অথচ এই পদ্ধতিতে সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত হলেও অনগ্রসর ও সাধারণ শিক্ষার্থীর নিকট ততটুকু উপযোগী নয়। তৃতীয়তঃ, সময় তালিকার অভাব থাকায় বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কেবল পড়তে, বুঝতে ও লিখতে শেখে কিন্তু শুনে অনুধাবন করা এবং মুখে ব্যক্ত করবার অভ্যাস থেকে এরা বঞ্চিত হয়। পঞ্চমতঃ, এই পদ্ধতি বৈচিত্র্যহীন নিতান্ত একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে পারে না।

৩। সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা (Modified Dalton Plan) ঃ

মূল ডাল্টন পরিকল্পনার ত্রুটিগুলি সংশোধন করে সমাজবিদ্যার শিক্ষক এই পরিকল্পনা স্থানীয় প্রয়োজনের অনুকূলে প্রয়োগ করতে পারেন। শ্রেণী পাঠের পরিপূরক হিসেবে এই পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিক্ষাবর্ষের কিছুকাল শ্রেণী পঠন পাঠন ও বাকি অংশটুকু স্বকীয় পদ্ধতিতে ডাল্টন পরিকল্পনার অনুসরণ করে পাঠাভ্যাস করা বাঞ্ছনীয়। সংশোধিত পরিকল্পনার সময় তালিকা থাকবে এবং সেই অনুসারে বিদ্যালয়ে ঘণ্টাও বাজবে। নীরব দর্শক না হয়ে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় সহযোগী হতে হবে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য রেখাচিত্র ছাড়াও পৃথক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এইভাবে মূল ডাল্টন পরিকল্পনাকে সংশোধন করে সমাজবিদ্যার শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করলে শিক্ষাদান সার্থক হবে বলে মনে হয়।

৪। তত্ত্বাবধান মুলক পাঠচর্চা (Supervised Study) ঃ

সমাজবিদ্যার শিক্ষাদানে তত্ত্বাবধানমূলক বা তদারকী পাঠ পরিচালনা প্রয়োগশালা পদ্ধতির অন্যতম রূপ। এ সম্পর্কে আমরা অষ্টম অধ্যায়ে 'অবেক্ষণ পাঠচর্চা' শীর্ষে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

প্রশ্নপত্র

প্রথম অধ্যায়

1. Discuss the meaning and Scope of Social Studies as a part of the Secondary School curriculum. What are the new trends in this field ? [B. T. (C. U.), 1965.

2. "The Scope of Social Studies is wide ; the theme is the present life of man the world over,"—Discuss the Scope and subject matter of Social Studies in the light of aforesaid statement.

3. "The subject of Social Studies is all embracing in the sense that it concerns and touches all aspects of human life." Critically discuss the statement.

4. What is Social Studies ? Is Social Studies a Science ? Point out the relation between Social Science and Natural Science.

5. Institute a comparison between Social Science and Social Studies.

6. "Social Studies is a study of man and his environment and the interaction between man and his environment and between groups of men."—Discuss.

7. Discuss the Scope of Social Studies in the integrated curriculum of the Secondary Stage. Mention some specific points in favour of enlarging its Scope. [P. G. Basic, 1967-68.

8. What do you really mean by Social Studies ? Indicate its relation with the Social Science. [P. G. Basic, 1964.

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. Discuss the aims and objectives of teaching Social Studies in School. [B. T. (C. U.), 1962.

2. What are the aims and objectives of teaching Social Studies in the Secondary Schools of West Bengal, especially at the Senior Stage ?

3. "The students should be able to acquire not only the knowledge but attitudes and values which are essential for successful group living and civic efficiency."

[Secondary Edu. Commission—Chap. VI]

Discuss how far Social Studies aim of teaching can extend to this effect.

4. "The teaching of Social Studies is to aim at a general acquaintance with, and an understanding of environment, local and national, as well as social and economic."—Examine the statement.

5. Differentiate aims and values. What are the aims of teaching Social Studies and what are the values Social Studies can give if it is taught effectively ?

6. Discuss the aims and objectives of teaching Social Studies in our Secondary Schools. State from your own experience how far these objectives are being realised in practice. [B. T. (C. U.), 1966.

7. State the general aims and objectives of the Social Studies in the new programme of Indian Education.

8. How far does the subject of Social Studies help to satisfy the fundamental requirements of life related education ? [P. G. Basic, 1967-68.

9. Discuss the aims, objectives and Scope of Social Studies as a part of the Secondary Education carriculum in West Bengal. [P. G. Basic, 1964-65.

10. What should be that aims of teaching Social Studies to the students of senior stage ? Describe some of the principles formulating the aims ; which you will suggest. [P. G. Basic, 1966-67.

11. Briefly discuss the aims and objectives of teaching Social Studies in our Secondary Schools. Which of the two

approaches 'subject disciplines' and 'integrated approach' will help the realization of these objectives better ?

[B. T. (C. U.), 1968.

তৃতীয় অধ্যায়

1. Describe the role of Social Studies in our secondary curriculum in the light of modern trends in Education. In this connection, comment on the view that Social Studies in schools should not be treated as a subject but as a course with a specific educational function. [B. T. (C. U.), 1963.

2. Introduction of Social Studies for teaching in Indian School is a positive step to the reconstruction of modern Indian education.—Discuss.

3. What is meant by Core-subject ? Why is Social Studies selected as core-subject ?

4. What do you mean by core curriculum ? Why is Social Studies placed in that curriculum ?

5. Discuss how Social Studies have assumed an important role in the education of students in our modern secondary school curriculum.

[B. T. (K. U.), 1968.

চতুর্থ অধ্যায়

1. Draw up a curriculum on Social Studies for children aged 14 to 16 years, stating the aims you will keep in view to make it effective.

[B. T. (C. U.), 1962.

2. What are the different approaches to content organization in Social Studies ? Discuss in this connection the merits and defects, if any, of the existing syllabi of Social Studies approved by the West Beugal Board of Secondary Education.

[B. T. (C. U.), 1966.

3. What are the merits and demerits of the Social Study syllabi introduced by the West Bengal Board of Secondary

Education for Class IX and X of the High and Higher Secondary Schools ?

4. What are the principles you should bear in mind while making Social Studies curriculum ?

5. Discuss the terms—Integration, Correlation and fusion in connection with organising Social Studies curriculum.

6. Give a critical estimate of the existing curricula of Social Studies of the High Schools and Higher Secondary Schools of West Bengal. [B. T. (K. U.), 1966.

7. What are the different patterns that may be followed in organizing the content of Social Studies syllabus for our Secondary Schools ? What particular pattern would you adopt for West Bengal and Why ? [B. T. (C. U.), 1967.

8. What principles would you observe in organising Social Studies curriculum for the Schools of West Bengal ? How far does the present syllabus help in tackling the problems of integration ? [P. G. Basic, 1963.

পঞ্চম অধ্যায়

1. With the application of project method draw up a Schemes of Lessons on the subject to be taught in Social Studies to Secondary School pupils. [B. T. (C. U.), 1962.

2. In what respects would the teaching of geography or history as separate subject differ from the teaching of historical or geographical topics included in Social Studies ? Illustrate your answer with tipical example.

[B. T. (C. U.), 1962 ; [K. U., 1966.

3. Discuss the scope and utility of any two of the following in making Social Studies instruction effective in the Schools :—

(a) The 'Unit' procedure ;

(b) Socialized recitation ;

(c) Supervised Study ; [B. T. (C. U.), 1966.

(অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

4. Explain the importance of concepts in social studies inrtruction. What methods would you employ to help the development of correct concepts through such instruction? Illustrate your answer with reference to a unit or units taken from the West Bengal Board's Syllabi of Social Studies.

[B. T. (C.U.), 1965.

5. Discuss the need for developing correct concepts in our pupils through Social Studies instruction. What techniques could you employ to facilitate such development? Illustrate your answer with reference to a topic or topics of the Social Studies Syllabus of our High or Higher Secondary Schools.

[B. T. (C.U.); 1965, 1967.

6. Do you think that group work has a special importancr for Social Studies programmes? What problems would you face in organizing such work in your school and how would you solve them?

[B. T. (C.U.), 1964.

7. Why is the Project Method considered particularty suitable for Social Studies instruction in the schools? Describe the question with reference to a particular topic or topics of the High or Higher Secondary Syllabus of West Bengal Board of Secondary Education.

[B. T. (K.U.), 1965; C.U. (B. T.), 1967.

8. Show the difference between a project and a problem as methods of teaching social studies. Indicate their relative merits.

[B. T. (K U.), 1958.

9. Discuss the utility of any two of the following methods in the teaching of Social Studies:

a) Project Method;
b) Socialized recitation Method;
c) Supervised Study Method;

(অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

d) Unit Lesson Method.

[P. G. Basic, 1967-68.

10. Discuss the importance of the problem Method in teaching Social Studies as the Senior stage of Secondary

Schools. Take a suitable unit from the Social Studies Syllabus and illustrate how you will employ this method.

[P. G. Basic, 1964.

11. Select a unit from the Social Studies Syllabus of Schools and indicate the methods and techniques of teaching you would like to adopt in carrying it into practice.

[P. G. Basic, 1963.

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. Briefly discuss the relationship between Man and Society and point out the significant features of the Indian Social environment which are important from the Social Studies point of view. [B. T. (C. U.), 1968.

2. What measures will you adopt to make your pupils understand the value of Human Relationship ?

[B. T. (C. U.), 1962.

3. Describe the different forms of human relationship and explain their importance of Social life with particular reference to Indian backgrounds. [B. T. (K. U.), 1965.

4. Discuss the relation between man and society. How can Social Studies teaching help an understanding the relation among students ? [P. G. Basic, 1963.

সপ্তম অধ্যায়

1. Discuss the importance of utilising community resources in making social studies instruction effective. What ways would you follow for making use of these resources ?

[B. T. (C. U.), 1965.

2. Discuss the need for community participation in makinng social studies programmes successful in schools. Give a concrete plan for utilizing community resources in teaching social studies in the Higher Secondary classes of your school. [B. T. (C. U.), 1963.

3. "The community with its many and varied resources can enrich and suppliment learning in the field of Social Studies."

—Mention some of the resources and indicate how you would utilise them "to enrich and supplement" learning in the field of Social Studies. [B. T. (K. U.), 1966.

4. Discuss the importance of community resources in making Social Studies instruction effective in the schools. Suggest a concrete plan for utilizing these resourees in your school. [B. T. (C. U.), 1968.

অষ্টম অধ্যায়

1. Examine the need for a Social Studies Laboratory in the Schools. How would you equip and utilize such a room? [B. T. (C. U.), 1966

2. "The Social Studies learning Laboratory requires as much careful cansideration and planning as does any other phase of the teaching-learning process."

—Discuss how you would organise such a Laboratory for effective teaching of Social Studies in the school.

[B. T. (K. U.), 1965

3. Name a few audio-visual materials which you would like to use make the teaching of Social Studies effective and indicate how they help teaching. [B. T. (K. U.), 1966.

4. Explain the scope of utility of any two of the following for Social Studies instruction :

1) Festivals & functions.

2) Excursion. [B. T. (K. U.), 1965.

5. "The effective use of audio-visual materials in teaching learning process can—contribute much to Social Studies instruction."—Justify the statement with suitable illutrations.

[B. T. (K. U.), 1968.

6. Write notes on any two of the following :

(a) Evaluation of Social Studies instruction.

(b) Need for improving teaching aids for Social Studies instruction.

(c) Importance of current events in the teaching of social studies programme.

(d) Effective use of Text-Book method in social studies class. (পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) [B. T. (K. U.), 1968

7. Explain the scope and utility of any two of the following in realizing the aims and objectives of social studies instruction in the school :

(a) Socialised recitation (পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

(b) Supervised study

(c) Social studies laboratory

(d) Social studies club [B. T. (C. U.), 1968.

8. "A social studies class room is the arranged environment in which students carry on learning activities."—Justify. [P. G. Basic, 1967-68.

9. Discuss the scope and utility of any two of the following in teaching social studies in the school :

(a) Laboratory method.

5.

(পরিশিষ্টাংশে দ্রষ্টব্য)

(b) Teacher-pupil planning.

(c) Bulle.'n board.

(d) Supervised study and school library. [P. G. Basic, 1964-65.

10. Discuss the importance of visual aids in connection with the teaching of Social Studies. State the important items of aids that you may usefully utilise in the class room. [P. G. Basic, 1964

11. Discuss the scope and utility of any two of the following in the Social Studies programme in the school ;

(a) Field work.
(b) Use of audio-visual materials
(c) Co-curricular activities
(d) Library work and reference collection

[B. T. (C. U.), 1964.

নবম অধ্যায়

1. "Text-books are excellent servant but very bad master."—Justify this statement and give suggestions for the proper use of the text books.

2. What are the advantages and disadvantages of using a single text book?

3. "Text books are appropriate and useful as means, not an ends."—Discuss.

4. Text-books are indispensable in the existing system of education.—Why?

5. What are the essentials in selecting a good social studies text-book?

একাদশ অধ্যায়

1. "Man actually does possess the means of either destroying himself or realising his brotherhood in practical world-wide unity."—Amplify the statement and explain how teaching of social studies can produce a desire for world-wide unity and universal brotherhood.

2. What are the implications of International understanding?

3. What in your opinion are the ways and means of creating International understanding?

4. Describe the role of Social Studies as an essential subject in teaching of world understanding.

5. "Civilisation is a world product, not a national one," —Elucidate and explain how Social Studies can reconcile national and international aspects to the cause of world understanding.

দ্বাদশ অধ্যায়

1. In your opinion what should be the essential qualifications and main functions of a Social Studies Teacher ?

2. "In the hands of an inspired teacher Social Studies like any other subject, can become a means of real education"—Elucidate and discuss the role of the teacher, his essential qualities, training and equipment in making Social Studies an effective means of real education.

3. How can the teacher of Social Studies help other teachers of the School in their co-curricular and extra curricular activities ?

4. What do you consider to be essential equipment of a Social Studies teacher, which can help him to discharge his duties satisfactorily ?

5. "Unless the Teacher's knowledge and information is well grounded and sound, he can not give the correct lead to his pupils".—Discuss.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

1. Examine the need for comprehensive evaluation of Social Studies programmes in Schools. What methods will you adopt for evaluating pupil-growth in information, Skill and attitudes ?
[B. T. (C. U.), 1963.

2. Examine the need for comprehensive evaluation in Social Studies. What different tools and techniques would you make

use of to ensure such a Programme of evaluation in your Schools ? Give concrete illustrations.

[B. T. (C. U.), 1965.

3. Discuss the merits and demerits of various objective type test items—True-false, Multiple choice, Question and Answer tests, Definition test etc.

4. Give a bird's eye view of rise and development of the educational evaluation movement.

5. Examination and evaluation are closely related terms which one is more useful in appraising pupil's progress in Social Studies ?

6. What are the principles of good evaluation in connection with measuring pupil's progress in Social Studies ?

7. What do you mean by cumulative Records ? Discuss some problems in connection with maintenance and use of Cumulative Records ?

8. Examine the need for comprehensive evaluation in realising the objects of Social Studies. What are the tools which you can make use of for this purpose.

[B. T. (K. U.), 1965 ; B. T. (C. U.), 1968.

9. What will you evaluate in Social Studies instruction in the Schools ? What methods and techniques will you make use of for this purpose ? Give concrete illustrations.

[P. G. Basic, 1964-65.

সমাপ্ত

Cover Printed at Dipak Printers
45, Surya Sen St... Cal.-9